নির্বাচিত পঁচিশ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সংবাদ

৫৭/২ডি কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৭০
প্রকাশক ঃ মাধবী মণ্ডল
সংবাদ প্রকাশন
৫৭/২ডি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
মুদ্রক ঃ স্মিতা আচারিয়া
অ্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স
৪৩৭/বি, রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা ৭০০ ০০৫

"রা-স্বা"

শ্রী জ্যোতিষচন্দ্র দাশগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রতীক্ষার ঘর ।। উত্তরের ব্যালকনি ।। হাওয়া-বন্দুক ।। কথা
উকিলের চিঠি ।। দূরত্ব ।। বাধা
ছেলেটা কাঁদছে ।। ইচ্ছে ।। যতীনবাবুর চাকর ।। দুনিয়ার চারদিক
বন্দুকবাজ ।। বৃষ্টিতে নিশিকান্ত
বনমালীর বিষয় ।। দুর্ঘটনা ।। লামডিঙের আশ্চর্য লোকেরা
দেখা হবে ।। জমা-খরচ ।। আশ্চর্য প্রদীপ
ঝুমকোলতার স্নানের দৃশ্য ও লম্বোদরের হাটখরচ ।। আমেরিকা
খানাতল্লাশ ।। গঞ্জের মানুষ ।। শেষবেলায়
সম্পূর্ণতা

প্রতীক্ষার ঘর

টিকটিকিরা জল খায় না। বলে নতুন লোকটা খুব গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

আমরা কজন দেশলাই কাঠি দিয়ে জুয়ো খেলছিলাম। তাসটা খুব পুরোনো হয়ে গেছে। চলে না। ইস্কাপনের টেক্কা কি হরতনের গোলাম সবই ছেঁড়ার দাগ দেখে পিছন থেকেই চেনা যায়, টেক্কাটা ছিঁড়েছে পাশ থেকে মাঝখান অবধি, গোলামটার দুটো কোনা নেই, এরকম সব তাসই একটু খেয়াল করলেই চেনা যায় আজকাল। বাদু তাস বাঁটতে বাঁটতেই বলে—রন্টে, তোর ঘরে টেক্কা সাহেব গেছে, দেখ যদি বিবিট পাস! শেষ তাসটা পেছন থেকে দেখেই মন বিগড়ে গেল। চিঁড়ের দুরি।।

ব্লাইণ্ড দিবি না? হারু জিজ্ঞেস করে।

বিস্বাদ মুখে বললাম—প্যাক। তাস ফেলে নতুন লোকটাব দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি—টিকটিকিরা জল খায় না?

লোকটা মুখ ফিরিয়ে আমার মুখটা একটু দেখল, বলল—জল খেতে কখনো দেখেছেন?

—না।

—তবে?

—শুনেছি টিকটিকি পেচ্ছাব করে। জল না খেলে····

লোকটা শ্বাস ফেলে বলে—ওসব আন-কথা কান-কথা। দেয়াল জুড়ে মরুভূমি, জল পাবে কোথায়?

একটু ভাবতে থাকি, নতুন লোকটার মাথায় এত কথাও আসে!

ডালিম রাজার জোড়া পেয়ে দুটো কাঠি ব্লাইণ্ড দিল। তাস সবই চেনা। দেখেও যা, না দেখেও তাই। তবু ব্লাইণ্ড আর সিন চালু আছে নিয়মমাফিক। ব্লাইণ্ড দিয়ে সে হারুকে বলল—কাল তেরোটা কাঠি জিতেছিলাম, তার মধ্যে সাতটা জ্বলেনি, ঠুকতেই বারুদ খসে গেল।

হারু উত্তর দিল না! সে আমাদের একটা বুদ্ধি শিখিয়েছিল, দেশলাই কিনে কাঠিগুলো লম্বালম্বি ব্লেড দিয়ে চিরে ফেলে সে। তাতে কাঠিটা দু'ভাগ হয়, বাবুদও দুভাগ হয়ে যায়। ঠিকমতো ঠুকে জ্বালতে পারলে

দু'ভাগই জ্বলে। একটা কাঠিতে দু'টো কাঠি পেয়ে যাই আমরা। দেশলাই সম্পর্কে হারুকে আমরা এক্সপার্ট বলে মানি।

হারু উত্তর দিল না, কিন্তু নতুন লোকটা বলল—জ্বলবে কি করে? ওই সাতটা কাঠিতে যে বারুদের বদলে মাটি লাগানো ছিল। আমিও কাল তিনটে কাঠি জ্বালাতে পারিনি। কিন্তু আমার স্বভাব সব কিছু খুঁটিয়ে দেখা, বারুদ খুঁটে দেখলাম কাঠির মাথায় পোড়া দাগ। বারুদগুলো পিষে দেখি মাটি।

ডালিম অবাক হয়ে বলে—তাই বটে? কাজটা কার?

—হারুবাবুর ছাড়া আর কার! দেশলাই উনি ভাল চেনেন।

হারু রুখে উঠল না। কেবল ঠাণ্ডা চোখে নতুন লোকটার দিকে চেয়ে বলল—কাঠিতে আমার নাম সই করা ছিল?

—না। ভেবেচিন্তে বের করলাম।

ডালিম হাত বাড়িয়ে বলল—দেখি তোর কাঠিগুলো।

হারু তার কাঠি সরিয়ে বলল—মাটি নয় রে। দেশলাইটা ড্যাম্প ছিল হয়তো। ডালিম তবু হাত বাড়িয়ে দুটো কাঠি ছিনিয়ে নিয়ে আঙুলে পিষে দেখল। মাটিই।

নতুন লোকটা ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজল। ডেক চেয়ারের বেতের বুনুনি কবে ছিঁড়ে গেছে। সেই ছেঁড়া জায়গা দিয়ে লোকটার পশ্চাদ্দেশ ঝুলে আছে। কিন্তু বসবার ভঙ্গি দেখে কোনো অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয় না। অভ্যাস হয়ে গেছে! চোখ বুজেই বলল—যখন পয়সার খেলা চালু ছিল তখন হারুবাবু কী দিতেন?

ঠিক প্রশ্ন নয়, যেন অনেকক্ষণ বাদে একটা ভাববার মত বিষয় পাওয়া গেছে বলে লোকটা গভীরভাবে ভাবতে লাগল চোখ বুজে!

বাদু অবাক হয়ে বলল—মাইরি হারু, এ যে কেষ্টনগরের কারিগরদের কাজ। সেবার মাসতুতো বোন চিনেবাদাম খেতে দিয়েছিল, সন্দেহই পারিনি, কামড়ে দেখি মাটি! তুই শালা তো মাটির দেশলাইয়ের কারবার খুললে লাখোপতি হয়ে যাবি।

এসব কথায় আমার কান নেই, ভারী তো দেশলাইয়ের কাঠি! টিকটিকি জল খায় না—এ ব্যাপারটা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।

নতুন লোকটার দিকে চেয়ে বললাম—টিকটিকি জল খায় না, এ কথাটা ঠিকই। আমিও ভেবে দেখলাম।

লোকটা শ্বাস ফেলে বলল—যখন আপনাদের পয়সার খেলা চালু ছিল তখন হারুবাবু কী দিতেন বলুন তো!

একটু ভাবতে হল। বললাম—কী জানি! সেই কবে আমরা পয়সা দিয়ে খেলতাম তা কি আর মনে আছে। এখন পয়সা পেলেই সিগারেট কিনে ফেলি। খেলি না।

লোকটা বুঝদারের মতো মাথা নাড়ে।

কাঠের সুইং ডোরটা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর আপনা থেকে বন্ধ হয় না, হাঁ হয়ে থাকে। ইঁদুরের ডাকের মতো শব্দ করে সেটা ঠেলে মতে ঘরে এল। হাতে ঝাড়ু আর ফিনাইলের টিন, তার পরনে নীল হাফশার্ট আর নীল হাফপ্যাণ্ট। বলল—আজ ন'টার ট্রেনে প্যাসেঞ্জার আসছে। ঘর খালি রাখবেন।

ট্রেনের এখনো দেরি আছে। আমরা কেউ নড়লাম না। বাথরুমে মতের ঝাঁটার শব্দ হতে লাগল, আর ফিনাইলের ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া গেল। গন্ধটা আমার বেশ লাগে। আগে জামাকাপড় যখন বাক্স থেকে বের করে পরতাম তখন ন্যাপথালিনের গন্ধ ভুর ভুর করত। সে গন্ধটা এরকমই। আজকাল আর বাক্সে রাখার মতো জামাকাপড় নেই। সেই গন্ধটা আর পাই না। জামা-প্যাণ্ট ময়লা হলে এক একদিন রাতে ফিরে বাংলা সাবান দিয়ে কেচে দিই। সকালের মধ্যে শুকোয় না। একটু ভেজা ভেজা থাকে। তা-ই পরে বেরিয়ে পড়ি, গায়ে গায়ে শুকিয়ে যায় ঠিক!

মতে বাথরুমে তালা দিয়ে আবার বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল—প্যাসেঞ্জার আসছে মনে থাকে যেন।

প্যাসেঞ্জার অবশ্য খুব কমই আসে। উত্তরে একটা নতুন জংশন হওয়ার পর পাহাড়-লাইনের যাত্রীরা ঐ জংশন থেকেই হিল-স্টেশনে চলে যায়। এদিকে কেউ বড় একটা উজিয়ে আসে না। সেইটে লক্ষ করেই আমরা কিছুদিন হল স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমটা দখল করে আছি। স্টেশন মাস্টারও কিছু বলেন না। তাঁর মেয়েদের আমরা কখনো হুড়ো দিইনি। তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে কলকাতায় গেলে আমরা তাঁর কোয়ার্টাসের পেঁপে কাঁঠাল আর নারকেল গাছ পাহারা দিয়েছি। তিনি বলে গিয়েছিলেন—বাবা, তোমরা দেখো। আমরা দেখেছিলাম। তিনি ফিরে এসে গাছে বোঁটাসুদ্ধ ফল দেখে ভারী খুশি। অবশ্য তাঁর ফিরে আসার দিন রাতেই আমরা সব পেড়ে

নিই, আর মঙ্গলবারে হাটে বেচে দিয়ে সিনেমা দেখি। তবু তিনি আমাদের ওয়েটিং রুমের ব্যাপারে কিছু বলেন না। ঘরের বাইরে থাকলে আমাদের মাথায় অনেক বদখেয়াল আসে যে।

বাদু একটা সিগারেট আদ্দেক খেয়ে ডালিমকে দিল। চার টানের পর হারু পাবে। হারু চেয়ে আছে। আবার তাস বাঁটছে বাদু। খুব আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়ছে। আমার ভাগে একটা তিন আর নলা পড়েছে। দেখে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। শেষ তাসটা পড়ার পর এক-পলক চেয়ে দেখলাম, ডায়মণ্ডসের গোলাম।

তাসটা বড় তাসে রেখে দিয়ে বললাম—টিকটিকি তাহলে পেচ্ছাব করে কী করে? অ্যাঁ!

লোকটা চোখ বুজেই বলল—ট্রেনটা কি রাইট টাইমে আসছে?

—তাই কখনো আসে?

—একটু খবর নিন তো। সকালবেলাটায় জ্বালালে। এ গরমে আর কোথায় যাবো।

—ওভারব্রিজ আছে। আমি বললাম।

—দূর! ওখানে বড্ড ভিখিরির ভিড়।

লাইন ক্লিয়ারের ঘণ্টার শব্দ শুনে আমরা তাস গুটিয়ে বড় গোল টেবিল থেকে নেমে পড়লাম। নতুন লোকটাও উঠল।

ওভারব্রীজের সিঁড়ির তলায় ভিখিরিরা কাঠের উনুনে খাসির নাড়ি-ভুঁড়ি সেদ্ধ করছে। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে। ব্রীজের ওপরের দিকে কয়েকটা সিঁড়ি নেই। সেই গর্তগুলো সাবধানে আমরা পার হলাম। ছাউনি দেওয়া ব্রীজের ওপরের টিন তেতে আছে। ধুলোর ঝাপটা মারছে গরম বাতাস। পশ্চিমা কুলি আর বুড়ো ভিখিরিরা গামছা পেতে টান টান হয়ে শুয়ে। আমরা ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে এক জায়গায় বসলাম। হারু বলল—ডালিম তুই স্নান করিস না? গা থেকে চামসে গন্ধ আসছে।

—কুয়ো শুকিয়ে আসছে। বাবা পরশু সকালে জল মেপে আমাদের দু ভাইয়ের যাদের চাকরি-বাকরি নেই, তাদের স্নান বারণ করে দিল।

—জল মাপে কী করে? বাদু জিজ্ঞেস করে।

—দড়িতে গিঁট দেওয়া আছে। সেই গিঁট না ডুবলেই আমাদের স্নান বারণ হয়ে যায়। ডালিম বলে।

নতুন লোকটা—বিজ্ঞের মতো বলল—কুয়ো দু রকমের আছে, ঝরনা-কুয়ো আর বোম ফাটা কুয়ো, আপনাদেরটা কোনরকমের ?

ডালিম বলল—আমাদেরটা বোম ফাটা। কাটতে কাটতে হঠাৎ চড়াক করে এক জায়গা থেকে তোড়ে জল বেরিয়েছিল।

লোকটা বলল—ঐ কুয়োই খারাপ, জল শুকিয়ে যায়। ঝরনা-কুয়ো কাটলে খুব ডিপ হয়, আর চারধার থেকে ঝিরঝির করে জল এসে কুয়ো ভরে ওঠে। তার জল শুকোয় না।

পৃথিবীতে এত জল, তবু যে কেন টিকটিকি জল খায় না, ভাবতে ভারী অবাক লাগছিল আমার।

আমি নতুন লোকটাকে বললাম—আচ্ছা মশাই, দেয়াল ফুঁড়ে অশ্বত্থ গাছও তো ওঠে! শেকড় দিয়ে দেয়াল থেকেও রস-কস টেনে নেয়। টিকটিকির তেমন কোনো ইন্দ্রিয় নেই তো?

লোকটা আমার মুখের দিকে চেয়ে কী একটু মনোযোগ দিয়ে দেখল, তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলল—ঐ ট্রেন আসছে।

দেখলাম, বাজারের লেভেল ক্রসিং পার হয়ে ট্রেনটা হন্‌হন্‌ করে আসছে! দুটো কুলি সেই শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে মাথায় গামছা জড়াতে লাগল। আমরা ওভারব্রিজের রেলিঙের ফাঁক দিয়ে নিচে চেয়ে রইলাম।

দেখার কিছুই নেই এখন। এক সময় ছিল। বৃটিশ আমলে সাহেব-সুবোরা এই স্টেশনে নেমেই উত্তরের পাহাড় লাইনে যেত। তখন মেল ট্রেন থামত এখানে, সারাটা স্টেশনে গমগমে ভাব ছিল, ওয়েটিংরুমে বার্মা সেগুনের ফার্নিচার সূক্ষ্ম জালের দরজাওলা রেস্টুরেণ্ট সবই ছিল। এখন উত্তরের জংশন হওয়ায় মেল ট্রেন আর এ পর্যন্ত আসে না। এটা হয়ে গেছে ব্র্যাঞ্চ লাইন, সারাদিন দুটো প্যাসেঞ্জার আপ ডাউনে চলে। বিশাল স্টেশন বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা পড়ে থাকে। বিনা টিকিটের যাত্রী এত বেশি যে রেল কর্তৃপক্ষ এ লাইনটা তুলে দেওয়ার কথা ভাবছে। ওভারব্রিজের তক্তা খুলে পড়ে যাচ্ছে, প্ল্যাটফর্মে ইঁট বেরিয়ে আছে, ভিখিরির বাচ্চারা প্ল্যাটফর্মের যেখানে সেখানে তাদের শরীরের ক্বাথ ফেলে রাখে!

আমরা ট্রেন দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। সবসুদ্ধ জনা ত্রিশ চল্লিশ লোক নামল। বয়সের মেয়েছেলে নেই, সাহেব আমলের বুড়ো চেকার নিকলসন ঘাড় কাত করে গেট-এর কাছে দাঁড়িয়ে ভিখিরির মতো হাত বাড়িয়ে আছে। যে যার ইচ্ছেমতো সেই হাতখানা ঠেলে

ঠেলে চলে যাচ্ছে, টিকিট কেউ দেয় না। নতুন নিকলসনকে দেখে একটু থমকাবেই। নীল চোখ; লাল চুল, সাদা রঙের আস্ত একটা সাহেব। কিন্তু সে নিজে তার সাহেবত্ব ভুলে গেছে কবে! আমাদের বিজয়কে দেখলে 'ভিজয়, ভিজয়' বলে ডাকাডাকি করে, বিজয়ের কৌটো থেকে দু-তিন টিপ নস্যি নেয়। সাহেবী আমলে তার মেম-বৌ ছিল, সে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর নিকলসন তাদের নেপালী আয়াকে প্রোমোশন দিয়ে বৌ করে রেখেছে। নেপালী আর ইংরিজিতে তাদের মাঝে মাঝে ধুন্দুমার ঝগড়া হয়। নিকলসন সাহেব ঝিঙে, ঢেঁকির শাক সবই খায় আজকাল।

মেয়েছেলে দেখা গেল না। তিন--চারজন বেশ ভাল চেহারা আর পোশাকের লোক ওয়েটিং রুমের দিকে গেল? ব্রিজের তলায় ভিখিরি-দের উনুনে নতুন কাঠ গুঁজে দিয়েছে! সেই ধোঁয়ায় চোখে জল এসে যাচ্ছিল।

হারু বলল—নিকলসন সাহেব আর বেশিদিন বাঁচবে না, বুঝলি! ওর বোধবুদ্ধি ভোঁতা হয়ে কেমন হয়ে গেছে।

—কেন? আমি জিজ্ঞেস করি।

হারু বলে—সেদিন ডাউন প্যাসেঞ্জারটা চলে যাওয়ার পর নিকলসন বেঞ্চটায় বসে বিড়ি ধরাবার সময় যেই মাথার হ্যাট খুলেছে, অমনি হ্যাটের ভিতর থেকে একটা বোলতা বেরিয়ে উড়ে গেল।

—যাঃ!

—মাইরি—মাইরি! মাথার চুল ছাঁটে না বলে ঝোপড়া হয়ে আছে মাথা, তাই কামড়ায়নি, কিন্তু টুপির ভিতর বোলতা উড়লে লোকে টের পাবে না। ও কিন্তু পায়নি! তাই বলছিলাম--—

ডালিম প্ল্যাটফর্মের লোক দেখতে দেখতে হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাকল—আরে! মদন, এই মদন--

আমরা সবাই ওভারব্রিজের রেলিঙ ধরে ঝুঁকে পড়লাম। নিকল-সনের হাতটা ঠেলে মদন বেরিয়ে এল! বগলে একটা কাগজের প্যাকেট, মুখ তুলে আমাদের দেখে একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল--তোরা!

--খালাস পেলি? বলে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, বাদু আমাকে খোঁচা দিয়ে বলে—এই শালা, খালাসের কথা চেঁচিয়ে বলতে আছে? তুই একটা—অশ্লীল কথা দিয়ে বাক্য শেষ করে বাদু! তারপর ঝুঁকে বলে—উঠে আয় না, মদন

মদন একটু বিরক্ত চোখে আমাদের দেখল, একটু ইতস্তত করল, তারপর উঠে এল। তার মাথায় একটোকা চুল পিঙলে হয়ে জট বেঁধেছে, গায়ে বসা-ময়লা, হাত পায়ের গাঁট ফোলা ফোলা, খুব রোগাও, হয়ে গেছে।

—কবে খালাস পেলি? হারু জিজ্ঞেস করে।

মদন গম্ভীর গলায় বলে—কাল।

—খালাস না জামিন? আমি জিজ্ঞেস করি।

মদন গম্ভীরভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল—তোর বয়স আর বাড়ল না রণ্টে। দুবছর হাজতে থাকার পরও কেউ জামিন পায়?

আমি আমতা আমতা করে বলি—কাগজে কেবল জামিনের কথাই পড়ি তো। শোনা যায়, পুলিস সবাইকে ধরে নিয়ে জামিনে আবার ছেড়ে দেয়, তারপর আর ধরে না!

মদন একটু গর্বের সঙ্গে বলল—আমারটা ছিল নন্ বেইলেবল্ কেস।

কথাটার মানে তেমন পরিষ্কার বুঝলাম না, ইংরিজিতে আমি বরাবর কাঁচা।

ডালিম জিজ্ঞেস করল—কেমন ছিলি?

মদনের চোখ চকচক করে ওঠে। একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে কেমন আর। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেমন হয়—বলতে বলতে সে নতুন লোকটার দিকে চেয়ে বলে ইনি কে?

ডালিম নিচু গলায় বলে—শ্রেণীহীন সমাজের লোক। বলে খুশ খুশ করে হাসে।

—তার মানে? মদন একটু রুখে উঠে বলে। 'শ্রেণীহীন সমাজ' কথাটা বোধহয় তার ভাল লাগে না।

নতুন লোকটা বলল—ঘাবড়াবেন না। ও একটা কথার কথা।

মদন লোকটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলে--কথার কথা মানে কী? ওসব কি ঠাট্টার কথা নাকি? ঐ স্বপ্ন নিয়ে কত ছেলে লড়াই করে মরে যাচ্ছে।

লোকটা ঠাণ্ডা গলায় বলে—আসলে ইদানীং ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তরের সময়ে আমাদের মতো কিছু শ্রেণী লোপ পেয়েছে। ইংরিজি বলতে পারি. ক্রিকেট খেলা বুঝি, অচেনা জায়গায় ভিক্ষে করি, মচ্ছবের খবর পেলে যাই, বিয়ে-বাড়ি দেখলে সুট্ করে ঢুকে পড়ি। এসব

অ্যাকটিভিটি থেকে একটা মানুষকে কোনো শ্রেণীতেই ফেলা যায় না। ভদ্রলোক, ছোটোলোক, ভিখিরি—কোনোটাই খাটে না···

মদন একটু হাসল এতক্ষণে, বলল—সেই নিজের শ্রেণীকে ফিরে পাওয়ার জন্যই তো আমাদের লড়াই· ·বলতে বলতে ভুল বুঝতে পেরে মদন একটু থমকে গেল, তারপর আবার বলল—আসলে আমাদের লড়াই শ্রেণীমুক্ত, শ্রেণীহীন সমাজের জন্য, আমাদের লড়াই—

ডালিম জিজ্ঞেস করল - কার সঙ্গে ?

—কার সঙ্গে ! ভারী অবাক হয় মদন, তারপর কনুই চুলকোতে চুলকোতে বলে—আমলা আর শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে।

হারু শ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল—তারা কারা ? কে আমলা, কে শ্রেণীশত্রু ?

মদন রেল-ইয়ার্ডের দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে বলল—বাবা।

আমরা চমকে উঠি। জিজ্ঞেস করি—তোর বাবা শ্রেণীশত্রু ? আমলা ?

মদন মাথা নেড়ে বলল—না। ঐ দেখ্ বাবা বাজার করে ফিরছে।

আমরা চেয়ে দেখি, মদনের বাবা হরিবাবু বাজারের ব্যাগ হাতে লাইন পার হয়ে ফিরছেন। দূর থেকে তাঁকে একটা কাঁকড়ার মতো দেখাচ্ছে !

মদন সেদিকে চেয়ে থেকে বলল—দুবছর বাদে বাবাকে দেখলাম। কী রোগা হয়ে গেছে দেখেছিস !

আমাদের মন নরম হয়ে যাচ্ছিল। চুপ করে রইলাম।

মদন একটা শাস ফেলে মুখ তুলে আমাদের দিকে চেয়ে বলল—তোরা এখনো এইভাবে সময় নষ্ট করিস। ওয়েটিং রুম আর ওভার-ব্রিজ ঘুরে ঘুরে জীবনটা কাটিয়ে দিলি। কত কিছু করার ছিল তোদের। বলে আমাদের মুখে সে একটু ভৎসনার চোখে তাকাল, বলল—আমি জেল খেটে এলাম, দ্যাখ, কত কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু এখানেই থামছি না। আবার যাবো জেল-এ। তারপরও আবার যাবো। এইভাবে একদিন জেলখানার দেয়াল ভেঙে পড়বে। ওরা যত মারবে, আমাদের লড়াই তত ছড়িয়ে পড়বে···

বাধা দিয়ে ডালিম বলল—খুব কষ্ট দেয় জেল-এ ?

বড় বড় চোখে চেয়ে মদন বলল—দেবে না ! চুল ছাঁটিনি কত দিন, মাথায় উকুনের বাসা, গায়ে চামড়ার নিচে একরকমের পোকা

হয়েছে, ভীষণ চুলকোয়, চামপোকা বলে। গাঁটে গাঁটে ব্যথা।

—খুব মারত ?

—জেল-এ মারধর নিষেধ। কিন্তু আমরা ফার্স্ট ক্লাস প্রিজ্‌নার-শিপের জন্য আন্দোলন করায় মারে, তারপর এনকোয়ারির সময়ে ওপরওয়ালা এলে ওরা রিপোর্ট দিল যে আমরা জেল থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিলাম বলে মেরেছে। উঃ, যাই এখন স্নান করব। বহরম-পুর থেকে টানা এসেছি, রাতে ঘুম হয়নি। কতকাল দাঁত মাজি না রে।

বলে মদন নেমে গেল।

গাড়ি চলে গেছে। প্লাটফর্ম আবার ফাঁকা। আমি ভাবছিলাম, যদি মদনদের কুয়োটাও বোম্‌-কাটা কুয়ো হয়ে থাকে আর ওর বাবা যদি জল মেপে থাকে তবে মদনের আজ স্নান হবে কিনা। আমি খুব গভীরভাবে ব্যাপারটা ভাবতে থাকি। সবসময়েই আমার মাথায় অদ্ভুত সব সমস্যার চিন্তা আসে।

হারু অনির্দিষ্ট ভাবে জিজ্ঞেস করল—সিগারেট আছে ?

কেউ উত্তর দিল না, জানা কথা, নেই।

গাড়ি চলে যাওয়ার পর নিকলসন প্লাটফর্মের বেঞ্চিতে বসে টুপি খুলে ঘাড় গলার ঘাম মোছে। তারপর একটু ঝিমোয়। আজও ঝিমোচ্ছে।

হারু উঠে বলল—যাই, নিকলসনর কাছে একটা বিড়ি পাই কিনা দেখি।

আস্ত এবং খাঁটি একটা সাহেব কাছেপিঠে থাকলে অনেক সুবিধে। বিশেষ করে ইংরিজির ব্যাপারে। হারু এখনো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড রিনিউ করে। দু-একটা ইণ্টারভিউও পায়। সেই-জন্যই ইংরিজিটা ঝালিয়ে রাখে। নিকলসনের সঙ্গে সে সবসময়ে ইংরিজিই বলে। অবশ্য এমনিতে দরকার হয় না, সাহেব ভাঙা বাংলা, হিন্দী, নেপালী দিব্যি বলে।

হারু দূর থেকেই বলল—গট্‌ বিড়ি হেঃ নিকলসন ?

নিকলসন চোখ খুলে ফোকলা হাসি হাসল, তারপর বলল—ন্যাও, গট্‌ খৈনি অ্যাণ্ড চুনা। ট্রাই ?

হারু একটু অবাক হয়ে বলে—খৈনি কবে থেকে সাহেব ? বলেই আবার ইংরিজি করে বলে—খৈনি ফ্রম হোয়েন নিকলসন ?

অঃও! বলে নিকলসন একটা শ্বাস ফেলে পকেট থেকে লম্বা দুমুখো কৌটো বার করে। তার এক মুখে চুণ, অন্য মুখে তামাক পাতা। পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে—রিসেন্টলি, ট্রাই? ভেরি চিপ। আই গাটেন এ হান্‌চ্‌ ফর ইট সিন্‌স্‌ লঙ, ডিডনট ট্রাই। বাট ইটস নাইস।

হারু খৈনির জন্য হাত বাড়ায়।

ডালিম আর বাদু উত্তর দিকে মুখ করে সবচেয়ে দূরে কে থুথু ফেলতে পারে তার কমপিটিশন দিচ্ছে। বাজি কুড়িটা কাঠি। নতুন লোকটা চোখ বুজে রেলিঙে হেলান দিয়ে বসে। আমি হারুর খৈনি খাওয়া দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে বললাম—আমার জন্য একটু আনিস হারু।

সে-কথার শব্দে নতুন লোকটা চোখ খুলে বলল—একটা কথা শুনেছেন?

—কী?

—উত্তরের মতো দক্ষিণেও একটা জংশন হবে।

—জানি।

লোকটা শ্বাস ফেলে বলল—দক্ষিণের জংশন উত্তরের চেয়ে পাঁচ-গুণ বড় হবে। আর তখন উত্তরের জংশনটা আমাদের এই স্টেশনের মতোই ফাঁকা পড়ে থাকবে।

—জানি।

—ছাই জানেন! লোকটা ধমকায়। তারপর আবার আপনমনে বলল—দক্ষিণের জংশনটা হবে পৃথিবীর চতুর্দশ বৃহত্তম জংশন, ভারতের বৃহত্তম! কিন্তু রেলমন্ত্রী বলেছেন যে ভারত ওখানেই থেমে থাকবে না। এরপর পুবদিকে যে জংশনটা হবে সেটা হবে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম, তারপর আবার তাঁরা প্ল্যান পাল্টাবেন। তখন পশ্চিমে হবে বিশ্বের বৃহত্তম জংশন। এইভাবেই ভারত তার পুরোনো প্রকল্প ছেড়ে বৃহত্তর নতুন প্রকল্প, এবং ক্রমে বৃহত্তম প্রকল্পগুলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম—যাঃ।

লোকটা চোখ ছোটো করে আমার দিকে চেয়ে বলল···যাঃ বলবেন না। আপনি অনেক কিছুই জানেন না। যেমন আজ সকাল পর্যন্ত আপনি জানতেন না যে টিকটিকি জল খায় না।

খুব লজ্জিত হয়ে পড়ি। বাস্তবিক, আমার জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ!

লোকটা বলল···ক্রমশ বিশ্বের বৃহত্তম প্রকল্প রচনায় ভারত রেকর্ড সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, বুঝলেন?

আমি মাথা নাড়ি।

লোকটা বলে···যখন একের পর এক জংশন শেষ হবে তখন আলটিমেটলি দেখবেন পশ্চিমের বৃহত্তম জংশন ছাড়া অন্য তিনটি জংশনই মাইনর স্টেশন হয়ে গেছে। এবং সে সব স্টেশনের ওয়েটিং রুমগুলো আমরা ক্রমে দখল করে নেবো। ওয়েটিংরুম দখলের লড়াইয়ে আমরা জিতবোই। অবশ্য ততদিনে আমাদের মতো শ্রেণীহীন সমাজের লোকও অনেক বেড়ে যাবে, আরো বেশি বেশি ওয়েটিংরুম দরকার হবে তখন! সেই ওয়েটিং রুমগুলো হবে শ্রেণীহীন সমাজের মুক্তাঞ্চল।

থুথু ফেলায় ডালিমের কাছে হেরে গিয়ে বাদু দশটা কাঠি দিয়ে দিল, আর দশটা বাকি রাখল। কাল দিয়ে দেবে। মুখ ঘুরিয়ে নতুন লোকটাকে বলল...আপনি আমার হয়ে জানেন।

লোকটা বলে...পরিষ্কার করে বলুন।

বাদু সবজান্তার মতো বলে—দক্ষিণে জংশন হবে ঠিকই। তবে উত্তরেরটার সঙ্গে দক্ষিণেরটার যোগাযোগ হবে আমাদের এই স্টেশনের ভিতর দিয়ে। তখন এই স্টেশন দিয়েও মেল ট্রেন যাবে। তিনটে স্টেশনই তখন ইম্পর্ট্যাণ্ট হয়ে উঠবে।

নিকলসন সাহেবের টুপির ভিতরের বোল্‌তাটার মতোই আমার মাথার মধ্যে একটা সমস্যার চিন্তা বোঁ করে ঢেকে চক্কর দিতে থাকে। আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে বলি—তাহলে ওয়েটিং রুমটার কী হবে?

বাদু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে···আবার সেগুন বা মেহগিনির চেয়ার-টেবিল আসবে, সুইং-ডোরটা সারানো হবে, মতের জায়গায় নতুন কেয়ারটেকার আসবে। তখন দেখবি, সুন্দর সুন্দর মানুষ আর মেয়ে-মানুষ গাড়ি থেকে নেমে আমাদের ওয়েটিং রুমে দু দণ্ড জিরিয়ে যাবে।

লোকটা একটু হাসল। তারপর বলল—বাদুবাবু, তার চেয়ে বলুন না, পৃথিবীটা আবার পিছিয়ে যাবে, ইংরেজরা ফিরে আসবে, নিকলসন মেমসাহেব নিয়ে ঘর করবে···

বাদু লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে। খুব রাগের চোখ।

লোকটা ঠাণ্ডা গলায় বলে—আপনি যা বলছেন তা হল পশ্চাদৎ

অসরণের কথা। আমি যা বলছি তা প্রগতির কথা। আমার কথাই ঠিক হবে, কারণ ভারত এখন প্রগতির মেল ট্রেনে উঠে পড়েছে, নামবার উপায় নেই, চেন টানলে আড়াই শো টাকা জরিমানা। তাকে যেতেই হবে। অতএব আগামী পাঁচ ছ' বছরের মধ্যেই আমরা আরো তিন তিনটে ওয়েটিং রুম পেয়ে যাচ্ছি।

মনে মনে আমি নতুন লোকটাকেই সমর্থন করতে থাকি। আমার মনে হয়, লোকটাই ঠিক বলছে। মনে মনে তাকে আমি ভীষণ সমর্থন করি, মনে মনেই পিঠ চাপড়ে দিই। বাদুর ভয়ে মুখে কিছু বলি না।

বাদু জিজ্ঞেস করল—আপনি ইয়ার্কি করছেন?

লোকটা প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে ছিল। প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চ-এ পাশা-পাশি বসে হারু নিকলসনের সঙ্গে প্রাণপণে ইংরিজিতে কথা বলেছে। দুজনেরই ঠোঁটের নিচে খৈনীর টিপি। সেই দিকেই চেয়ে লোকটা বলল—সাহেবটা একেবারে দ্বারভাঙ্গা জিলার লোক হয়ে গেল, দেখেছেন? আজকাল খুব চ্যবনপ্রাশ খায়। কার কাছে শুনেছে, চ্যবনপ্রাশে যৌবনোচিত শক্তি বাড়ে।

বাদু বলে—ওর মেম-বউকে নাকি রেল কোম্পানি এখনো ওর মাইনে থেকে কেটে মাসোহারা পাঠায়।

ডালিম অবাক হয়ে বলে—সে তো বিলেতে। বিলেতে কি ইণ্ডিয়ান টাকা পাঠানো যায়? আইনত পারে না।

বিলেত না আমার ইয়ে! বলে বাদু—ওর বউ কানপুরে এক সাহেব মুচিকে বিয়ে করে সেখানেই আছে। বিয়ে করলে মাসোহারা পায় না।

আমি অবাক হয়ে বলি—তাহলে সাহেব খৈনি খায় কেন?

বাদু আমাকে পাগল-দেখার মতো দেখে বলে—খৈনির সঙ্গে ওর মেম-বউয়ের কী সম্পর্ক?

আমার এইটাই হচ্ছে মুশকিল। মনের মধ্যে এমন সব চিন্তা আসে, এমনই জটিল সেসব চিন্তা যে হঠাৎ সেই চিন্তার কথা বলে ফেললে লোকে ঠিক বুঝতে পারে না। পাগল কিংবা বোকা ভাবে। আসলে আমি ভাবছিলাম, বউকে মাসোহারা পাঠাতে না হলে নিকল-সনের বেশ কিছু টাকা নিশ্চয়ই বেঁচে যায়। এবং সে ক্ষেত্রে খৈনি না খেলেও ওর চলে। অন্তত বিড়িটা তো ম্যানেজ হয়ই।

একমাত্র নতুন লোকটাই আমার কথা বুঝতে পারল বলে মনে হল।

সে আমার দিকে চেয়ে বলে—ঠিকই বলেছেন রণ্টেবাবু, ব্রিটিশ আমলে যখন ও কম মাইনে পেত তখন ওর মেম-বউ পুষত, গোল্ডফ্লেক সিগারেটও খেত। গত পঁচিশ বছর ধরে একটানা চেকারের চাকরি, মাইনে নিশ্চয়ই ওর আন্দাজ ভালোই এবং ব্রিটিশ আমলের চেয়ে বেশিই পায়, তবু ক্রমে ব্র্যাণ্ড পাল্টে বিড়ি হয়ে খৈনিতে পৌঁছে গেছে। কিন্তু খৈনির পর কী? হোআট নেকস্ট, সেইটাই সমস্যা। বলে লোকটা গভীর চিন্তা করতে থাকে।

আমি লোকটাকে ভাবতে দিয়ে আবার টিকটিকিদের কথা ভাবি। জল খায় না? টিকটিকি সতিই জল খায় না?

ডালিম হাই তুলে বলে—ছেঁদো কথায় কী হবে? মোটে সাড়ে দশটা বাজে, লম্বা দুপুর পড়ে আছে। রণ্টে ওয়েটিং রুমটার কী হবে? একবার মতের কাছে খোঁজ নিয়ে আয় না।

ওয়েটিং রুমের কথায় নতুন লোকটা ধ্যান ভেঙে তাকায়। তারপর আমাকে চূড়ান্ত সম্মান দিয়ে আমাকেই বলে—রণ্টেবাবু, একটা জিনিস লক্ষ করেছেন?

লোকটার জ্ঞানের কাছে আমি ক্রমেই বিকিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে উৎসুক হয়ে বলি—কী?

—ওয়েটিং রুমটা আমরা পেয়েছি বটে, কিন্তু বাথরুমটা পাইনি। ওটা এখনো মতে তালা দিয়ে রাখে।

আমি সত্যটা উপলব্ধি করতে থাকি। মাঝখানে বাদু বলে—মতে ুলে দেয় না যে, কী করব?

লোকটা চোখ ছোট করে বলে—তা হলে বলতেই হয় যে, আপনাদের জয় সম্পূর্ণ হয়নি। বাথরুমটা তালা দিয়ে রাখা কিন্তু চূড়ান্ত অপমান।

বলতে কি, এই ব্যাপারটা আমাদের বিশেষত আমার মাথায় কোনোদিনই আসেনি। ওয়েটিং রুমে বসবার অধিকার পেয়ে আমরা আনন্দে এতই আত্মহারা হয়ে যাই যে, বাথরুমটার তালার কথা মনেই হয়নি। আমরা যা পেয়েছি সেটার বিস্ময়ের ঘোরই এখনো কাটেনি। কিন্তু লোকটার কথায় আমার বুকের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ ছুঁয়ে গেল। বস্তুত একটু আগে জেল-ফেরত মদনের কাছে সংগ্রাম এবং লড়াইয়ের কথা শুনে আমার ভিতরটা তেতেই ছিল। আমি ঝাঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—মতের এটা ভারী অন্যায়।

নতুন লোকটা হাসল। ঠাণ্ডা গলায় নিকলসনের মতো ইংরিজিতে বলল—দ্যাটস দা স্পিরিট।

আম সিঁড়ি ভেঙে উত্তেজিতভাবে নেমে যাচ্ছিলাম। ডালিম ডেকে বলল—রণ্টে, বেশি মেজাজ দেখাসনি মতের সঙ্গে। বের করে দেবে। আজকাল দুপুরে কাঁটাল-পাকানো গরম পড়ে, শহরের আর কোথাও অমন মাগনা বসতে দেবে না—এ সব মনে রাখিস।

মতে ওয়েটিং রুমের দরজার সামনেই বশংবদ দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে চোখের ইশারায় ধমকালো দূর থেকে। অর্থাৎ ভিতরে এখনো মেহমান আছে তারপর কাছে এসে নিচু গলায় বলল—এখন চলে যান।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম কারা এসেছে?

—চা-বাগানের বড় বড় সাহেব সব। বাগান থেকে গাড়ি এসে নিয়ে যাবে, তাই ইনতেজার করছে। চলে গেলে আমি আপনাদের ডেকে দেবো।

আমার ভিতরের সংগ্রামী মনোভাব তখন অর্ধেক হয়ে এসেছে! কাছে পিঠে যদি এমন লোক থাকে সে খুব বড় অফিসার, কিংবা খুব শিক্ষিত বা খুব বড়লোক, তা হলেই আমার ভিতরটা কেমন যেন ভয় ভয় ভাবে ভরে ওঠে।

তবু আমি সাহস করে বললাম—মতে, তুমি আমাদের বাথরুমটা খুলে দাও না কেন?

বাথরুম! বলে মতে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দেখে আমাকে। তারপর বলে—বাথরুম দিয়ে কী হোবে?

আমি রাগ করে বলি—বাথরুম দিয়ে কী হয় তুমি জানো না?

মতে বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে পেসাপ করবেন তো? সে তো অ্যানেক জায়গা আছে। স্টেশনভর তো পেসাপেরই জায়গা, কত লোক করে যায়। বেগ পেলে লাইনের ধারে এসে ছেড়ে দেবেন। পিলাটফরম থেকে নামতেও হবে না। মালগুদামের পিছনে টাট্টি ভি করতে পারেন। ওদিকের পুখুরে জল ভি আছে।

আমি পয়েণ্ট খুঁজে পাই না। তার কথায় প্রায় সায় দিয়ে ফেলি আর কি! তবু কাইমাই করে একটা পয়েণ্ট খুঁজে পেয়ে বললাম—পুকুরটার জল তো নোংরা।

মতে উদার গলায় বলল—নোংরা আবার কি। কয়েকটা ভঁইস

বসে থাকে বলে একটু খোলা। জল-খরচে ওর চেয়ে ভাল জল দিয়ে কি হোবে?

হতাশ হয়ে আমি ফিরে আসি।

—কী হল? ডালিম জিজ্ঞেস করে।

—বাথরুম খুলে দেবে না।

—ঘরটা?

—বাগানের সাহেবরা আছে, তারা গেলে ডেকে দেবে।

সবাই অপেক্ষা করতে থাকি। এগারোটা বাজতে চলল। বাতাস তেতে উঠছে, ধুলো উড়ছে। সিঁড়ির নিচে ভিখিরিরা নাড়িভুঁড়ি সেদ্ধ করে নামিয়ে একগাদা তরকারির খোসা সেদ্ধ চাপিয়েছে। প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চ-এ ঘুমিয়ে পড়েছে নিকলস সাহেব, হাঁ-মুখ থেকে একটা বড় নীল মাছি বেরিয়ে এল। হারু অনেকটা তামাক পাতা নিয়ে এসেছে, আর চুন।

সকলের পকেটেই একটা দুটো লুকোনো সিগারেট আছে। কেউ তা বের করে না। যে বের করবে সে পাবে প্রথম পাঁচ টান, বাকি সবই তিন টান করে। তাই সবাই চেপে যায়। আমি হাত বাড়িয়ে খৈনি নিই। ঠোঁটে টিপে থুথু ফেলতে থাকি। নতুন লোকটা চোখ বুজে আছে। নতুন কিছু ভাবছে নিশ্চয়ই। লোকটা জানে অনেক।

ডালিম বলল—বাথরুমটা পেলে দুদিন বাদে স্নানটা হত।

লোকটা আবার চোখ খোলে। আমি উৎসুক ভাবে তাকাই।

লোকটা বলে—রণ্টেবাবু কোনো কাজের নয়। বাথরুমটা আমরা পাবোই—পেতেই হবে।

আমি একটু অপমানিত বোধ করলেও চেপে গেলাম। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে যদি আরো তিনটে ওয়েটিং রুম আমাদের দখলে আসে তবে কি তখনো বাথরুম তালা দেওয়া থাকবে? এই সমস্যাটা আমাকে ভাবিয়ে তোলে।

অনেকক্ষণ বাদে মতে এসে নিচে থেকে ডাকল—যান সব। ঘর খালাস হয়েছে। বকশিশ যেন মনে থাকে।

নতুন লোকটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠেই আমাদের সংগ্রামে ডাক দেয়—উঠুন, ওকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। সরকারী ওয়েটিং রুমে বসতে দেয়, তাতে তো ওর বাবার টাকা খরচ হয় না। ওসব সামান্য খাতিরে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। বাথরুম ওকে খুলে দিতেই হবে।

আমরা গিয়ে মতেকে ধরি।

—বাথরুম খুলে দাও। দিতেই হবে।

আমাদের মারমুখো মুখের দিকে চেয়ে মতে একটু থতিয়ে যায়। বলে—বাথরুম খুলে দিলে তা আপনারা নোংরা করবেন। আমি বুড়ো হয়েছি, হাতে বাত, ধোলাই করতে আমার জান বেরিয়ে যায়।

আমরা অনেক পয়েণ্ট পেয়ে যাই। নতুন লোকটা বলে—ধরো যদি এই স্টেশন আগের মতোই হত, রোজ প্যাসেঞ্জার নামত, তাহলে তো রোজই তোমাকে ধোলাই করতে হত! তখন কী করতে?

মতে গম্ভীর এবং করুণ মুখে বলে—সেদিন তো এখুনি নাই। এখন একটু সুখে আছি, আপনারা দিবেন না?

লোকটা সরকারী কর্মচারীদের গাফিলতির কথা তোলে। নেহরুর একটা কোটেশন দেয়, এবং ভবিষ্যতে স্টেশনগুলোর ওয়েটিং রুম দখলে শ্রেণীহীন সমাজের সংগ্রামী ভূমিকায় ভয়ও দেখায়। মতে ক্রমশ পয়েণ্ট লুজ করতে থাকে। শেষদিকে কেবল নিজের বুড়ো বয়সের অক্ষমতার উল্লেখ ছাড়া আর কোনো জোরালো পয়েণ্ট দিতে পারে না। তখন মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়ে লোকটা, বলে, তোমার বয়স কম করেও সত্তর।

মতে ভয় পেয়ে গিয়ে বলে—না না, ঐ নিকলসন সাহেবের উমর কেবল পঁচাত্তর। ঐ চোট্টা সাহেবটা ছাড়া আর আমরা কেউ, এই স্টেশনের কোনো গভরমিণ্টের লোক উমর ছিপাইনি!

নতুন লোকটা কিন্তু চূড়ান্ত জয়ের মুখোমুখি এসে গেছে। আমরা বুঝতে পারি। এবং চারদিক থেকে হই হই করে উঠি। মতে ঘাবড়ে যায়। তারপর সত্তর বছর বয়সের পক্ষে অত্যন্ত সাদা এবং সুন্দর দাঁত দেখিয়ে সে হেসে ফেলে। বলে—ঠিক আছে, মাঝে মধ্যে বিড়িটা সিগারেটটা দিবেন, চা-পানির পয়সা দিবেন, বাথরুম খুলে দিচ্ছি।

দুদিন বাদে স্নান করে ডালিম খুব খুশি। হারুকে গা শুকিয়ে বলল—দ্যাখ তো, আর সেই চাম্‌সে গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে?

—না। হারু শুঁকে বলল।

সবাই স্নান করলাম। ওপর থেকে ঝাঁঝরি দিয়ে কী মিঠে ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে জল যে পড়ল! আহা! ঘুম পেয়ে গেল। স্নানের পর বেশ ভালই দেখাতে লাগল আমাদের। তার সঙ্গে একটা লড়াই জেতার আনন্দ।

নতুন লোকটা আবার ডেক চেয়ারে বসেছে। পশ্চাদ্দেশ ঝুলে আছে ফুটো দিয়ে। টেবিলে আমরা চারজন, তাসগুলো আবার বাঁটা হচ্ছে। পিছন থেকেই তাসগুলো চেনা যায়। কিন্তু সামনে আরো অনেক দুপুর পড়ে আছে, আরো অনেক দিন। আমাদের কিছু করার নেই।

বাজে তাস পেয়ে আমি তাস ফেলে দিলাম। টিকটিকি কেন জল খায় না তা আবার গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম। আশ্চর্য এই যে, প্রতিদিনই এরকম নতুন কিছু না কিছু ভাববার জিনিস ঠিক পাওয়া যায়।

উত্তরের ব্যালকনি

ব্যালকনিতে দাঁড়ালে লোকটাকে দেখা যায়। উল্টোদিকের ফুটপাথে বকুল গাছটায় অনেক ফুল এসেছে এবার। 'ফুলে ছাওয়া গাছতলা।' সেইখানে নিবিড় ধুলোমাখা ফুলের মাঝখানে লোকটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, জামার রঙ ঘন নীল। পরনে একটা খাকি রঙের ফুলপ্যাণ্ট—লজ্জাকর জায়গাগুলিতে প্যাণ্টটা ছিঁড়ে হাঁ হয়ে আছে। মাথায় একটা ময়লা কাপড়ের ফগ্‌গে জড়ানো। পিঙ্গল দীর্ঘ চুলগুলি আস্তে আস্তে জটা বাঁধছে। গালে দাড়ি বেড়ে গেছে অনেক, তাতে দুচারটে সাদা চুল। গায়ে চিট ময়লা, কনুইয়ে ঘা, তাতে নীল মাছি উড়ে উড়ে বসে। এই হচ্ছে লোকটা। দু-পা ছড়িয়ে নির্বিকার বসে আছে, দুই চোখে অবিরল ক্লান্তিহীন তাকিয়ে থাকে। ঘা থেকে উড়ে মাছিগুলি চোখের কোণে এসে বসে। লোকটা দুহাত তুলে চেঁচিয়ে বলে—সরে যা, সরে যা, মেল ট্রেন আসছে।

পাগল।

সকালে ভাত খেয়ে একটা পান মুখে দেয় তুষার। সুগন্ধী জর্দা খায়। তারপর পিক ফেলতে আসে ব্যালকনিতে। ফুটপাথের ধারে কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার একটা ড্রাম আছে। অভ্যাসে লক্ষ্য স্থির হয়। তুষার একটু ঝুঁকে দোতলার ব্যালকনি থেকে সাবধানে পিক ফেলে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। পিকটা ঠিক গিয়ে পড়ে সেই ড্রামটায়। এদিক-ওদিক হয় না। অনেক দিনের অভ্যাস।

পিক ফেলে তুষার বকুলগাছের তলার সেই লোকটাকে একটু দেখে। পাগল। তবু এখনো চেনা যায় অরুণকে। চেনা যায়? তুষার একটু ভাবে। কিন্তু অরুণের আগের চেহারাটা কিছুতেই সে মনে করতে পারে না। ফর্সা রঙ, ভোঁতা নাক, বড় চোখ—এইরকম কতগুলি বিশেষণ মনে পড়ে, কিন্তু সব মিলিয়ে চেহারার যে যোগফল—সেই যোগফলটাই একটা মানুষ—সেই মানুষটার নাম ছিল অরুণ—সেই অরুণকে কিছুতেই সব মিলিয়ে মনে পড়ে না। তবু তুষারের মনে হয়,

এখনো অরুণকে চেনা যায়। কিন্তু আসলে বোধহয় তা নয়। অরুণকে আর চেনা যায় না বোধহয়। তবু তুষারের যে অরুণকে চেনা মনে হয় তার কারণ, গত পাঁচ বছর ধরে অরুণ ঐ গাছতলায় বসে আছে। ঐ-খানে বসে থেকে থেকেই তার চুল জট পাকাল, গালে দাড়ি বাড়ল, গায়ে ময়লা বসল—এই সব পরিবর্তন হল অরুণের। রোজ দেখে দেখে সেই পরিবর্তনটা অভ্যস্ত লাগে তুষারের। তাই অনেক পরিবর্তনের ভিতরেও আজও অরুণকে চেনা লাগে তার।

পাগলটা মুখ তুলে তুষারের দিকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগল। তার চারদিকে শোষক নীল মাছি উড়ছে। পাগলটার চোখে এখন আর কিছু নেই। প্রথম প্রথম তুষার ঐ চোখে ঘৃণা, আক্রোশ, প্রতিশোধ—এই সব কল্পনা করত। ব্যালকনি থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসত ঘরে, পারতপক্ষে ব্যালকনির দরজা খুলত না। কিন্তু আস্তে আস্তে তুষার বুঝে গেছে, পাগলটার চোখে কিছু নেই। কেবল অবিন্যস্ত চিন্তারাশি বয়ে যায় মাথার ভিতর দিয়ে, ওর চোখ কেবল সেই প্রবহমানতাকে লক্ষ করে অসহায় শূন্যতায় ভরে ওঠে। তুষার এখন তাই পাগলটার দিকে নির্ভয়ে চেয়ে থাকতে পারে। কোনো ভয় নেই।

পাগল মাতাল আর ভূত—অনেক ভয়ের মধ্যে এই তিনটের ভয় সবচেয়ে বেশি ছিল কল্যাণীর! তার বিশ্বাস ছিল, বাসার বাইরে যে বিস্তৃত অচেনা পৃথিবী সেখানে গিজগিজ করছে পাগল আর মাতাল। আর চারপাশে যে অদৃশ্য আবহমণ্ডল তাতে বাস করে ভূতেরা, অন্ধকারে একা ঘরে দেখা দেয়।

কোনো পাগলের চোখের দিকে কল্যাণী কখনো তাকায়নি। এখন তাকায়। ভয় করে না কি? করে। তবু অভ্যাসে মানুষ সব পারে।

পান খাওয়ার পর অভ্যাস মতো বাথরুমে গিয়ে মুখ কুলকুচো করে আসে তুষার। তারপর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খায়। পানে খয়ের খায় না বলে ওর ঠোঁট লাল হয় না। তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে সাবধানে ঠোঁট মোছে তুষার। প্যাণ্ট শার্ট পরে। তারপর অফিসে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময়ে অভ্যাস মতো বলে—সদরের দরজাটা বন্ধ করে দাও!

কল্যাণী সদর বন্ধ করে।

শোওয়ার ঘরের মেঝেতে বসে জলের গ্লাস রংের বাক্স ছড়িয়ে কাগজে ছবি আঁকছে তাদের পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে। সোমা এখনও কেবল গাছ লতাপাতা, আঁকে। আর আঁকে খোপাসুদ্ধু মেয়েদের মুখ। বয়সের তুলনায় সোমার আঁকার হাত ভালই। তার আঁকা গাছপালা, মুখ সব প্রায় একই রকমের হয়, তবু মেয়েটা বিভোর হয়ে আঁকে। সারাদিন।

আজও লম্বা নিম পাতার মতো পাতাওয়ালা একটা গাছ আঁকছে সোমা। একটু দাঁড়িয়ে সেটা দেখল কল্যাণী। তারপর বলল—স্নান করতে যাবি না?

—যাচ্ছি মা, আর একটু—

মেয়ের ঐ এক জবাব।

—বড্ড অনিয়ম হচ্ছে তোমার। ঐ সব আজেবাজে এঁকে কী হয়?

—এই তো মা, হয়ে এল—বিভোর সোমা জবাব দেয়।

সামনের বছর স্কুলে ভর্তি হবে যখন তখন দেখবে। সময়মতো স্নান খাওয়া, সময়মতো সব কিছু। এই সব তখন চলবে না—

বলতে বলতে কল্যাণী অলস পায়ে তুষারের স্নান করা ভেজা ধুতিটা হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে আসে।

যখন তুষার থাকে, তখন কখনো কল্যাণী ব্যালকনিতে আসে না। সারা সকাল রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট যায় খুব, তুষারকে খাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে কল্যাণী অবসর পায়। স্নানের আগে বাঁধা চুল খুলতে খুলতে অলস পায়ে এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। তাকায়।

আকীর্ণ ধুলোমাখা ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। বসে আছে অরুণ।

ব্যালকনিটা উত্তরে। গ্রীষ্মের রোদ পড়ে আছে। কল্যাণীর গায়ে রোদ লাগল, সেই রোদ বোধহয় কল্যাণীর গায়ের আভা নিয়ে ছুটে গেল চরাচরে। পাগলটা বকুল গাছের নিবিড় ছায়া থেকে মুখ তুলে তাকাল।

এখন কল্যাণী পাগলের চোখে চোখ রাখতে পারে। ভয় করে না। কী করে। তবু অভ্যাস। পাঁচ বছর ধরে পাগলটা বসে আছে ঐ বকুল-গাছের তলায়। পাঁচ বছর ধরে উত্তরের এই ব্যালকনিটাকে লক্ষ্য করছে ও। ভয় করলে কি চলে।

কল্যাণী গ্রীষ্মের রোদে ব্যালকনির রেলিঙ থেকে তুষারের ভেজা ধুতিটা মেলে দেয়। তারপর দাঁড়িয়ে চুল খোলে, অলস আঙুলে ভাঙে চুলের জট।

পাগলটা তাকিয়ে আছে।

এখান থেকেই দেখা যায়, ওর ফাঁক হয়ে থাকা মুখের ভেতরে নোংরা হলদে দাঁত, পুরু ছ্যাতলা পড়েছে। ঘুমের সময়ে নাল গড়িয়ে পড়েছিল বুঝি, গালে শুকিয়ে আছে সেই দাগ। দুর্গন্ধ মুখের কাছে উড়ে উড়ে বসছে নীল মাছি।

ঐ ঠোঁট জোড়া ছ'সাত বছর আগে কল্যাণীকে চুমু খেয়েছিল একবার। একবার মাত্র। জীবনে ঐ একবার। তাও জোর করে। এখন ঐ নোংরা দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই কথা ভাবলে বড় ঘেন্না করে।

দুপুর একটু গড়িয়ে গেলে ঠিকে ঝি মঙ্গলা এসে কড়া নাড়ে। তখন ভাতঘুমে থাকে কল্যাণী। ঘুম চোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। মঙ্গলা যখন রান্না ঘরের এঁটোকাটা মুক্ত করতে থাকে তখন কল্যাণী রোজকার মতোই ঘুম গলায় বলে—ভাতটা দিয়ে এসো।

নিয়ম। প্রথম যখন পাগলটা ঐ গাছতলায় এল তখন এই নিয়ম ছিল না। পাগল চিৎকার করত, আকাশ বাতাসকে গাল দিত। চিৎকার করে হাত তুলে বলত টেলিগ্রাম....টেলিগ্রাম...! তখন ঘরের মধ্যে তুষার আর কল্যাণী থাকত কাঁটা হয়ে। পাগলটা যদি ঘরে আসে। যদি আক্রমণ করে। তারা পাপবোধে কষ্ট পেত। অকারণে ভাবত অরুণের প্রতি তারা বড় অবিচার করছে। কিন্তু আসলে তা নয়। অরুণকে কখনো ভালোবাসেনি কল্যাণী, সে ভালোবাসত তুষারকে। অরুণের সঙ্গে তুষারের তাই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। তুষারের ছিল সহজ জয়। অরুণের ছিল পৃথিবী হারানোর দুঃখ। সেই দুঃখ তার দুর্বল মাথা বহন করতে পারেনি। তাই লোভ, ক্ষোভ, আক্রোশ-বশত সে এসে বসল তুষার-কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায়। চৌকি দিতে লাগল, চিৎকার করতে লাগল। সংসারের ভিতরে তুষার আর কল্যাণী ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, দরজা-জানালা খুলত না।

—চলো, অন্য কোথাও চলে যাই। কল্যাণী বলত।

—গিয়ে লাভ কী? ও ঠিক সন্ধান করে সেখানেও যাবে।

আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল। অরুণ গাছতলা পর্যন্ত এল। তুষার কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায় বসে রইল। কিন্তু তার বেশি এগোলো না। চিৎকার করত, কিন্তু কল্যাণীর নাম উচ্চারণ

করত না, তুষারেরও না। লোকে তাই বুঝতে পারল না, পাগলটা ঠিক এখানেই কেন থানা গেড়েছে।

ভয় কেটে গেলে মানুষের মমতা জন্মায়।

তুষার একদিন বলল—ওকে কিছু খেতে দিও। সারাদিন বসে থাকে।

কেন ?

—দিও। ও তো কোনো ক্ষতি করতো না। বরং ওর ক্ষতি হয়েছে অনেক। আমরা একথালা ভাতের ক্ষতি স্বীকার করি না কেন !

সেই থেকে নিয়ম। কল্যাণী দুবেলা ভাত বেড়ে রাখে। ঠিকে ঝি দুপুর গড়িয়ে আসে। অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত, অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে জল দিয়ে আসে। পাগলটা খিদে বোঝে। তাই গোগ্রাসে খায়, জল পান করে। অবশ্য খেতে খেতে কিছু ভাত ছড়িয়ে দেয়। কাকেরা উড়ে উড়ে নামে, চেঁচায়, নীল মাছির ভিড় জমে যায়। খাওয়ার শেষে পাগলটা এঁটো হাত নিশ্চিন্ত মনে জামায় মোছে। গাছের গুঁড়িতে মাথা হেলিয়ে ঘুমোয়।

ঘুমোয় ! না, ঠিক ঘুম নয়। এক ধরনের ঝিমুনি আসে তার। আর সেই ঝিমুনির মধ্যে অবিরল বিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোত কুলকুল করে তার মাথার ভিতর দিয়ে বয়ে যায়। চোখ বুজে সে সেই আশ্চর্য স্রোতস্বিনীকে প্রত্যক্ষ করে।

মঙ্গলা আপত্তি করত—আমি ভিখিরির এঁটো মাজতে পারব না, মা।

মাইনের ওপর তাকে তাই উপরি তিনটে টাকা দিতে হয়।

মঙ্গলা ভাত নিয়ে গিয়ে পাগলটার সামনে ধরে দেয়। তারপর একটু দূরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় গাল পাড়ে—হাভাতে, পাগল, রোজ ভাতের লোভে বসে থাকা ! কপালও বটে তোর, এমন বাসার সামনে আস্তানা গাড়লি যে তারা তোকে সোনার চোক্ষে দেখল।

ভাতঘুমে রোজ কল্যাণী মঙ্গলার গাল শুনতে পায়।

আগে আলাদা ভাত যত্ন করে বেড়ে দিত কল্যাণী। ক্রমে সেই সব যত্ন কমে এসেছে। এখন তুষারের পাতের ভাত, সোমার ফেলে দেওয়া মাছের টুকরো, নিজের ভুক্তাবশেষ সবই অ্যালুমিনিয়ামের থালাটায় ঢেলে দেয়। পাগলটা সব খায়।

গত বছর একটা প্রমোশন হয়েছে তুষারের জুনিয়ার থেকে। এখন

সে সিনিয়র একজিকিউটিভ। নিজের কোম্পানির দশটা শেয়ার কিনেছে সে। ফলে সারাদিন তার দম ফেলার সময়ই নেই।

বিকেলের আলো জানালার শার্সিতে ঘরে আসে। তখন এয়ার-কণ্ডিশন করা ঘরখানায় সিগারেটের ধোঁয়া জমে ওঠে। কুয়াশার মতো আবছা দেখায় ঘরখানা। তখন খুব মাথা ধরে তুষারের। ঘাড়ের একটা রগ টিকটিক করে নাড়ে। অবসন্ন লাগে শরীর। সিগারেটে সিগারেটে বিস্বাদ, তেতো হয়ে যায় জিব। চেয়ার ছেড়ে উঠবার সময় প্রায়ই টের পায়, দুই পায়ে খিল ধরে আছে। চোখে একটা আঁশ আঁশ ভাব।

অফিসের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেবল বেকায়দায় আটকে থাকা তার ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটি তাড়াতাড়ি তার কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। ঘর ঝাঁট দিচ্ছে জমাদার। চাবির গোছা হাতে দারোয়ান এঘর ওঘর তালা দিচ্ছে।

দীর্ঘ জনশূন্য করিডোর বেয়ে তুষার হাঁটতে থাকে। নরম আলোয় সুন্দর করিডোরটিকে তখন তার কলকাতার ভূগর্ভের ড্রেন বলে মনে হয়।

বাইরে সুবাতাস বইছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এই প্রথম ফুসফুস ভরে বাতাস টানে সে। কোনো কোনো দিন এইখানে দাঁড়িয়েই ট্যাক্সি পেয়ে যায়। আবার কোনো কোনো দিন খানিকটা হাঁটতে হয়।

আজ ট্যাক্সি পেল না তুষার। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপরে হাঁটতে লাগল।

একটা বিশাল বাড়ির কাঠামো উঠছে। দশ কি বারোতলা উঁচু লোহার খাঁচা। ইঁট কাঠ বালি আর নুড়ি পাথরের স্তূপ ছড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে কংক্রিট মিক্সার, ক্রেন হ্যামার উটের মতো গ্রীবা তুলে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা প্রায় জনশূন্য। কুলিদের একটা বাচ্চা ছেলে পাথর কুড়িয়ে ক্রমান্বয়ে একটা লোহার বিমের গায়ে টং টং করে ছুঁড়ে মারছে। ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দটা শোনে তুষার। শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ঐ তুচ্ছ শব্দটি—ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম—তার মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে আবার ফিরে তাকায়। লোহার প্রকাণ্ড, ভয়ঙ্কর সেই কাঠামোর ভিতরে ভিতরে দিনশেষের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। চারিদিক আকীর্ণ আবর্জনার মতো ইঁট কাঠ পাথরের স্তূপ। ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম শব্দটি সেই অন্ধকার কাঠামোর অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছুটে আসছে।

ঐ শব্দ যেন কখনো শোনেনি তুষার। তার শরীরের অভ্যন্তরে অবদমিত কতগুলি অনুভূতি দ্রুত জেগে ওঠে। তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে —ছুটি চাই, ছুটি চাই। মুক্তি দাও, অবসর দাও।

কিসের ছুটি! কেন অবসর! সে পর মুহূর্তেই অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে। কিন্তু উত্তর পায় না। প্রতিদিন নিরবচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে ডুবে থাকা—এ তার ভালই লাগে। ছুটি নিলে তার সময় কাটে না। বেড়াতে গেলে তার অফিসের জন্য দুশ্চিন্তা হতে থাকে। কাজের মানুষদের যা হয়।

তবু সে বুঝতে পারে, তার মধ্যে এক তীব্র অনুভূতি তাকে বুঝিয়ে দেয়—কী রহস্যময় বন্ধন থেকে তার সমস্ত অস্তিত্ব মুক্তি চাইছে। ছুটি চাইছে। চাইছে অবসর। সে তন্ন তন্ন করে নিজের ভিতরটা খুঁজতে থাকে। কিছুই খুঁজে পায় না। কিন্তু তীব্র অজানা ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষায় তার মন মুচড়ে ওঠে।

আবার সে পিছন ফিরে সেই লোহার কাঠামো দূর থেকে দেখে। সেখানে অন্ধকার জমে উঠেছে। একটা বাচ্চা ছেলে অদৃশ্যে এখনো পাথর ছুঁড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে।

চৌরঙ্গীর ওপরে তুষার ট্যাক্সি পায়।

—কোথায় যাবেন?

ঠিক বুঝতে পারে না তুষার, কোথায় সে যেতে চায়। একটু ভাবে। তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে—সোজা চলুন।

গাড়ি সোজা চলতে থাকে দক্ষিণের দিকে, যেদিকে তুষারের বাসা। সেদিকে যেতে তুষারের ইচ্ছা করে না। বাড়ি ফেরা—সেই একঘেয়ে বাড়ি ফেরার কোনো মানে হয় না।

সে ঝুঁকে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে—সামনের বাঁদিকের রাস্তা।

এলগিন রোড ধরে ট্যাক্সি ঘুরে যায়।

কোথায় যাবো। কোথায়। তুষার তাড়াতাড়ি ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে মোড় এসে যায়। এবার? ভিতরে সেই তীব্র ইচ্ছা এখনো কাজ করছে। অন্ধকারময় একটা বাড়ির কাঠামো—লোহার বিমে নুড়ি ছুঁড়ে মারার শব্দ—তুষারের বুক ব্যথিয়ে ওঠে। মনে হয় —কেবলই মনে হয়—কী একটা সাধ তার পূরণ হয়নি। এক রহস্যময় অস্পষ্ট মুক্তি-বিনা বৃথা চলে গেল জীবন।

সে আবার বলে—বাঁয়ে চলুন।

ট্যাক্‌সি দক্ষিণ থেকে আবার উত্তর মুখে এগোতে থাকে। আবার সার্কুলার রোড। গাড়ি এগোয়। ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে তুষার।

একটা বিশাল পুরানো বাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। তুষার সেই বাড়িটাকে দেখল। কী একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ল না। আবার বাড়িটা দেখল। হঠাৎ পাঁচ-সাত বছর আগেকার কয়েকটা দুরন্ত দিনের কথা মনে পড়ল। নিনি। নিনিই তো মেয়েটির নাম।

গাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল, তুষার গাড়ি ঘোরাতে বলল।

সেই বিশাল পুরানো বাড়িটার তলায় এসে থামে গাড়ি।

•

হাতে সদ্য কেনা এক প্যাকেট দামী সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে সেই পুরানো বাড়ির তিন তলার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে তুষার ভাবে —এখনো নিনি আছে কি এখানে? আছে তো!

বাড়িটায় অসংখ্য ঘর আর ফ্ল্যাট। ঠিক ঘর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তার ওপর পাঁচ সাত বছর আগেকার সেই নিনি এখনো এখানে আছে কিনা সন্দেহ। যদি না থেকে থাকে তবে ভুল করে ঢুকে বিপদে পড়বে না তো তুষার?

একটু দাঁড়িয়ে ভেবে, একটু ঘুরে ফিরে দেখে তুষার ঘরটা চিনতে পারল। দরজা বন্ধ। বুক কাঁপছিল, তবু দরজায় টোকা দিল তুষার।

দরজা খুললে দেখা গেল, নিনিই। অবিকল সেইরকম আছে।

চিনতে পারল না, ভ্রূ তুলে ইংরিজিতে বলল—কাকে চাই?

তুষার হাসল—চিনতে পারছ না?

নিনি ওপরের দাঁতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু ভাবল। তুষার দেখল ডান দিকের একটা দাঁত নেই। সেই দাঁতটা বাঁধানো, দাঁতের রঙ মেলেনি! পাঁচ বছরে অন্তত এইটুকু পাল্টেছে নিনি।

—আমি তুষার।

নিনির মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এবার বাংলায়—আঃ, তুমি কি সেইরকম দুষ্টু আছো! বুড়ো হওনি!

—আগে বলো, তুমি সেই নিনি আছো কিনা! তোমার স্বামী-পুত্র হয়নি তো! হয়ে থাকলে দোরগোড়া থেকেই বিদায় দাও।

নিনি ঠোঁট উল্টে বলল—আমার ওসব নেই। এসো।

ঘরে সেই রঙিন কাগজে ছাওয়া দেওয়াল, ভাড়া করা ওয়ার্ডরোব, মেয়েলি আসবাবপত্র। এখনো সেণ্ট-পাউডার ফুলের গন্ধ ঘরময়। বিছানার মাথার কাছে গ্রামোফোন, টেবিলে রেডিও আর গিটার।

নিনি কয়েক পলক তাকিয়ে বলল—তুমি একটুও বদলাওনি।

—তুমিও।

কিন্তু তুষারের ভিতরের তীব্র ইচ্ছাটা এখনো অস্থির অন্ধের মতো বেরোবার পথ খুঁজছে। সে কি এইখানে তৃপ্ত হবে? হবে তো? উত্তেজনায়, অস্থিরতায় সে কাঁপতে থাকে।

ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলে সাবধানে গুপ্ত জায়গা থেকে একটা দামী মদের বোতল বের করে নিনি, তারপর হেসে বলে—এই মদ কেবল আমার বিশেষ অতিথিদের জন্য।

এই সবই তুষারের জানা ব্যাপার। ঐ যে গোপনতার ভান করে দামী বোতল বের করা ওটুকু নিনির জীবিকা! তুষারের মনে আছে নিনি বারবার তাকে এই বলে সাবধান করে দিত—মনে রেখো এটা ভদ্র জায়গা। আর, আমি বেশ্যা নই। মাতাল হয়ো না, হুল্লোড় কোরো না।

তুষার হাসল। সে বারবার নিনির কাছে মাতাল হয়ে হুল্লোড় করেছে।

তুষার আজ মাতাল হওয়ার জন্য উগ্র আগ্রহে প্রস্তুত ছিল। একটু-তেই হয়ে গেল। তখন তীব্র মাদকতাময় একটা গত গিটারে বাজাচ্ছিল নিনি। ওত পেতে অপেক্ষা করছিল তুষার। বাজনার সময়ে নিনিকে ছোঁয়া বারণ। বাজনা থামলে তারপর—

ভিতরে তীব্র ইচ্ছেটা গিটারের শব্দে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

মুক্তি। সামনেই সেই মুক্তি। চোখের সামনে আবার সেই খাড়া বিশাল লোহার কাঠামোতে ঘনায়মান অন্ধকার, লোহার বিমে নুড়ির শব্দ।

বাজনা থামতেই বাঘের মতো লাফ দিল তুষার।

তীব্র আশ্লেষ-ইচ্ছা, আনন্দময় আবরণ-উন্মোচন, তারই মাঝখানে হঠাৎ ব্যথায় ককিয়ে ওঠে নিনি—থামো, থামো, আমার বড় ব্যথা—

তুষার থামে—কী বলছ?

নিনি ঘর্মাক্ত মুখে ব্যথায় নীল মুখ তুলে বলে—এইখানে বড় ব্যথা—

পেটের ডান ধার দেখিয়ে বলে—গত বছর আমার একটা অপা-রেশন হয়েছিল। অ্যাপেন্ডিসাইটিস—

তুষারের স্খলিত হাত পড়ে যায়। পাঁচ বছরে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সব কিছু কি আর ফিরে পাওয়া যায়?

সময় পেরিয়ে গেল তুষার ফিরল না।

বিকেলে চুল বেঁধেছে কল্যাণী। সেজেছে। চায়ের জল চড়িয়ে-ছিল, ফুটে ফুটে সেই জল শুকিয়ে এসেছে। গ্যাসের উনান নিভিয়ে কল্যাণী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। উত্তরে ব্যালকনি, উল্টোদিকে ফুটপাথে সেই বকুলগাছ, গাছতলায় ধুলো-মাখা আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। একটু দূরে বসে একটা রাস্তার কুকুর পাগল-টাকে দেখছে।

দৃশ্যটাকে করুণ বলা যায়। আবার বলা যায়ও না। অরুণকে নিয়ে এখন আর ভাববার কিছু নেই। এখন সে রাস্তার পাগল। মুক্ত পুরুষ।

এখন ব্যালকনিটা অন্ধকার। পিছনে ঘরের আলো। তাই রাস্তা থেকে কল্যাণীকে ছায়ার মতো দেখায়। পাগলটা মুখ তুলে ছায়া-ময়ী কল্যাণীকে দেখে। টুপটাপ বকুল ঝরে পড়ে। অবিরল পাগলটা হাত বাড়িয়ে ফুল তুলে নেয়। লম্বা নোংরা নখে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে ফুল। রাত বাড়ছে। তার খিদে পাচ্ছে।

পুরানো বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে অনেকক্ষণ হল রাস্তায় নেমে এসেছে তুষার। কখনো নির্জন সেক্সপিয়ার সরণী, কখনো চলাচলকারী মানুষের মধ্যে চৌরঙ্গি রোড ধরে বহুক্ষণ হাঁটল সে। এখনো মাঝে মাঝে উঁচু বাড়ির লোহার কাঠামোর ভিতরে ঘনায়মান অন্ধকার তার মনে পড়ছে, মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছে নেপথ্যে কে যেন নুড়ি ছুঁড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে। তার মন বলছে এখানে নয়, এখানে নয়। চলো সমুদ্রে যাই। কিংবা চলো পাহাড়ে, ছুটি নাও। মুক্তি নাও। বৃথা বয়ে যাচ্ছে সময়।

কেন যে এই ভুতুড়ে মুক্তির ইচ্ছা? সে কি চাকরি করতে করতে ক্লান্ত? সে কি সংসারের একঘেয়েমি আর পছন্দ করছে না? কল্যাণীর আকর্ষণ সব কি নষ্ট হয়ে গেল?

বেশ রাত করে সে বাড়ি ফিরল।

সোমা ঘুমিয়ে পড়েছে। কল্যাণী দরজা খুলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—মদ খেয়েছো?

—খেয়েছি।

—আর কোথায় গিয়েছিলে?

—কোথায় আবার?

কল্যাণী বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে।

ভারী বিরক্ত হয় তুষার—কাঁদছো কেন? মদ তো আমি প্রথম খাচ্ছি না! আমাদের যা স্ট্রেইন হয় তাতে না খেলে চলে না—

কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ তীব্র মুখ তোলে কল্যাণী—শুধু মদ! মেয়েমানুষের কাছে যাওনি? তোমার ঠোঁটে গালে শার্টে লিপস্টিকের দাগ—তোমার গায়ে সেন্টের গন্ধ—যা তুমি জন্মে মাখো না—

তুষার অপেক্ষা করতে লাগল। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

অনেকটা রাত হল আরো। বেশ পরিশ্রম করতে হল তুষারকে। তারপর রাগ ভাঙল কল্যাণীর। উঠে ভাত দিল।

বাইরে বকুল গাছের তলায় তখন পাগলটা অনেকগুলি ফুল নখে ছিঁড়ে স্তূপ করেছে। উগ্র চোখে সে চেয়ে আছে অন্ধকার ব্যালকনিটার দিকে। ঘরের দরজা বন্ধ। তার খিদে পেয়েছে। মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে বলছে—অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার। কোই হ্যায়।

সেই ডাক শুনতে পেল তুষার। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল—পাগলটাকে রাতের খাবার দাওনি?

—কী করে দেবো? রোজ মঙ্গলা রাতে একবার আসে খাবারটা দিয়ে আসতে। আজ আসেনি, ওর ছেলের অসুখ।

—আমার কাছে দাও, দিয়ে আসছি।

—তুমি দেবে? অবাক হয় কল্যাণী।

—নয় কেন?

—শুধু দিয়ে আসা তো নয়। বাবুর খাওয়া হলে এঁটো বাসন নিয়ে আসতে হবে। পাগলের এঁটো তুমি ছোঁবে?

তুষার হাসল—তোমার জন্য ও অনেক দিয়েছে। ওর জন্য আমরা কিছু দিই—

থালায় নয়, একটা খবরের কাগজে ভাত বেড়ে দিল কল্যাণী।

তুষার সেই খবরের কাগজের পোঁটলা নিয়ে বকুল গাছটার তলায় এল।

পাগলটা তুষারের দিকে তাকালও না। হাত বাড়িয়ে পোঁটলাটা নিল। খুলে খেতে লাগল গোগ্রাসে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা সিগারেট খেতে খেতে দেখতে লাগল তুষার।

—খাওয়া ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝো না অরুণ?

পাগলটা মুখ তুলল না। তার খিদে পেয়েছে। সে খেতে লাগল।

—ঐখানে, ঐ ব্যালকনিতে মাঝে মাঝে কল্যাণী এসে দাঁড়ায়। তাকে দেখ না? তার বাঁ গালে সেই সুন্দর কালো আঁচিলটা এখনো মাছির মতো বসে থাকে—দেখ না? এখনো আগের মতোই ভারী তার চোখের পাতা, দীর্ঘ গ্রীবা, এখনো তেমনি উজ্জ্বল রঙ। চেয়ে দেখ না অরুণ?

পাগল গ্রাহ্যও করে না। তার খিদে পেয়েছে। সে খাচ্ছে।

আকাশে মেঘ করেছে খুব। তুষার মুখ তুলে দেখল। পিঙ্গল আকাশ, বাতাস থম ধরে আছে। ঝড় উঠবে। এই ঝড়বৃষ্টির রাতেও বাইরে থাকবে পাগল। হয়তো কোনো গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াবে। ঝড় খাবে। আর অবিরল নিজের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্ন চিন্তার এক স্রোতস্বিনীকে করবে প্রত্যক্ষ।

—তোমার কোনো নিয়ম না মানলেও চলে, তবু কেমন নিয়মে বাঁধা পড়ে গেছো অরুণ। তোমার মুক্তি নেই।

ডাল তরকারিতে মাখা কাগজটা ছিঁড়ে গেছে। ফুটপাথের ধুলোয় পড়েছে ভাত। পাগল তার নোংরা হাতে, নখে খুঁটে খাচ্ছে। একটা রাস্তার কুকুর বসে আছে অদূরে, আর দুটো দাঁড়িয়ে আছে। তুষার চোখ ফিরিয়ে নিল।

ঘর অন্ধকার হতেই সেই লোহার কাঠামো, তার ভিতরকার ঝুঝুকো আঁধার আর একবার দেখা গেল। লোহার বিমের গায়ে নুড়ি পাথরের টুং টুং শব্দ। অবিরল অবিশ্রাম। বুকে খামচে ধরে মুক্তির তীব্র সাধ। কিসের মুক্তি? কেমন মুক্তি? কে জানে। কিন্তু তার ইচ্ছা উত্তপ্ত পারদের মতো লাফিয়ে ওঠে।

আকুল আগ্রহে সে আবার বাতি জ্বালে। কল্যাণী বলে—কী হল?

উত্তেজিত গলায় তুষার ডাকে—এসো তো, এসো তো কল্যাণী।

তারপর সে নিজেই হাত বাড়িয়ে মশারির ভিতর থেকে টেনে আনে

কল্যাণীকে। আনে নিজের বিছানায়। কল্যাণী ঘেমে ওঠে। উজ্জ্বল আলোয় কল্যাণীকে পাগলের মতো দেখে তুষার চুমু খায়, তীব্র আগ্রহে, বিরংসায় তাকে মন্থন করে, বিড়বিড় করে বলে—কেন তোমার জন্য ও পাগল? কী আছে তোমার মধ্যে? কী সেই মহামূল্যবান? আমাকে দিতে পারো তো?

বৃথা। সবশেষে ঘোরতর ক্লান্তি নামে।

এইটুকু আর কিছু নয়।

ওরা ঘুমোয়। বাইরে ঝড়ের প্রথম বাতাসটি বয়ে যায়। প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটি একটি পোকার মতো উড়ে এসে বসে পাগলটার ঠোঁটে। বসে বসে ঝিমোয় পাগল। তার রক্তবর্ণ চুলগুলি নিয়ে খেলা করে বাতাস। বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত করে তার মুখ। মাথায় অবিরল বকুল ঝরিয়ে দিতে থাকে গাছ।

বহু উঁচু থেকে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। চমকে উঠে বসে তুষার। বুকের ভিতরটা ধকধক করতে থাকে। এত জোরে বুক কাঁপতে থাকে যে দুহাতে বুক চেপে ধরে কাতরভাবে একটা অস্ফুট শব্দ করে সে।

কিসের শব্দ ওটা? অন্ধকারে উঁচু উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটা সে কোথায় দেখেছে? কবে? বাইরে ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দ বাড়ি বাড়ি কড়া নেড়ে ফিরছে। একা একা উল্লাসে ফেটে পড়ছে ঝড়। সেই শব্দে মাঝরাতে ঘুমভাঙা তুষার চেয়ে থাকে বেভুল মানুষের মতো। বুক কাঁপে। আস্তে আস্তে মনে পড়ে একটা বিশাল লোহার কাঠামো তাতে ঘনায়মান অন্ধকার, উঁচু ক্রেন হ্যামার। অমনি ব্যথিয়ে ওঠে বুক। তীব্র মুক্তির ইচ্ছায় ছটফট করতে থাকে সে। তার মন বলে—চলো সমুদ্রে। চলো পাহাড়ে। চলো ছড়িয়ে পড়ি।

বুক চেপে ধরে তুষার। আস্তে আস্তে হাঁপায়।

বাইরে খর বিদ্যুৎ দিয়ে মেঘ স্পর্শ করে মাটিকে।

এই ঝড়ের রাতে তুষারের খুব ইচ্ছে হয়, একবার উঠে গিয়ে পাগলটাকে দেখে আসে।

কিন্তু ওঠে না। নিরাপদ ঘরে ভীরু গৃহস্থের মতো সে বসে থাকে।

বাইরে ভিখিরি, পাগলদের ঘরে ঝড় ফেটে পড়ে। তাদের ঘিরে নেমে আসে অঝোর বৃষ্টির ধারা।

পরদিন আবার বকুলতলায় পাগলকে দেখা যায়। অফিস যাওয়ার আগে পানের পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে তাকে দেখে তুষার। একটু বেলায় কল্যাণী আসে। দেখে। অভ্যাস।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে তুষার মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করে। অফিসের পর বাদুড়ের পাখনার মতো অন্ধকার ক্লান্তি নামে চারধারে। অনেক দূর হেঁটে যায় তুষার। ট্যাক্সিতে ওঠে, কোনোদিন ওঠে না। হেঁটে হেঁটে চলে যায় বহু দূর। কী একটা কাজ বাকি রয়ে গেল জীবনে। করা হল না। এক রোমাঞ্চকর আনন্দময় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আমার। পেলাম না। অস্থিরতা বেড়ালের থাবার মতো বুক আঁচড়ায়।

মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যায় তার। উঠে বসে। সিগারেট খায়। জল পান করে। কখনো বা উত্তরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। মোমবাতির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে সাদা বাতিস্তম্ভ, তার নিচে বকুল গাছ, তার ছায়া। অন্ধকারে একটা পুঁটলির মতো পড়ে আছে পাগল।

আবার ফিরে আসে ঘরে। বাতি জ্বালে। পাতলা নেট-এর মশারির ভিতর দিয়ে তৃষিত চোখে ঘুমন্ত কল্যাণীকে দেখে। তার বুক ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে বাচ্চা সোমা। সোমার মাথার কাছে দুটো কাগজ, তাতে ছবি আঁকা। একটাতে নদী, নৌকো, গাছপালা। অন্যটাতে খোঁপাসুদ্ধ একটা মেয়ের মুখ, নিচে লেখা সোমা। অনেকক্ষণ ছবি দুটোর দিকে চেয়ে রইল তুষার। একটা শ্বাস ফেলল।

কল্যাণী শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। মুখে নিশ্চিত কমনীয়তা। চেয়ে থাকে তুষার। আস্তে আস্তে বলে—কী করে ঘুমোও?

—চলো, বাইরে যাই। কিছুদিন ঘুরে আসি। এক সকালে চায়ের টেবিলে কল্যাণীকে এই কথা বলল অবসন্ন তুষার।

—চলো। কোথায় যাবে?

—কোথাও। দূরে। সমুদ্রে বা পাহাড়ে।

—পুরীর সমুদ্র তো দেখেছি। দার্জিলিঙ শিলঙও দেখা।

—অন্য কোথাও। অচেনা নির্জন জায়গায়। বলে তুষার।

কিন্তু সে জানে—মনে মনে ঠিক জানে—যাওয়া বৃথা। সে কতবার গেছে বাইরে, সমুদ্রে, পাহাড়ে। তার মধ্যে মুক্তি নেই, জানে। মুক্তি এখানেই আছে। আছে দুর্লভ ইচ্ছাপূরণ। খুঁজে দেখতে হবে।

তবু তারা বাইরে গেল। এক মাস ধরে তারা ঘুরল নানা জায়গায়। পাহাড়ে, সমুদ্রেও। ফিরে এল একদিন।

পাগলটা ঠিক বসে আছে। উত্তরের ব্যালকনিটার দিকে চেয়ে।

মাঝে মাঝে কাজের মধ্যেও তুষার হঠাৎ বলে ওঠে—নানাঃ। বলেই চমকায়। কিসের না? কেন না?

ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটিকে জরুরী ডিকটেশন দিতে দিতে বলে ওঠে—নানাঃ। স্টেনোগ্রাফারটি বিনীতভাবে থেমে থাকে।

তুষার চারদিকে চায়। অদৃশ্য মশারির মতো কী একটা ঘিরে আছে চারদিকে! ওটা কী! ওটা কেন! কী আছে ওর বাইরে?

নির্জন শেক্সপিয়ার সরণী ধরে হাঁটে তুষার, হাঁটে নির্জন ময়দানে, হাঁটে ভিড়ের মধ্যে। বহু দূরে দূরে চলে যায়। কিন্তু সেই অলীক মশারির বাইরে কিছুতেই যেতে পারে না। ট্যাক্সিতে উঠে বলে—জোরে চালাও ভাই। আরো জোরে....আরো জোরে....

ট্যাক্সি উড়ে যায়। তবু চারদিকে অলীক সূক্ষ্ম জাল।

হতাশ হয়ে ভাবে—আছে কোথাও বাইরে যাওয়ার পথ। খুঁজে দেখতে হবে। চোখ বুজে ভাবে। উটের মতো একটা ক্রেন হ্যামার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে বিশাল লোহার কাঠামো, সেইখানে একটা লোহার বিমে নুড়ি ছুঁড়ে শব্দ তুলছে বাচ্চা একটা ছেলে।

এক একদিন রাতে ভাত দিতে নেমে আসে তুষার। ভাত রেখে একটু দূরে দাঁড়ায়। সিগারেট খায়।

—অরুণ, তোমার কি ইচ্ছে করে আমার ঘরে যেতে?

পাগল খায়। উত্তর দেয় না।

—ইচ্ছে করে না কল্যাণীকে একবার কাছ থেকে দেখতে?

পাগল খায়। কথা বলে না।

জানতে চাও না সে কেমন আছে?

ফিরেও তাকায় না পাগল। খেয়ে যায়।

—একদিন তোমাকে নিয়ে যাবো আমাদের ঘরে। যাবে অরুণ?

একজন প্রতিবেশী পথ চলতে চলতে দাঁড়ায়। হঠাৎ বলে—

আপনার বড় দয়া। রোজ দেখি দু' বেলা পাগলটাকে আপনারা ভাত দেন। আজকাল কেউ এতটা করে না কারো জন্য। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে আপনার কথা বলি।

কৌতূহলে প্রশ্ন করে তুষার—কী বলেন।

—বলি, ঐরকম মহাপ্রাণ হয়ে ওঠো। আমরা তো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দ্বারা কিছু হল না পৃথিবীর। কাছাকাছি আপনি আছেন—এটাই আমাদের বড় লাভ।

তুষার মূক হয়ে যায়। এ কেমন মিথ্যা প্রচার! দয়া! দয়া কথাটা কেমন অদ্ভুত! এমন কথা সে তো ভাবেওনি।

কিন্তু ভাবে তুষার। ভাবতে থাকে। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তেমনি বলে ওঠে—ন্‌নাঃ। চমকায়। জালবদ্ধ এক অস্থিরতায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে এখনো মাঝে মাঝে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। জেগে উঠে যন্ত্রণায় বুক চেপে কাতরতার শব্দ করে সে।

এক রাতে সত্যিই তুষার কল্যাণীকে ভাত বাড়তে বলে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। রাস্তা পার হয়ে এল বকুল গাছটার তলায়।

—চলো অরুণ। একবার আমার ঘরে চলো। কোনোদিন তুমি যেতে চাওনি। আজ চলো। আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। আজ তোমার নিমন্ত্রণ।

বলে হাত ধরল পাগলের। পরিষ্কার সুন্দর হাতে ধরল নোংরা হাতখানা।

কে জানে কী বুঝল পাগল, কিন্তু উঠল।

সাবধানে তার হাত ধরে রাস্তা পার করল তুষার। সিঁড়ি বেয়ে এল। দাঁড়াল এসে খাবার ঘরের দরজায়।

—কল্যাণী, দেখ কাকে এনেছি।

কল্যাণীর হাত থেকে পড়ে গেল একটা চামচ। ভয়ঙ্কর ঠিন্‌ঠিন্ শব্দ হল। কেঁপে উঠল কল্যাণীর বুক। শরীর কাঁপতে লাগল। ভয়ে সাদা হয়ে গেল তার ঠোঁট।

—মা গো! চিৎকার করল সে।

নরম গলায় তুষার বলল—ভয় নেই, ভয় নেই কল্যাণী। তুমি খাবার সাজিয়ে দাও। অরুণ আজ আমার অতিথি।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কল্যাণী। জলে তার চোখ ভরে গেল।

তুষারের হাতে-ধরা পাগল নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

এত কাছ থেকে অরুণকে অনেকদিন দেখেনি কল্যাণী। কী বিপুল দারিদ্র্যের চেহারা। খালাসিদের যে নীল জামাটা ওর গায়ে, তা বিবর্ণ হয়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা। খাকি প্যান্টের রঙ পাল্টে ধূসর হয়ে এসেছে। কী পিঙ্গল ওর ভয়ংকর রাঙা চুল। পৃথিবীর সব ধুলো আর নোংরা ওর গায়ে লেগে আছে। কেবল তখনো অকৃপণ সুন্দর সুগন্ধ বকুল ফুল ছেয়ে আছে ওর মাথার জটায়, ঘাড়ে।

কাঁপা হাতে খাবার সাজিয়ে দিল কল্যাণী। তার চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছে। পাগল তার দিকে তাকালই না। চোখ নিচু রেখে খেয়ে যেতে লাগল।

মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে তুষার বলছিল —খাও অরুণ, খাও।

খাওয়া শেষ হলে তাকে আবার হাত ধরে তুলল তুষার। নিয়ে এল ঘরে।

—এই দেখ আমার ঘোরদোর। ঐ যে মশারির নিচে শুয়ে আছে, ও আমার মেয়ে সোমা। এই দেখ, ওর হাতে আঁকা ছবি। এই দেখ ওয়ার্ডরোব, ফ্রিজিডেয়ার। ঐ ড্রেসিং টেবিল। এই দেখ, আরো কত কী....

ঘুরে ঘুরে অরুণকে সব দেখায় তুষার।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে—এখানে এই সুন্দর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না অরুণ? ইচ্ছে করে না এই সব জিনিসপত্রের মালিক হতে? তুমি আর চাও না কল্যাণীর মতো সুন্দর বৌ? সোমার মতো মেয়ে।

অরুণের হাতে জোর ঝাঁকুনি দেয় তুষার—বলো অরুণ, ইচ্ছে করে না?

—অন্ধকার? ভীষণ অন্ধকার! পাগল বলে।

—কোথায়—কোথায় অন্ধকার?

—এইখানে।

বলে চারদিকে চায় পাগল।

—আর কোথায়?

—চারদিকে।

—থাকবে না অরুণ? থাকো থাকো। থেকে দেখ।

পাগল কিছু বলে না।

হতাশ হয়ে তার হাত ছেড়ে দেয় তুষার।

পাগলটা আস্তে আস্তে সদর পার হয়। সিঁড়ি ভাঙে। রাস্তা

পেরিয়ে চলে যায় বকুল গাছটার তলায়। পা ছড়িয়ে বসে। গুঁড়িতে হেলান দেয়। কুলকুল করে বয়ে চলে তার অন্য লগ্ন চিন্তার স্রোতস্বিনী। চোখ বুজে অনাবিল আনন্দে সে সেই স্রোত প্রত্যক্ষ করে।

উত্তরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায় তুষার। চেয়ে দেখে নিশ্চিন্তে বকুল গাছের ছায়ায় আবার বসেছে পাগল। টুপটাপ বকুল ঝরছে তার মাথায়।

উত্তরের ব্যালকনি থেকে দৃশ্যটা দেখে তুষার। তার দুই চোখ ভরে আসে জলে।

—কিছুই চাও না অরুণ। বকুল গাছের তলায় তোমার হৃদয় জুড়িয়ে গেছে। হায় পাগল, ভালবাসা নয়, এখন কেবল ভাতের জন্য তোমার বসে থাকা।

এখন আর কল্যাণীর কোনো সন্দেহ নেই। সে কাছ থেকে অরুণকে দেখেছে। সে কেঁপেছিল থরথর করে। দুঃখে ভয়ে উৎকণ্ঠায়। কিন্তু অরুণের মুখে সে দেখেছে বিস্মৃতি। তাকে আর মনে নেই অরুণের।

বড় শীত পড়েছে এবার। বকুল গাছ থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ছে পাগলের গায়ে। ছেঁড়া জামা দিয়ে হু-হু করে উত্তরে হাওয়া লাগছে শরীরে। বড় দয়া হয়। মঙ্গলার হাত দিয়ে একটা পুরানো কম্বল পাঠিয়ে দেয় কল্যাণী। পাগল সেই কম্বল মুড়ি দিয়ে নির্বিকার বসে থাকে।

মাঝে মাঝে কল্যাণীরও বুক ব্যথিয়ে ওঠে। ভালবাসার কথা মনে পড়ে। তুষার কি তাকে ভালবাসে এখনো। কে জানে। মাঝে মাঝে উগ্র রিরংসায় তাকে মন্থন করে তুষার। কখনো দিনের পর দিন থাকে নিস্পৃহ। আর, ঐ যে ভালোবাসার জন্য পাগল অরুণ—ও বসে আছে ভাতের প্রত্যাশায়। কল্যাণীকে চিনেও চেনে না।

তাহলে কী করে বাঁচবে কল্যাণী! বুক খামচে ধরে এক ভয়।

আবার, বেচেও থাকে কল্যাণী। বাঁচতে হয় বলে।

মাথার ওপর সব সময়ে উদ্যত নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটাকে টের পায় তুষার। অস্বস্তি। কখন যে ধম করে নেমে আসে। অকারণে বুক কাঁপে। ব্যথায় ককিয়ে ওঠে তুষার।

ঠিক সকাল নটায় পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে

বকুল গাছটার গোড়ায় পাগলকে দেখে। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে।

কোম্পানি এবার উনিশ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। ক্লান্তি বাড়ে। দিনশেষে তার শরীর জুড়ে নেমে আসে বাদুড়ের ডানার মতো অন্ধকার ক্লান্তি। তার ডালপালা ধরে কেবলই নাড়া দেয় এক তীব্র ইচ্ছা। নাড়া দেয়, নাড়া দিতে থাকে। অলীক ছুটি, মিথ্যা অবসর, অবিশ্বাস্য মুক্তির জন্য খামোকা আকুল হয় সে। পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে সময়। বয়স বাড়ছে।

তুষার অস্থির হয়। অস্থিরতা নিয়ে বেঁচে থাকে।

ঠিক যেন এক নদীর পাড়ে বসে আছে পাগল। কী সুন্দর আবছায়া নদীটি। চারদিকে আধো আলো, আধো অন্ধকার। অনন্ত সন্ধ্যা। নদীটি বয়ে যায় অবিরল। স্মৃতি স্মৃতিময় তার স্রোত। পাগল প্রত্যক্ষ করে। ক্লান্তি আসে না। বকুলের গাছ থেকে পাতা খসে পড়ে, কখনো ফুল বৃষ্টি আসে, ঝড় বয়ে যায়, আবার দেখা দেয় রোদ। তবু আবছায়ায় নদীটি বয়ে যায়। বয়ে যায়।

পাগল বসে থাকে।

হাওয়া-বন্দুক

দিন যায়। থাকে কথা।

মণিকার দিন যায়। কিন্তু কি ভাবে যায় কেউ কি তা জানে? তার সুখের ধারণাও খুব বড় নয়, দুঃখের ধারণাও নয় বড়। ছোট সুখ, ছোট দুঃখে দিন তার কেটে যেত। বুকের মধ্যে প্রজাপতির মতো উড়ন্ত একটুখানি সুখ, বা ছোট্ট কাঁটার মতো একটু দুঃখ—এ তো থাকবেই। নইলে বেঁচে যে আছে তা বুঝবে কেমন করে মণিকা! কিন্তু সুখ দুঃখের সেই ছোট ধারণা ভেঙে, দুয়ার খুলে বিশাল পুরুষের মতো অচেনা দুঃখ যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, যখন লুঠেরার মতো দাবি করে সর্বস্ব, তখন সেই দুঃখ আকাশ বা সমুদ্রের মতো ভুবন-ব্যাপ্ত বিশালতার ধারণা নিয়ে আসে। মণিকার দুর্বল মাথায় তা যেন ধরে না।

গড়ের মাঠে শীতের মেলায় তারা হেঁটেছিল দুজনে। তখন টুকুন ছিল না। সঞ্জয়ের সঙ্গে তখনো তার বিয়ে হয়নি। চুরি-করা দুর্লভ বিকেলে তারা ঐ রকম বেরোতে পারত। সঞ্জয় অফিস থেকে বেরিয়ে আসত, মণিকা পালাত কলেজ থেকে। একদিন তেমনি তারা গিয়েছিল শীতের মেলায়। মেলায় ছিল রঙিন আলো, সজ্জিত মানুষের ভিড়—নাগরদোলা, লক্ষ্যভেদের দোকান। ছিল ধুলো, শীতের বাতাস আর ছিল রোমহর্ষ। বিষণ্ণতা কোথাও ছিল না।

লক্ষ্যভেদের দোকানে চক্রাকারে সাজানো বেলুন, ঝুলন্ত খেলনা, বল, দোকানি ডাকছে—

—প্রতি শট্ পাঁচ পয়সা। আসুন, হাতের টিপ দেখে নিন।

সঞ্জয় দাঁড়ায়।

—মণিকা, হাতের টিপ দেখি?

মণিকা—কী হবে ছাই! হাতের টিপ দেখে!

—দেখিই না, যদি অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ করতে পারি।

—তাহলে কী হবে?

অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে কী যেন পেয়েছিল!

—দ্রৌপদী।

—আমিও পাবো মণিকাকে।

—পেয়ে তো গেছোই। সবাই জানে আমাদের বিয়ে হবে।

সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, মণিকা তোমোকে বড় সহজে পেয়ে গেছি আমি। ঠিক। ডুয়েল লড়তে হয়নি, যুদ্ধ করতে হয়নি, মা-বাবা বাধা দেয়নি। কিন্তু এত সহজে কিছু কি পাওয়া ভাল?

মণিকা ভ্রূ কুঁচকে বলে, ভাল নয়, তবে তুমি কি চাও তোমার আমার মধ্যে বাধাবিঘ্ন আসুক?

—না না তা নয়।

—তবে কি তুমি আমাকে মোটেই চাও না আমি সহজলভ্যা বলে?

—তাও নয়। তোমাকে চাই। কিছু এত সহজে নয়। সহজে কিছু পেলে মনে হয় পাওয়াটাই সম্পূর্ণ হচ্ছে না। জয়ের আনন্দই আলাদা।

মণিকা হাসল, বলল—তবে বরং আমি কিছুদিনের জন্য অন্য পুরুষের প্রেমে পড়ে যাই! কিংবা চলে যাই দুবছরের জন্য দিল্লির মাসির বাড়িতে. বি. এ. পরীক্ষাটা না হয় ওখানেই দেব। নইলে চল, ঘুমের ওষুধ খেয়ে পড়ে থাকি। তুমি অনেক ঝামেলা-টামেলা করে আমাকে ফের বাঁচিয়ে তোল। তাতে বেশ দুর্লভ হয়ে উঠি আমি।

সঞ্জয় মৃদু হেসে বলে—না, না, অতটা করার কিছু নেই। বরং ঐ টারগেটের দোকানে চল। একটা বেলুন দেখিয়ে দাও। আমি ফাটাব।

—ফাটালে কী হবে?

—তোমাকে জয় করা হবে।

—না পারলে?

—জয় করা হবে না।

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলল—না।

—বাবা, তাহলে আমি ওর মধ্যে নেই। আমি সব কিছু পেতে ভালবাসি।

সঞ্জয় তার হাতখানা ধরল। বলল—মণিকা।

—উঁ।

—ওই যে মাঝখানের হলুদ রঙের বেলুনটা, ওটাকে ফাটাব। তিন চান্সে।

—যদি না পার?

—না পারলে—

কথা শেষ করে না সঞ্জয়।

—না পারলে ?

—বিয়ে হবে না।

মণিকা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, শোন।

—কী ?

—তুমি ইয়ার্কি করছ ?

না।

—সিরিয়াস ?

—ভীষণ !

মণিকা শ্বাস ছেড়ে বলে—তুমি ভীষণ জেদী। পুরুষমানুষের জেদ থাকা ভাল, কিন্তু যার উপর আমাদের মরণ-বাঁচন তা নিয়ে তোমার খেলা কেন ?

সঞ্জয় কাতর স্বরে বলে—মণিকা, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন থেকেই তোমার আমার ভাব। পাশাপাশি বাড়িতে বড় হয়েছি। বড় হতে হতেই জেনে গেছি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। কত সহজ ব্যাপার বল তো ! কোন রহস্য নেই, রোমাঞ্চ নেই; প্রতি-যোগিতা নেই। এ কেমন পাওয়া ! আজকের দিনটায় একটুক্ষণের জন্য এস একটু দুর্লভ হই। কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তা খেলা করুক আমাদের সম্পর্কের মধ্যে।

মণিকার বড় অভিমান হয়েছিল মনে মনে। সে কি বাজিকরের দোকানের জিনিসের মতো হয়ে গেছে ? সে কি লটারির পুরস্কার ? তাদের এতদিনকার সম্পর্ক একটা হলুদ বেলুনের আয়ুর উপর নির্ভর করবে অবশেষে ? ছোট্ট একটু দুঃখ কাঁটার মতো ফুটল বুকে। ছোট্ট কাঁটা, কিন্তু তার মুখে বড় বিষ, বড় জ্বালা। মণিকার চোখ ভরে জলও কি আসেনি ? এসেছিল। মুখ ফিরিয়ে সে সেই জলটুকু মুছেছিল গোপনে। বলল—শোন, আমি লটারির প্রাইজ নই। আমি তোমাকে পেতে চেয়েছি সমস্ত অন্তর দিয়ে। তোমাকে যে ভালবাসি সে আমার পুজো। আমি কেন নিজেকে অত হাল্কা হতে দেব ? তুমি চল, ঐ দোকানে যেও না। ও খেলা ভাল নয়।

কিন্তু সঞ্জয় বড় জেদী, ঐ জেদই তাকে পুরুষ করেছে ! ও জেদই মণিকাকে মুগ্ধ করেছে কত বার। সঞ্জয় মাথা নাড়ল। মুখে হাসি নিয়ে বলল—শোন মণিকা, বেলুনটা আমি ঠিক ফাটাব।

—এসব নিয়ে খেলা কর না। চলে এস।

—না, প্লীজ, তিনটে চান্স দাও।

মণিকা একটা শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু মনে রেখ, যদি না পার এ বিয়ে হবে না।

—আমিও তো তাই বলছি!

মণিকার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। গলা ধরে যায় আবেগে। সঞ্জয়ের কাছে তার অস্তিত্ব কি এতই পলকা! যদি ও না পারে তবে সে ওর কাছে মিথ্যে হয়ে যাবে! এই সামান্য খেলায় সারা জীবনের এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে তারা? মণিকা ইচ্ছে করলে সঞ্জয়কে টেনে আনতে পারত জোর করে, কিংবা কেঁদে-কেটে বায়না করে নিবৃত্ত করতে পারত, যেমন সে অন্য সময় করে। কিন্তু ঐ সর্বনাশা মুহূর্তে হঠাৎ এক অহঙ্কার অভিমান-জেদ চেপে ধরল মণিকাকেও। তার জলভরা চোখ থেকে বিদ্যুৎ বর্ষিত হল। কান্নাটা চেপে রেখে সে বলল —বেশ।

দোকানি বন্দুক ভরে এগিয়ে দিল। সঞ্জয় বন্দুক তুলে মণিকার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল—মাঝখানের ঐ হলুদ বেলুনটা। বুঝলে, লক্ষ কর।

—করছি। গম্ভীরভাবে বলে মণিকা।

সঞ্জয় কাঁধ পর্যন্ত বন্দুক তোলে। নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য স্থির করতে থাকে। মণিকার একবার ইচ্ছে হয়, বন্দুকটা ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে পালিয়ে যায়। সে তৃষিত চোখে চেয়ে দেখছিল, সঞ্জয়ের দীর্ঘকায় সুন্দর দেহটি। ধারাল মুখ। অবিন্যস্ত চুল নেমে এসেছে কপালে। ঐ পুরুষ, আবাল্য পরিচিত মানুষটি একটু ভুলের জন্য চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে জীবন থেকে। এ কী ছেলেমানুসি!

ট্রিগার টিপল সঞ্জয়। শব্দটা ছড়াক করে মণিকার বুকে এসে ধাক্কা মারল। নড়িয়ে দিল তার দুর্বল হৃৎপিণ্ড। দেওয়াল ঘড়ির দোলকের মতো বুক দুলতে থাকে। সঞ্জয় পারেনি। হ্যাঁ এবং না-এর ভিতরে, আলো আর অন্ধকারের ভিতরে, সুখ ও দুঃখের ভিতরে টিক-টিক্-টিক্-টিক্ করে যাওয়া-আসা করে তার বুকের দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম। সে শুধু ফিসফিস করে বলে আর মাত্র দুটো চান্স। দেখ, সাবধান।

সঞ্জয়ের মুখের হাসি মুছে গেছে। ভ্রূ কোঁচকানো। সে আবার

বন্দুক নেয় দোকানির কাছ থেকে। তোলে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য স্থির করে। কিন্তু মণিকা লক্ষ করে, ওর হাত কাঁপছে। বড় মায়া হয় মণিকার। সে বুঝল, এবারেও সঞ্জয় পারবে না, দুচোখ ভরে আবার জল এল তার। ভাঙা কাচের ভিতর দিয়ে দেখতে যেমন অদ্ভুত দেখায় চারধারকে, তেমনি চোখের জলের ভিতর দিয়ে সে দেখতে পেল, রঙিন আলোর সুন্দর মেলাটি যেন ভেঙেচুরে ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। প্রতিবিম্বই বলে দিচ্ছে, এ পৃথিবীর সুখ ভঙ্গুর, জীবন কত অনিশ্চিত।

সঞ্জয়ের হাওয়া-বন্দুকের শব্দ এবারও কাঁপিয়ে দিল মণিকাকে। সেই সঙ্গে যেন কেঁপে উঠল পৃথিবী, ভেঙে পড়ার আগে আর্তনাদ করে উঠল সমস্ত ভুবন। দ্রুত দোল খেতে লাগল বুকের দোলকটি, যেন বা খসে পড়ার আগে সে তার শেষ দোলায় দুলছে। এবারও লাগেনি।

সঞ্জয়ের মুখে রক্ত এসে জমা হয়েছে। ফেটে পড়ছে ভয়ঙ্কর মুখখানা। দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে উত্তেজনায়। তার ঠোঁট সাদা। দোকানি আবার বন্দুক ভরে এগিয়ে দেয়। নির্লিপ্ত গলায় বলে—এবার মারুন। ঠিক লাগবে।

—লাগবে? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

দোকানদার তো ভেতরের কথা কিছু জানে না। সে তাই ভাল মানুষের মতো বলে—আসলে মনটা স্থির করাই হচ্ছে সত্যিকারের টিপ। চোখ আর হাত তো মনের গোলাম। মনটাকে স্থির করুন, ঠিক লাগবে।

সঞ্জয় বন্দুকটা শেষ বারের মতো হাতে নিল। তারপর মণিকার দিকে ফিরে চাপা গলায় ডাকল, মণিকা।

—উঁ!

—যদি না লাগে, তবে?

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে তুমি তো জানই।

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলে—জানি, ঠিক। তাই একটা কথা বলেনি, যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক কবে থেকে শেষ হবে?

মণিকা ধীর গলায় বলল, আজ। এখন থেকে।

—আমরা একসঙ্গে ফিরব না।

—না।

—তুমি একা ফিরবে?

—হঁ।

—আজ থেকে অন্য মানুষ হয়ে যাবে? আমার মণিকা আর থাকবে না তুমি?

—তুমিই তো ঠিক করেছ সেটা।

সঞ্জয় ম্লান একটু হেসে বলল, হ্যাঁ। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলল—মণিকা, এবারও যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক তো শেষ হয়ে যাবে। তবু তোমাকে বলিনি, আমি তোমাকে খুব, খুব, খুব ভালবাসতাম। আর কখনো কাউকে এত ভালবাসতে পারব না।

মণিকা রুমাল তুলে দাঁতে কামড়ে ধরল, তবু কি পারে দমকা কান্নাটাকে আটকাতে। কোনোক্রমে কেবল অসহায় একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, শোন।

—কী?

—শেষ চান্সটা থাক। মের না।

—কেন?

—আমি তোমাকে ভালবাসি। ভীষণ।

—আমিও।

—তবে ওটা থাক। সারাজীবনের জন্য বাকি থাক।

—হেরে যাবো মণিকা? পালাবো?

—তাতে কী? কেউ তো জানবে না।

সঞ্জয় দ্বিধায় পড়ল কি? বন্দুকটা রাখল, একটা সিগারেট ধরাল। ভ্রূ কোঁচকালো, চোয়ালের পেশি দ্রুত ওঠানামা করল। সিগারেটটা গভীরভাবে টানল সে। ধোঁয়া ছেড়ে সেই ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে মণিকার অস্পষ্ট মুখের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর বলল, কেউ জানবে না? কিন্তু তুমি তো জানবে?

—কী জানবো?

—আমি যে পালালাম।

—আমি ভুলে যাবো।

সঞ্জয় মৃদু হাসে। মাথা নাড়ে।—তা হয় না। আমাকে বুকের মধ্যে নিয়েও তুমি মনে মনে ঠিকই জানবে যে এ লোকটা কাপুরুষ। এ লোকটা শেষবার বন্দুক চালাতে ভয় পেয়েছিল। মণিকার চোখের জল গড়িয়ে নামল। দোকানদার অবাক হয়ে দেখছিল তাকে। সামান্য বেলুন-ফাটানো টারগেটের খেলায় কান্নাকাটির কী আছে তা তো তার

জানা ছিল না। রঙিন আলোর মেলায় আনন্দিত মানুষজন কেউই জানত না, মেলার মাঝখানে কী এক সর্বনাশা ঘটনা কত নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে। সঞ্জয় ধীরে বন্দুকটা তুলে নেয়। মণিকা মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

হাওয়া-বন্দুকটা ধীরে ধীরে কাঁধের কাছে তুলে নিচ্ছিল সঞ্জয়। দিন যায়, কথা থাকে। দোকানদার বলেছিল—হাত আর চোখ হচ্ছে মনের গোলাম। মন স্থির থাকলে লক্ষ্যভেদ হয়।

মণিকা ভাবে—তবে কি মনই স্থির ছিল না সঞ্জয়ের? মণিকার প্রতি তবে কি স্থির ছিল না সঞ্জয়ের মন? তাহলে কেন বন্দুকের খেলার ঐ হেলাফেলা উদাসীনতা? মণিকা দাঁতে রুমাল ছিঁড়ে ফেলল টেনে। দু'হাত প্রাণপণে মুঠো করে তার চারধারে ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তের পৃথিবীকে দেখে নিল। নিষ্ঠুর, এবার চালাও ঐ খেলনা-বন্দুক। ভেঙে পড়ুক মণিকার জগৎসংসার। সেই ভগ্নস্তূপের ওপর দিয়ে হেঁটে আজ একা ঘরে ফিরে যাবে মণিকা।

চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুন। ঠিক মাঝখানে হলুদ বেলুনটা। ফাটবে, না কি ফাটবে না? সঞ্জয় অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করে। নলের ওপর দিয়ে চেয়ে থাকে বেলুনটার দিকে। পৃথিবী সুতোয় দুলছে। ছিঁড়বে। এক্ষুনি ছিঁড়বে।

হাওয়া-বন্দুকের শব্দ শেষবারের মতো বেজে উঠল। সঞ্জয়ের স্খলিত হাত থেকে বন্দুকটা খসে যায়। মণিকা শিউরে ওঠে। ফিরে তাকায়।

চক্রের মাঝখানে হলুদ বেলুনটা নেই। ফেটে গেছে। নরম রবার ঝুলে আছে ন্যাকড়ার মতো। দোকানদার বলল, বাঃ, এই তো পেরেছেন!

তারা দু'জনে কেউই বিশ্বাস করেনি প্রথমে যে বেলুনটা সত্যিই ফেটেছে। বুঝতে সময় লাগে।

বিহ্বল গলায় সঞ্জয় ডাকে—মণিকা।

—উঁ।

—লেগেছে।

—যাঃ

—সত্যিই। দ্যাখো।

মণিকা কাঁদে। তারপর চোখের জল মুছে হাসে। মেলাটা কেমন রঙিন আলোয় ভরা। সজ্জিত মানুষেরা কেমন হেঁটে যাচ্ছে চারদিকে।

অবিরল ঘুরে যাচ্ছে নাগরদোলা। বেলুনটা ফেটেছে—সেই আনন্দ সংবাদ নিয়ে শীতের বাতাস চলে যায় দিগ্বিদিকে। চারধারকে ডেকে যেন সেই বাতাস বলতে থাকে—আনন্দিত হও, সুন্দর হও, সব ঠিক আছে।

তবু দিন যায়। কথা থাকে। বিয়ের পর চার বছর কেটে গেছে। তারা দুজন এখন তিনজন হয়েছে। টুকুন তিন বছরে পা দিল। সেই মেলায় পা দিল। সেই মেলার হাওয়া বন্দুকের খেলা তাদের কি মনে পড়ে? পড়ে হয়তো, কিন্তু কেউ মুখে বলে না। সঞ্জয় সিগারেট খেত খুব। মণিকা কোনোদিন আটকাতে পারেনি। রাত-বিরেতে উঠে কাশত। মণিকা ঘুম ভেঙে উঠে উদ্বেগের গলায় বলত—ইস্। কী কাশি হয়েছে তোমার। মাগো!

সঞ্জয় কাশতে কাশতে বলে—স্মোকারস কাফ। ও কিছু নয়, বলেই আবার সিগারেট ধরাত।

—আবার সিগারেট ধরালে?

—সিগারেটের ধোঁয়া না লাগলে এ কাশি কমবে না। সিগারেট থেকেই এই কাশি হয়। সিগারেট খেলেই আবার কমে যায়।

—বিছানায় বসে খাচ্ছ, ঠিক একদিন মশারিতে আগুন লাগবে।

সঞ্জয় উদাস স্বরে বলে—লাগুক না।

—লাগুক না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। শিগগির সিগারেট নেভাও।

সঞ্জয় হাসতে থাকে, সিগারেট সরিয়ে নিয়ে বলে—আগুন লাগলে কী হবে মণিকা! সংসারটা পুড়ে যাবে। এই তো? পৃথিবীতে কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। যাক্ না পুড়ে।

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে—তুমি বড় পাষাণ, বুঝলে! বড় পাষাণ!

সঞ্জয় উত্তর দেয়—তুমি তো জানই।

মুখে যাই বলুক মণিকা, মনে মনে জানে, একটুও নিষ্ঠুর নয় সঞ্জয়, একটুও পাষাণ নয়। বরং বেশি মায়ায় ভরা সঞ্জয়ের মন। তবু তারা সুখীই ছিল। সংসারে নানা সুখ-দুঃখ ছায়া ফেলে যায়। ছোট ছোট সুখ, ছোট ছোট দুঃখ। সে সুখ-দুঃখ কোন সংসারে নেই। সঞ্জয় মোটামুটি ভাল একটা চাকরি করে। তিন বছরের টুকুন সকাল আটটায় তার নার্সারি স্কুলে যায়। সারাদিন সংসারের গোছগাছ নিয়ে থাকে মণিকা। সে জানে তার স্বামী সঞ্জয় একটু উদাসীন। তা হোক, তবু স্ত্রৈণ পুরুষের চেয়ে অনেক ভাল।

সংসারের হাজার কাজের মধ্যে যখন অবসর পায় মাণিকা, তখন দক্ষিণের জানালার ধারে আলোয় এসে বসে। টুকুনের জামার ছেঁড়া বোতাম সেলাই করে। বাপের বাড়িতে চিঠি লেখে,রেডিও বাজিয়ে সময়ে কখনো-বা নিজেই গান গায় গুনগুন করে। সেই সব অন্যমনস্কতার সময়ে কখনো কখনো হঠাৎ মনে পড়ে দৃশ্যটা। চারধারে সেই রঙিন ভয়ঙ্কর খেলাটা বেশ জেগে ওঠে। দূরাগত চিৎকার শুনতে পায়, এক দোকানদার ডেকে বলছে প্রতি শট্ পাঁচ পয়সা, আসুন হাতের টিপ দেখেন।

আর তখন, মণিকা যেন সত্যিই দেখতে পায়, সামনে চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুনের ঠিক মাঝখানে হলুদ বেলুনটি। সঞ্জয় হাওয়া-বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চারধারে মুমূর্ষু পৃথিবী ভেঙে পড়ার আগে কেঁপে উঠছে, মণিকার বুকে দেওয়াল ঘড়ির দোলক ধাক্কা দেয়, পড়তে থাকে।

রাতে আজকাল সঞ্জয় বড় বেশি কাশে। কাশতে কাশতে দম আটকে আসে তার। মণিকা ওঠে, জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলে—জল খাও তো!

—দাও।

—কাল তুমি ডাক্তারের কাছে যেও।

—দূর দূর! ডাক্তাররা একটা না একটা রোগ বের করেই, রোগ না থাকলেও। এ কাশি কিছু না। সিগারেটের প্যাকেটটা দাও তো টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে।

—খেও না, পায়ে পড়ি।

—আঃ দাও না। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া কমবে না।

—রোজ তোমার এক কথা। তুমি আগে ডাক্তার দেখাও তো।

—ডাক্তাররা কিছু জানে না।

—তুমি খুব জানো।

—আমি ঠিক জানি। বরং একটা ওষুধ কিনে আনব।

মণিকা বিছানায় বসে সঞ্জয়ের চওড়া রোমশ বুকের ওপর হাত রাখে স্নেহে, এই পুরুষটিকে সে খুব চিনে গেছে। ভারী একগুঁয়ে। জেদী। তবু ভেতরে ভেতরে মেয়েদের মতোই নরম।

বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মণিকা বলে—নিজের ওপর তোমার একটুও নজর নেই। সারাদিন চা আর সিগারেটের ওপরে আছো।

এতো ভাল নয়, বুঝলে ? কাল থেকে সকালে আর দু'কাপ চা দেবো না, দ্বিতীয় বারে, চায়ের বদলে দুধ দেবো।

ধুস্।

—ওসব বললে চলবে না। খেতে হবে, আর অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবে। সারাটা দিন তো বাসাতেই থাকো না। ঠিক যেন পেয়িং গেস্ট্।

—সারাক্ষণ ঘরে থাকা যায় ?

—তাহলে আমি কী করে থাকি ?

—মেয়েরা পারে, সংসারে তাদের জান পোঁতা হয়ে থাকে।

—তাই নাকি ! আর, তোমার জান্ কোথায় পোঁতা আছে শুনি ! নতুন করে কারো প্রেম পড়োনি তো ?

সঞ্জয় হাসে, ইচ্ছে তো করে একটা হারেম বানিয়ে ফেলি কিন্তু এ বয়সে কে আর ফিরে তাকাবে বল।

ফিরে তাকাবার লোকের অভাব নেই। সেদিন মনুর বিয়েতে ওর যে একদল কলেজের বন্ধু এসেছিল তাদের মধ্যে একজন শ্যামলা মতো মেয়ে হাঁ করে তোমাকে খুব দেখছিল।

—যাঃ ! তোমার যতো বানানো কথা।

—সত্যি বলছি, মাইরি।

—আমার গা ছুঁয়ে বলছো তো।

—ও বাবা ! বলে মণিকা হাত টেনে নেয়।

—কী হল ! হাতটা সরিয়ে নিলে কেন ?

—তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম যে।

সঞ্জয় হাসে, গা ছুঁয়ে বলতে সাহস হচ্ছে না, তার মানে মিথ্যে কথা বলছো।

—না-গো, সত্যিই মেয়েটা দেখছিল।

—তবে গা ছুঁয়ে বলো।

—না না। তোমাকে ছুঁয়ে আমি কখনো দিব্যি গালি না।

সঞ্জয় বলল—তাহলে বলি, তুমি যে বড় দর্জির দোকানে ব্লাউজ বানাতে দাও সেখানকার সুন্দর মতো সেল্সম্যানটি তোমার দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে—

—যাঃ, বলবে না, নোংরা কথা। বলে মণিকা।

আর সেদিন পাড়ার ছেলেরা যে চাঁদা চাইতে এসেছিল তাদের মধ্যে

একজন কেন তোমার কাছে জল খেয়ে গেল জানো?

—এই, এই, এমন মারবো না; কেবল বানাচ্ছে, চুপ করো। ওসব শুনলেও পাপ।

তারা দুজনেই খুব হাসতে থাকে। কারণ তারা জানে ওসব কথা সত্যি নয়, কিংবা হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। তাদের ভালবাসা গভীর, গভীর।

সকালে টুকুন দুলে দুলে পড়ছে—ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ, হ্যাভ ইউ এনি উল? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার থ্রী ব্যাগ্‌স ফুল।

মণিকা রান্নাঘরে ঝিকে বকছে—রোজ তোমার আসতে বেলা হয়ে যায়। এঁটো বাসনপত্র পড়ে আছে ঝাঁটপাট হয়নি, সাতটা বেজে গেল, টুকুনের স্কুলের বাস আসবে এক্ষুনি, কখন কী হবে বল তো?

ঝি উত্তর দেয়, কী করব বৌদি, বড় বাড়িতে বেশি মাইনে দেয়, তারা সহজে ছাড়তে চায় না। কেবল এটা করে যাও, ওটা করে যাও। তোমার বাড়ি সেরে আবার এক্ষুনি ও বাড়ি দৌড়তে হবে।

—বেশি মাইনে যখন, তখন ও বাড়ির কাজই ধরে রাখো, আমারটা ছেড়ে দাও। আমি অন্য লোক দেখে নিই, পইপই করে বলি আমার ছেলের সকালে ইস্কুল, কর্তারও অফিস ন'টায় একটু তাড়াতাড়ি এসো। তুমি কেবল বড়লোকের বাড়ির বেশি মাইনের কাজ দেখাও।

[বাথরুম থেকে ক্রমান্বয়ে কাশির শব্দ আসে]

টুকুন এক নাগাড়ে ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ পড়ে যাচ্ছে। মণিকা ডাক দিয়ে বলে, টুকুন কেবল ঐ কবিতাটা পড়লেই হবে? একটু অঙ্ক বইটা দেখে নাও। কাল অঙ্কে ব্যাড্‌ পেয়েছো।

মণিকা—বাথরুম থেকে ক্ষীণ গলায় সঞ্জয় ডাকে।

মণিকা উত্তর দেয়, কী বলছ?

—একটু শুনে যাও।

—দাঁড়াও, আমার হাত জোড়া, ডালে সম্বর দিচ্ছি।

—এসো না।

—উঃ আমি যেতে পারব না। টুটুনের টিফিন-বাক্স গোছানো হয়নি, জলের বোতলে জল ভরা হয়নি। এক্ষুনি বাস এসে পড়বে।

সঞ্জয় চুপ করে থাকে, তারপর আবার শোনা যায়, তার কাশির শব্দ। দম বন্ধ করা সেই কাশি; তারপরই ওয়াক্‌ তুলে বমি করার শব্দ হয়।

—ওমা! কী হল! বলে মণিকা উঠে বাথরুমের বন্ধ দরজায় এসে ধাক্কা দেয়—এই কী হয়েছে? এই—ভিতর থেকে উত্তর আসে না, কেবল বেসিনে জল পড়ে যাওয়ার শব্দ হতে থাকে।

দরজায় ধাক্কা দেয় মণিকা। এই, দরজাটা খোলো না। কী হয়েছে তোমার? বমি করছো কেন?

সঞ্জয় উত্তর দেয় না।

মণিকা দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা দেয়—এই, কী হয়েছে? ওগো, দরজাটা, খোলো না।

মণিকা চিৎকার করে ডাকে সুধা, এই সুধা—

সুধা দৌড়ে আসে—কী হল গো বৌদি?

—দ্যাখো, তোমার দাদাবাবু দরজা খুলছে না। কী জানি কী হল, অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেল নাকি?

—শরীর খারাপ ছিল?

—হ্যাঁ, তুমি শিগগির বাড়িওলাকে খবর দাও।

কিন্তু খবর দেওয়ার দরকার হয় না। ছিটকিনি খোলার শব্দ হয়, দরজা খুলে দেয় সঞ্জয়। তার দিকে তাকিয়ে মণিকা বিমূঢ় হয়ে যায়। অত বড় মানুষটাকে কেমন দুবল দেখাচ্ছে। ঠোঁট সাদা, মুখে রক্তাভা, চোখের দৃষ্টি খানিকটা ঘোলাটে। একটা হাত বাড়িয়ে সঞ্জয় বলে—ধরো আমাকে।

মণিকা দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার মানুষটাকে। কী মস্ত শরীর, মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সের যুবক স্বামীটি, তার কী হল, কী হতে পারে মানুষটার?

—কী হয়েছে তোমার ওগো?

—কী জানি, কাশি এল খুব, কাশতে কাশতে বমি হয়ে গেল। আমাকে একটু শুইয়ে দাও।

....বাইরে বাসের হর্ন বাজে। টুকুন দৌড়ে আসে। মা, বাস এসে গেছে। টিফিন বাক্স আর জলের বোতল দাও।

—দিচ্ছি, দিচ্ছি বাবা।

টুকুন বাবাকে জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে বাবা?

—কিছু না।

—শুয়ে আছো কেন? আজ তোমার ছুটি?

সঞ্জয় শ্বাস ফেলে বলে—ছুটি! না ছুটি নয়। তবে বোধ হয় এবার ছুটি হয়ে যাবে।

—কেন বাবা ?

—মাঝে মাঝে মানুষের ছুটি হয়ে যায় বিনা কারণে। বলে সঞ্জয় হাসে। বলে, তোমাকে খ্যাপালাম। কিছু হয়নি। তুমি ইস্কুলে যাও।

—যাই বাবা, টা টা।

—টা টা।

বাইরে বাসের শব্দ হয়।

মণিকা গম্ভীরভাবে ঘরে আসে। হাতে দুধের কাপ। চামচে দিয়ে ভাসন্ত পিঁপড়ে তুলছে। কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলে—দুধটা খেয়ে নাও।

—খেতে ইচ্ছে করছে না। এখনও বমির ভাবটা আছে। খেলে বমি হয়ে যাবে।

—আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছি।

সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, সিগারেটের প্যাকেটটা দাও।

—না, আর সিগারেট নয়।

—দাও না, মুখটা টক-টক লাগছে। সিগারেট খেলে বমির ভাবটা কমবে।

মণিকা বলল, না, এত বাড়াবাড়ি আমি করতে দেবো না।

ওঃ বলে সঞ্জয় হতাশভাবে চেয়ে থাকে।

—শোনো, তুমি টুকুনকে কী বলছিলে ?

—কী বলব ?

—কিছু বলোনি ? আমি পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি।

সঞ্জয় একটু হাসে—কী শুনেছো ?

—ঐটুকু ছেলেকে ঐ সব কথা বলতে তোমার মায়া হল না ?

—ও কি বুঝেছে নাকি ?

—না-ই বা বুঝল। তুমি বললে কেন ? ছুটি মানে কী তা কি আমি বুঝি না ?

—কী মানে বল তো ?

—বলব না। তুমিও জানো, আমিও জানি।

—মণিকা সিগারেট দাও।

—না।

—তাহলে আবার কাশি শুরু হবে।

—হোক, সিগারেট কিছুতেই দেবো না। আগে বলো কেন বলেছিলে ঐ কথা।

—এমনিই।

মণিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া একটা দৃশ্য মনে পড়ে। মেলার দোকানে মণিকাকে বাজি রেখে হাওয়া-বন্দুকে লক্ষ্যভেদের খেলা খেলছে সঞ্জয়। জীবনে মণিকা কোনো-দিনই ঘটনাটা ভুলতে পারবে কি? পারবে না। মনে কেবলই সংশয় খোঁচা দেয়। যাকে ভালবাসে মানুষ তাকে কী করে এক মুহূর্তের খেয়াল-খুশিতে হারজিতের খেলায় নামিয়ে আনতে পারে? তবে কি সঞ্জয় কোনোদিনই তেমন করে ভালবাসেনি তাকে? সেই জন্যই কি এই সাজানো সুন্দর সুখের সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার বড় সাধ হয়েছে তার? ও টুকুনকে কেন বলল মাঝে মাঝে মানুষের ছুটি হয় বিনা কারণে? ঐ ছুটির জন্য বড় সাধ সঞ্জয়ের!

মণিকা বিছানার একধারে বসল। স্বামীর মাথাটা টেনে নিল বুকের ধার ঘেঁসে। চুল এলোমেলো করে দিতে দিতে বলল, অমন কথা বলতে নেই, কখন স্বস্তির মুখে কথা পড়ে যায়। আর কখনো বলো না।

—আচ্ছা।

—আমাকে ছুঁয়ে বলো, বলবে না।

সঞ্জয় হাসল, বলল, সিগারেট দাও না মণিকা।

—না।

বাইরে বাড়িওয়ালার ছেলের ডাক শোনা যায়—বৌদি।

মণিকা বলে—বোধ হয় পল্টু ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এল।

মণিকা বলল—আসছি পল্টু। মণিকা গিয়ে দরজা খোলে। ডাক্তারবাবু ঘরে আসেন।

—কী হয়েছে? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করেন।

সঞ্জয়ের কাশির দমকাটা আবার আসে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—কিছু না। স্মোকারস্ কাফ্।

—দেখি, আপনি ভাল করে শুন তো।

ডাক্তার সঞ্জয়কে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন। মণিকাকে একটা টর্চ আনতে বলেন, টর্চ দিয়ে গলাটা দেখেন ভাল করে। গলার বাইরের দিকে কয়েকটা জায়গা একটু ফুলে আছে। সেগুলো হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখে জিজ্ঞেস করেন—এগুলো কতদিন হল হয়েছে?

—কি জানি! সঞ্জয় উত্তর দেয়।

ডাক্তারবাবুর মুখটা ক্রমে গম্ভীর হয়ে আসে। একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে ওঠেন। মণিকা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ঘরে আসে।

—ডাক্তারবাবু!

—বলুন।

—কী রকম দেখলেন?

—তেমন কিছু বুঝতে পারছি না। ওষুধগুলো দিন। দেখা যাক।

হঠাৎ এক অনিশ্চয়তা,এক ভয় চেপে ধরে মণিকার বুক। ভগবান, ডাক্তার কেন বুঝতে পারছে না?

কয়েকদিন কেটে যায়। ওষুধে তেমন কোনো কাজ হয় না। কাশিটা যেমনকে তেমন থেকে যায় সঞ্জয়ের। কিছু খেতে পারে না, ওয়াক্ তুলে বমি করে ফেলে। শরীরটা জীর্ণ দেখায়। ন্যস্ত চুল ভর্তি মাথাটা বালিশে ফেলে রেখে পায়ের দিকের জানালাটা দিয়ে উদাস-ভাবে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। কেবল চেয়ে থাকে।

মণিকা ডাকে—শুনছো?

—উঁ।

—একটু হাঁটাচলা করো। শুয়ে থাকো বলেই তোমার খিদে পায় না।

—একটা সিগারেট দেবে মণিকা?

—না।

—পাষাণ, তুমি পাষাণ!

মণিকার চোখে জল আসে, বলে—কোনোদিন তো বারণ করিনি জোর করে। অসুখ হল কেন বলো। ভাল হও তারপর খেও।

—যদি ভাল না হই?

—ফের ঐ কথা? তুমি বলেছিলে না যে আর বলবে না।

সঞ্জয় শ্বাস ফেলে, চুপ করে থাকে। ডাক্তার মাঝে মাঝে এসে তাকে দেখে যায়। একদিন চিন্তিতমুখে ডাক্তার মণিকাকে আড়ালে ডেকে বলে—গলার ঘা-টা একটু অন্য রকম মনে হচ্ছে। বরং ডাক্তার বাসুকে একবার দেখান।

—আপনার কি মনে হয়?

—কিছু বলা মুশকিল। দীর্ঘস্থায়ী কোন ঘা দেখলে অন্যরকম একটা সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়! হয়তো তেমন কিছুই নয়। তবু দেখালে নিশ্চিত হওয়া যায়।

ডাক্তারবাবু চলে গেলে মণিকা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তারের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে তার দেরি হয় না। ডাক্তাররা সহজে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন না, সুতরাং—

সুতরাং মণিকা বুঝতে পারে, এতকাল ছোট সুখ, ছোট দুঃখের সঙ্গেই ছিল তার ভাব-ভালবাসা। এখন হঠাৎ সদর দুয়ার গেছে যে খুলে, অচেনা, বিশাল পুরুষের মতো এক বড় দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। লুবিয়ার মতো, মণিকার ছোটো মাথা তা বইতে পারে না। এ যে আকাশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত, এ যেন সমুদ্রের মতো সীমাহীন, এ দুঃখ দাবি করে সর্বস্ব, সমগ্র ভুবন কেড়ে নেয়।

দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে এসেছে টুকুন। ভাত খেয়ে আলাদা বিছানায় ঘুমুচ্ছে। বড় ঘাম হয় ছেলেটার। একটা মাত্র পাতলা জামা গায়ে, তবু জলধারায় ভেসে যাচ্ছে গলা বুক। কপালে মুক্তাবিন্দু, মণিকা নিচু হয়ে টুকুনের মুখ দেখে। সবাই বলে ওর শরীরের গঠন আর চোখ দুখানা সঞ্জয়ের মতো। নিবিড় পিপাসায় দেখে মুখখানি, মণিকা ফিস্‌ফিস্‌ করে ডাকে।

—টুকুন।

টুকুন উত্তর দেয় না।

—ওঠ টুকুন।

টুকুন উত্তর দেয় না।

—ওরে টুকুন বেলা গেল! ওঠ।

টুকুনের উত্তর নেই। নিঃসাড়ে ঘুমোয় সে। নিশ্চিন্তে।

টুকুন ওঠ্‌রে, আয় দুজনে মিলে একটু কাঁদি।

ডাক্তার বাসুর চেম্বারে ফোন করল মণিকা, পোস্ট অফিসে গিয়ে:

—ডক্টর বাসুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—উনি দিল্লিতে আছেন।

—কবে ফিরবেন?

—কন্‌ফারেন্সে গেছেন। কাল কি পরশু ফেরার কথা।

—আমার যে ভীষণ দরকার।

—কী দরকার বলুন।

—দয়া করে বলবেন, ডাক্তার বাসু কিসের স্পেশালিস্ট?

ও পাশে লোকটা বোধহয় একটু হাসলো, বলল: ক্যান্সার।

—আমি কাল আবার ফোন করব। কোন সময়ে আসার কথা?

—সকালের ফ্লাইটে। তবে কিছু বলা যায় না, হয়তো আটকেও যেতে পারেন।

মণিকা সন্তর্পণে ফোনটি রেখে দেয়। বাসায় ফিরে দেখে সঞ্জয় শুয়ে আছে। উত্তর শিয়রে মাথা, পায়ের কাছে দক্ষিণের জানালা। শেষবেলার একটু রাঙা আলো এসে পড়ে আছে পাশে। সঞ্জয় চেয়ে আছে দক্ষিণের জানালা দিয়ে। অবিরল চেয়ে থাকে আজকাল। কথা বড় একটা বলে না। টুকুনকে আদর করে না, মণিকাকেও না।

শেষ চান্স-এ হলুদ বেলুনটা না ফাটলে কোথায় থাকত মণিকা, আর কোথায়ই বা সঞ্জয়। মণিকা সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে থাকে। পিপাসায় তার ঠোঁট নড়ে, তার দুচোখ জলে ভেসে যায়। অচেনা পুরুষের মতো বড় দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ার খুলে। হাতে তার হাওয়া-বন্দুক, হলুদ বেলুনের মতো ঝুলে আছে। মণিকার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হবে, ভেঙে যাবে বুক।

মণিকা শব্দ করে কেঁদে ওঠে। অবাক হয়ে সঞ্জয় চোখ ঘোরায়।

—কী হয়েছে?

—পাষাণ, তুমি পাষাণ।

সঞ্জয় বুঝতে পেরে মাথা নাড়ে, শ্বাস ফেলে বলে—কেঁদো না, আমাকে বরং এখন থেকে একটা করে সিগারেট দিও রোজ।

মণিকা হঠাৎ মুখ তুলে বলে—সিগারেট আর সিগারেট! সংসারে সিগারেট ছাড়া তোমার আর কিছু চাওয়ার নেই?

না—মাথা নাড়ল সঞ্জয়।

—পাষাণ, তুমি পাষাণ।

মণিকা কাঁদে, সঞ্জয় চুপ করে দক্ষিণের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে, টুকুন পাশের ঘরে ঘুমোয়।

অনেক কষ্টে ডাক্তার বাসুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করতে পারে মণিকা। সঞ্জয়কে নিয়ে একদিন হাজির হয় ছায়াচ্ছন্ন চেম্বারটায়। বাসু প্রবীণ ডাক্তার, বিচক্ষণ অভিজ্ঞ দুটি চোখ তুলে বললেন—কী হয়েছে? দেখি! বলে সঞ্জয়কে চেয়ারে বসালেন। আলো জ্বালালেন কয়েকটা, ঝুঁকে ওর মুখ দেখতে লাগলেন, ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে মণিকা, হাওয়া-বন্দুক তুলেছে এক পাষাণ, দেয়াল ঘড়ি পেণ্ডুলামের মতো দোল খাচ্ছে, বুকের ভিতরটা এক হলুদ বেলুন। দাঁতে চিবিয়ে আজও রুমাল ছিঁড়লো মণিকা।

ডাক্তার বাসু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—কিছু হয়নি।

—মানে ? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

—যা সন্দেহ করে এসেছেন আমার কাছে, তা নয়। আজকাল সকলেরই এক ক্যান্সারের বাতিক, স্মোক করেন ?

—করতাম।

—টনসিলটা পাকা, ফ্যারিঞ্জাইটিস আছে, সব মিলিয়ে একটা আলসার তৈরি হয়েছে, ওষুধ লিখে দিচ্ছি সেরে যাবে।

ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিলেন।

সেরেও গেল সঞ্জয়।

একদিন বলল, শোনো মণিকা।

—কী ?

মনে আছে একবার মেলায় তোমাকে বাজি রেখে হাওয়া-বন্দুকের খেলা খেলেছিলাম ?

—মনে আছে।

—সে জন্যে আমাকে ক্ষমা করো।

মণিকা হাসে—তুমি কি ভাবো, শেষ চান্সে বেলুনটা না ফাটলে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতাম !

—যেতে না ?

—পাগল।

—কী করতে ?

—আমি বন্দুকটা নিয়ে বেলুনটা ফাটাতাম। না পারলে সেফ্‌টিপিন ফুটিয়ে আসতাম বেলুনটায়।

—তুমি ডাকাত, বলে সঞ্জয় হাসে।

অলক্ষ্যে হাওয়া-বন্দুক নামিয়ে পরাজিত এক অচেনা পুরুষ ফিরে যায়। তার লক্ষ্যভেদ হল না। বিদীর্ণ হয়নি মণিকার হৃদয়। সব ঠিক আছে। কোনোদিন আবার সেই বন্দুকবাজ ফিরে আসবে। লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করবে বার বার, একদিন লক্ষ্যভেদ করবেও সে। ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর এই রঙিন মেলায় আনন্দিত বাতাস বহে যাক এই কথা বলে—ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

কথা

তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে টুপু।

এ কথা প্রায়ই টুপুকে বলার জন্য যায় কুশল। বলা হয় না। কী করে হবে? টুপু যে বড্ড ব্যস্ত।

কুশল কলকাতায় এসেছে চার বছর। একটা বেসরকারী এঞ্জিনিয়ারিং শেখানোর স্কুল থেকে সে লেদ মেশিনের কাজ শিখেছিল। তার বেশি আর কী করার ছিল তার? গাঁয়ে তার বাবা মারা গেছে, কিন্তু চাষবাসের জমি আর অল্প-স্বল্প কিছু জীবনবীমার টাকা পেয়েছিল। তাও ভাগিদার অনেক। বিধবা মা আছে, এক দাদা আর এক ভাই আছে, ছোট একটা বোনও। দাদা চাষবাস দেখে, সেই থেকেই সংসার চলে। কুশল কলকাতায় এসেছিল ভাগ্যের অন্বেষণে। তেমন কিছু হয়নি তার। তবে মাথাটা পরিষ্কার বলে সে মেশিনের কাজ খুব তাড়াতাড়ি শিখে নেয়। কিন্তু কাজ পাবে কোথায়? মূলধনও নেই যে ব্যবসা করবে। সেই এঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের মালিক সুধীর ভদ্র তখন তাকে ডেকে বলে—তোমার তো বেশ পাকা মাথা, কাজ না পেলে আমার এখানেই শেখাতে লেগে যাও বাপু, হাত-খরচ পাবে, থাকার জায়গাও দেব।

এক অনিচ্ছুক মামাবাড়িতে প্রায় জোর করে থাকত কুশল। তারা তাড়াতে পারলে বাঁচে। কিন্তু কুশল বড় মিষ্টভাষী আর সৎ চরিত্রের বলে একেবারে ঘাড়-ধাক্কা দিতে পারছিল না। কিন্তু কুশলের বড় লজ্জা করত। থাকার জায়গা পেয়ে সে এবার উঠে এল হ্যারিসন রোডের স্কুলের বাড়িতেই।

তো এই হচ্ছে কুশলের অবস্থা। একশো টাকার কাছাকাছি তার রোজগার। থাকার জায়গার ভাড়া লাগে না, নিজে রেঁধে খায়। কষ্টে তার চলে যায়। তবে কুশল সবসময়েই জীবনের আলোকিত দিকগুলোই দেখতে পায়। যেন জগৎ-সংসারকে দুভাগ করে একটা সৌভাগ্যের আলো আর দুর্ভাগ্যের অন্ধকার পাশাপাশি রয়েছে। অন্ধকারে যারা আছে তারা আলোর দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে, আবার আলো থেকে অন্ধকারেও কাউকে কাউকে চলে আসতে হয়।

কুশল তাই কখনো হাল ছাড়ে না। কিছু হবে, কিছু একটা হবে। হবেই।

তাই এই অন্ধকারের জীবনে ফুল গন্ধের মত, জ্যোৎস্নার মত একটাই আনন্দ আছে। সে হল টুপু।

' তাদের গাঁয়ের পুরুতবাড়ির মেয়ে ছিল। বড় সুন্দর দেখতে। কত ছোট্ট ছিল। টুপু এখন কলকাতায় এসে খুব অন্যরকম হয়ে গেছে। খুব অল্প আয়াসেই টুপু তার দুর্ভাগ্য জয় করে আলোর দিকে চলে গেছে। সিনেমার অভিনেত্রী হিসেবে তার খুব নাম-ডাক। তার অনেক ভক্ত, অনেক চাহিদা।

কুশলের তাতে কিছু যায়-আসে না। সে মাঝে মাঝে টুপুদের হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যায়। টুপুর মা আছে, বাবা আছে, একটা ভাইও আছে। তারা এখন সব বড়লোকের মত থাকে। ছোট্ট বাগান-ঘেরা তিনতলা বাড়ি, গেটে দারোয়ান, শিকল বাঁধা কুকুর, হুট বলতে ঢোকা যায় না।

তবু কুশল ঠিকই ঢোকে। তারা আটকায় না। ওরা যে তাকে অনাদর করে তা নয়, উপেক্ষাও করে না। আবার খুব একটা আদর-আপ্যায়নও নেই।

যেমন ওর বাবা বলে—ওঃ কুশল! কী খবর?

মা বলে—কী বাবা, কেমন! খবর সব ভাল?

তারপরই আর তেমন কথা-টথা হয় না।

কুশল দেখতে খুব সুন্দর নয়, আবার খারাপও নয়। সিনেমার নায়ক হিসেবে তাকে মানায় না ঠিকই, কিন্তু রাস্তায়-ঘাটে দু'চারজন তার দিকে তাকিয়ে দেখে। মেশিন চালিয়ে তার চেহারা মেদহীন এবং পোক্ত। মুখশ্রীতে বুদ্ধি এবং অসম্ভব ভালমানুষির ছাপ আছে। সুধীরবাবু টাকা-পয়সার বিষয়ে চোখ বুজে তাকে বিশ্বাস করেন।

টুপুর সঙ্গে খুব কমই দেখা হয়। বেশির ভাগ সময়েই তাকে বাইরে থাকতে হয়, নয়তো বাড়িতে ঘুমোয়, নয়তো বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ-চৈ করে। তবু দেখা হলে সে-ই সবচেয়ে আন্তরিক ব্যবহার করে: বলে—কুশলদা, আজ বাড়িতে খেয়ে যেও। তোমার দাদা কী করছে এখন? মা কেমন আছে? পুন্তিকে অনেককাল দেখি না। তার তো বিয়ের বয়স হল!

পুষ্পি কুশলের ছোটবোনের নাম। এসব টুপুর মুখে শুনতে বড় ভাল লাগে।

কুশল বড় লাজুক। টুপুর সুন্দর মুখখানার দিকে ভাল করে চাইতে পারে না। মাথা নত করে বলে--আমরা বড় গরিব হয়ে গেছি টুপু।

টুপু বলে—আহা, কী কথা। গরিব হওয়া কি অপরাধ নাকি। এই বলে সান্ত্বনা দেয় টুপু। কখনো বলে তোমার যদি টাকার দরকার হয় তো নিও কুশলদা, লজ্জা কোরো না।

—না, না, টাকার দরকার নয় টুপু। এই মাঝে মাঝে এসে তোমাদের দেখে যাই শুধু। বেশ লাগে।

—দেখে যেও। আমাদেরও ভাল লাগে। তুমি যেন কী করো কুশলদা?

—একটা এঞ্জিনিয়ারিং কনসার্নে ইনস্ট্রাক্টর।

—ও বাবা, সে তো ভাল চাকরি! বলে টুপু ভ্রূ তোলে।

মিথ্যে কথা বা ফাঁপানো কথা কুশলের মুখে আসে না। তাই সে টুপুর ভুল ধারণা ভাঙার জন্য তাড়াতাড়ি বলে—না না, সে খুব ছোট্ট একটা কারিগরি স্কুল, আর ইনস্ট্রাক্টর বলতে—

কিন্তু অত কথা শোনার সময় টুপুর প্রায়ই হয় না। হয়তো চাকর এসে খবর দেয় যে গাড়ি তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। কিংবা ছুকরি একটা সেক্রেটারি এসে কোন অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আসল কথাটাই বলা হয় না।

অবশ্য কথাটা যে কী তা আজও ভাল জানে না কুশল। কেবল তার মন বলে—তোমার সঙ্গে আমার যে অনেক কথা ছিল টুপু।

॥ দুই ॥

এক বছর আর তেমন অবসর পেল না কুশল। সুধীরবাবুর স্কুল থেকে একটা পুরনো মেশিন কিস্তিবন্দীতে কিনে নিয়েছিল সে। হাওড়ায় একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া করে ব্যবসা শুরু করেছিল। লাভালাভের দিকে তাকায়নি, ভূতের মত খেটে সে সুধীরবাবুর টাকা শোধ করে দিল সময়ের আগেই। আরো একটা মেশিন কিনল। আরো একটা।

ব্যবসা শুরু করলে বহু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়। সেইরকম এক যোগাযোগে সে এক কালোয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। কিছু টাকা লাগায় তার লোহার কারবারে, বেশ কিছু লাভ পেয়ে যায়।

এক বছরের মধ্যে তার গা থেকে হাঘরের ভাবটা ঝরে গেল।

টুপুর বাড়িতে একদিন মিষ্টি-টিস্টি নিয়ে দেখা করতে গেল।

টুপুর বাবা ইতিমধ্যে মারা গেছেন। তার মা খুব বিষণ্ণ মুখে একটু খবরাখবর নিলেন।

বললেন—বাবা, আর তো দেখি খোঁজ নাও না!

—সময় পাই না পিসি। বড্ড কাজ। অভাব দূর করার চেষ্টা বড় মারাত্মক, হাড়-মজ্জা শুষে নেয়।

—সে তো জানি বাবা। তবু বলি, অভাবই ভাল। প্রাচুর্য মানুষকে বড় অমানুষ করে দেয়।

কথাটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু পরিষ্কার বুঝল না কুশল।

—সুখে থেকো, সৎ থেকো। এই বলেন টুপুর মা।

টুপুর সঙ্গে দেখা হল না। সে ঘুমোচ্ছে। ভীষণ ক্লান্ত।

সেই কথাটা আজও টুপুকে বলা হয়নি। কী কথা তা অবশ্য সে নিজেও জানে না। হয়তো সে বলতে চায়—তুমি খুব সুন্দর টুপু! কিংবা—আমি তোমাকে ভালবাসি টুপু।

বলেই বা কী হবে? এসব তো কত লোকেই টুপুকে বলে। তবু বলতে ইচ্ছে করে কুশলের।

লোহার ব্যবসা খুব ভাল লাগছিল না তার। একেই অংশীদারি তার পছন্দ নয়, তার ওপর এক জায়গায় উঠে আটকে যায়। তাই সে মূলধন তুলে নিয়ে লিলুয়ায় নিজের মত ছোট্ট ঢালাইয়ের কাজ শুরু করল। লোহার বড় টানাটানি বাজারে। মাল দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। টাকাও আসে। তবু ঠিক খুশি হতে পারে না সে। একটা কাটিং মেশিন নিলামে কিনল। পাঁচ রকম ব্যবসার কাজে টাকা ঢালতে লাগল। বড় ভাই চাষবাস নিয়ে রইল বটে, কিন্তু ছোট ভাইটাকে আনিয়ে নেয় কুশল। দুই ভাই মিলে সাঙ্ঘাতিক খাটে।

টুপুর বাড়িতে যেতে সেদিন দেখা হয়ে গেল।

—আরে কুশলদা, কেমন আছ? তোমাকে খুব অন্যরকম দেখাচ্ছে।

—না না। দাড়ি কামিয়েছি তো, তাই।

—তার চেয়ে কিছু বেশি। বলে টুপু হাসে—তোমার উন্নতি হচ্ছে বোধ হয়। চেহারায় ছাপ পড়েছে।

কুশল বলে--তোমার চেহারা একটু খারাপ দেখছি টুপু। কী হয়েছে ?

—কী হবে ? বড্ড ডায়েটিং করতে হয়। খাটুনিও তো খুব।

—আজকাল তোমার ছবি বড় একটা দেখি না তো।

—হচ্ছে। অনেক হচ্ছে। এই বলে টুপু খুব অস্থিরতা আর চঞ্চলতার সঙ্গে একটা সিগারেট ধরায়।

ভীষণ অবাক হয় কুশল। চেয়ে থাকে।

—কিছু মনে কোরো না কুশলদা। নার্ভের জন্য খাই। আমার নার্ভ বড্ড সেনসিটিভ, ধোঁয়ায় একটু শান্ত থাকে।

—বেশি খেও না। দমের ক্ষতি হয়। খুব ভাল আর শান্ত গলায় কুশল বলে।

—বেশি না। মাঝে মাঝে খাই, নেশা-টেশা নেই।

আসলে নেশাই। কুশল সেটা টের পায়।

টুপুর মা দেখা হতে অনেকক্ষণ অন্য কথা বলে তারপর বলেন—বাবা, পেটের মেয়ে, পণ্ডিত বংশের সন্তান, বলতে নেই টুপু আজকাল মদও খায়। ভীষণ মাতলামি করে। কাউকে বোলো না।

অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে কুশল বলে—পিসি, খায় তো খাক। তুমি বেশি ঝগড়া-টগড়া কোরো না এ নিয়ে। ওর কাজের স্ট্রেন তো হয়, তাই খায়। ওকে রেস্টোরেটিভ বলে, মদ খাওয়া নয়।

—তুমি বাবা, সব কিছুর ভাল দেখ। আমি দেখি না। ছেলেটাও সিনেমার লাইনে ঢুকবে-ঢুকবে করছে। বারণ করি, শোনে না।

কুশল আবার ভেবে বলে—টুপুর বুঝি আর তেমন চাহিদা হচ্ছে না পিসি ? আজকাল ওকে নিয়ে ছবি হয় না তো।

—হয় না তো কী করবে ! জীবনে ওঠা-পড়া আছেই। আমি বলি, এবার ভাল আর সৎ দেখে পাত্র খুঁজে বিয়ে করে ফেলুক। সিনেমার নটী সাজা ঢের হল। ওদের বামুন-পণ্ডিতের বংশের রক্তে কি ওসব সয় !

ভাবতে ভাবতে কুশল চলে আসে।

স্কুলে থাকতে কবিতা পড়েছিল, সন্ন্যাসী উপগুপ্তর সঙ্গে বাসবদত্তার প্রেম হয়েছিল বুঝি ! তো টুপুর সঙ্গে একদিন কি তার সেরকমই হবে ?

হতেও পারে।

তিন বছরের মাথায় কুশল দেখল, তার অনেক টাকা। শুধ হয়েছে নয় আসছেও।

ঢালাইয়ের কারখানার জায়গা–বদল হয়েছে। ছোট্ট কিন্তু বেশ ভাল একটা ফাউণ্ড্রি খুলে ফেলেছে দুই ভাই। দেশের বাড়ি মস্ত বড় করে করেছে। পুকুর কাটা হয়েছে। চাষের জমিও কিনেছে অনেক। দাদা সে-সব দেখাশোনা করছে। কাজের সুবিধের জন্য একটা গাড়ি কিনে ফেলেছে কুশল।

সেই গাড়িতে একদিন গেল টুপুর বাড়ি।

টুপু সব দেখে বলল—কুশলদা, তুমি সত্যিই উন্নতি করেছ।

—আরে না, না। কোম্পানির গাড়ি।

—ঐ হল। কোম্পানি তো তোমারই।

কুশল লজ্জা পায়। বড়লোকি দেখাতে সে তো আসে না। সে আসে টুপুকে একটা কথা বলবে বলে।

আজও বলা হয়নি।

।। তিন ।।

টুপু একজন প্রডিউসারকে বিয়ে করল, কুশল খবর পায় এক পত্রিকায়।

গিয়ে দেখে টুপুর মা খুব খুশি নয়।

বললেন—দোজবরে বাবা, আগের বৌকে বিদেয় করেছে। তা টুপুকেই কি রাখবে। বড় ভয় করে। বড়লোকি বিয়ে আমার একদম পছন্দ নয়। বিয়ে ওরা করে না। আসল বিয়ে হয় মধ্যবিত্ত পরিবারে।

পিসি বলেছিল অদ্ভুত।

ওরা হানিমুন করতে জাপান না কোথায় গিয়েছিল। ঠিক তিন মাস বাদে ফিরে এসেই টুপু তার বরকে ডিভোর্স করে।

খবর পেয়ে ছুটে গেল কুশল।

—কী হল টুপু? বিয়ে ভেঙে দিলে?

—দিলাম। ওর হৃদয় নেই।

—আগে জানতে না?

—জানতাম। তবু ঢুকে দেখলাম আছে কিনা।

—ঢুকতে গেলে কেন টুপু? শরীরটা খামোখা এঁটো করলে।

মুখ-ফস্‌কা কথা। কুশল জিভ কাটল।

কিন্তু টুপু রাগ করল না। খুব অন্যমনস্ক হয়ে বলল—ঠিক বলেছ, এঁটো হয়ে এলাম। তবে অনেক টাকা পেয়েছি।

কুশল বলল—ভাল। টাকাগুলো রেখো। অসময়ে টাকা মানুষকে খুব দেখে।

টুপু এই প্রথম কাঁদল কুশলের সামনে।

বলল—টাকা আর নাম আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে কুশলদা। তুমি তো উন্নতি করেছ, আমি যদি কখনো রাস্তার ভিখিরি হয়ে যাই তো কিছু ভিক্ষে দিও।

—ছিঃ টুপু, ওকথা বোলো না। টাকা রেখো। আর দরকার হলে নিও আমার কাছ থেকে। লজ্জা কোরো না।

—বড় লজ্জা কুশলদা। বড় লজ্জা।

আলোর পৃথিবী এগিয়ে আসছে।

কুশল বুঝতে পারে, সে নিজে সৌভাগ্যের আলোর চৌকাঠে পা রেখেছে, কিন্তু টুপুর সঙ্গে সেখানে দেখা হওয়ার নয়। কারণ টুপু আলোর জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে চলে আসছে দুর্ভাগ্যের অন্ধকার জগতে। সে-ও সেই যাত্রাপথে অন্ধকারের চৌকাঠে পা রেখেছে, ঠিক এই সীমানায় তাদের এখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকা।

আজও বলতে পারল না কুশল। কিন্তু মন বলল—তোমার সঙ্গে আমার যে একটা খুব গোপন কথা আছে টুপু।

আজকাল কুশলের সময় বড় কম। কলকাতার ব্রাবোর্ন রোডে তার নতুন শো-রুম আর সেল্‌স অফিস চালু হল। তার ওপর আবার জাপানী একটা কোম্পানির সঙ্গে কোলাবরেশনে চাষের যন্ত্র লাঙল তৈরি করবে বলে সে গেল জাপান। ঐ পথে দূর-প্রাচ্যের সব দেশ দেখে এল। কারখানা খোলার জায়গা পেল কলকাতার কাছেই। বড্ড পরিশ্রম গেল ক'দিন। বয়সও তো প্রায় সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হয়ে গেল। এখন শরীর না হোক মনটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মা বিয়ের তাগাদা দেয়। কুশল রাজি হয় না। ছোট বোনের বিয়ে দিল বড়লোকের বাড়িতে। সেই বিয়েটা আসলে একটা অলিখিত চুক্তি। আত্মীয়তার সূত্রে যাদের পেল তারা সমাজের ওপরতলার ভাল সব যোগাযোগের মধ্যমণি। এই সব বুদ্ধি এখন মাথায় খুব খেলে কুশলের।

কিন্তু তবু ক্লান্তি তো ছাড়ে না। যোধপুরের প্রকাণ্ড বাড়িতে ফিরে যখন কখনো অবসর কাটায় তখন বড় একা আর ক্লান্ত লাগে। মেয়েলি স্পর্শ জীবনে বড় দরকার। মেয়েরা হল পুরুষের বিশ্রাম, একটু সৌন্দর্য, আশ্রয়।

কিন্তু বিয়ে করবে কী করে কুশল? সেই কথাটা যে আজও টুপুকে বলা হয়নি। তাই সে ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে দিল। অনেকদিন ধরেই এক সরকারী হর্তাকর্তা তাঁর মেয়েকে কুশলের ঘরে দেওয়ার জন্য অস্থির। কুশল তাঁকে তাই বিমুখ করল না। নিজে বিয়ে না করে ভাইয়ের সঙ্গে দিয়ে দিল।

আজও বড় লাজুক কুশল, এখনো যতদূর সম্ভব সৎ ও সচ্চরিত্র। এখনো তার চেহারায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসম্ভব ভালোমানুষির ছাপ রয়ে গেছে।

খুব সকালবেলায় একদিন একটা পুরোনো গাড়িতে টুপু এসে তার বাড়ির সামনে নামল। খুবই কুণ্ঠিত আর লজ্জিত ভঙ্গিতে এল ভিতরে।

বলল—তুমি কী ভীষণ বড়লোক হয়ে গেছ! কী করে হলে?

লজ্জিত কুশল বলে—শোনো টুপু, ওসব কথা বোলো না। মেয়েরা টাকা-পয়সার কথা বললে আমার ভালো লাগে না।

টুপু শ্বাস ফেলে বলে—আমার খবর জানো?

—জানি টুপু, তুমি আজকাল একদম কণ্ট্রাক্ট পাচ্ছ না। খবর নিয়ে জেনেছি, তুমি অনেক টাকা চাও বলে কেউ তোমাকে ছবিতে নেয় না। তার ওপর তুমি শুটিংয়েও যাও না ঠিকমত।

টুপু শ্বাস ফেলে বলে—আরো আছে। আমি নাকি নতুন নায়কদের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছি। প্রায়ই নাকি ইউনিট থেকে তাদের কাউকে নিয়ে ইচ্ছেমত চলে যাই ফুর্তি করতে। এসব শোননি?

—শুনেছি।

—বোগাস। এর কিছুই সত্যি নয় কুশলদা। এখন আমি ঘর থেকে মোটেই বেরোই না। অন্ধকারে বসে বসে কাঁদি।

—কেন কাঁদো টুপু? তোমার দুঃখ কী?

—বোঝ না? মানুষ যখন গুরুত্ব হারায়, যখন নিজের ধর্ম থেকে, ভিত থেকে নড়ে যায় তখন যে দুঃখ, তার তুলনা নেই।

—বাজে কথা টুপু। তুমি গরিব বামুনের মেয়ে। তোমার ধর্ম বল, ভিত বল, গুরুত্ব বল, তার কিছুই তো তুমি পাওনি। যা পেয়েছিলে,

যে অর্থ, যশ ও গুরুত্ব, তা তোমার পাওনা জিনিস ছিল না। একটু ভেবে দেখো।

তবে কী আমার পাওনা ছিল ?

কুশল ভেবে বলে—বোধহয় ভালবাসার মানুষের জন্য কষ্ট করার তৃপ্তিই মানুষের সবচেয়ে বড় পাওনা।

—ও বাবা, তুমি খুব কথা শিখেছ আজকাল। শিখবেই, বড়লোক হয়েছ তো। বড়লোকদের সব কথা বলবার অধিকার আছে।

কুশল যন্ত্রণায় কাতর স্বরে বলে—না টুপু। আমাকে বড়লোক বোলো না। আমি চেষ্টা করছি মাত্র। চেষ্টাই মানুষের জীবন। বিষয়ের পরিবর্তনে মনের পরিবর্তন কি সবার হয় ?

—আমি অত বুঝি না কুশলদা। আমি বলতে এসেছি আমি একটা ছবি প্রডিউস করব। টাকা দাও। শেষবার একটা চেষ্টা করে দেখি।

—দেব। কুশল বিনা দ্বিধায় বলে।

॥ চার ॥

উপগুপ্ত আর বাসবদত্তার কবিতাটার শেষে যা ছিল, তাই বুঝি ঘনিয়ে আসে। ছবিটা একদম চলল না। কুশল জানত, তাই টাকা-টাকে খরচের খাতায় ধরে রেখেছিল।

প্রেস শোতে তার পাশেই বসেছিল টুপু। বলল—চলবে না, না গো কুশলদা ?

কুশল খুব দুঃখিত মনে মৃদুস্বরে বলে—বোধ হয় না।

—কেন কুশলদা ? আমি তো আমার সর্বস্ব দিয়ে অভিনয় করেছি, গল্পটাও ভাল ছিল। সবই চেষ্টা করেছি।

কুশল তেমনি মৃদুস্বরে বলে—টুপু, কেন এত করলে ? এর চেয়ে অনেক কম কষ্টে সুখী হওয়া যেত জীবনে।

বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে টুপু একটা আপার্টমেন্টে থাকে এখন। একা একা। মা আর ভাই আলাদা থাকে। তাদের সঙ্গে বনিবনা হয় না টুপুর।

তার সেই অ্যাপার্টমেন্টে বিরাট পার্টি দিয়েছে টুপু তার জন্মদিনে। কুশলকে নিমন্ত্রণ করেছে। কুশল সময় পায় না, তবু সময় করে গেল পার্টিতে।

গিয়ে দেখে, ফ্ল্যাটটা একদম ফাঁকা। রাশি রাশি খাবার সাজানো টেবিলে, ঘরদোরে প্রচুর আলো, সাজগোজ। তবু কেউ নেই। এমন

কি একটা বুড়ি ঝি ছাড়া অন্য কাজের লোকও কেউ নেই। টুপু একটা সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি পরে এলোচুলে জানালার ধারে বসে বই পড়ছে। মুখটা ম্লান, কিন্তু প্রসাধনহীন বলে তার সেই কৈশোরের কমনীয়তাটুকু ফুটে আছে।

কুশল অবাক হয়ে বলে—কী হল, লোকজন সব কই ?

টুপু বই বন্ধ করে হেসে উঠে আসে, বলে—লোকজন! তারা আবার কারা ? কাউকে বলিনি তো! শুধু তোমাকে।

—তাহলে এত আয়োজন দেখছি কেন ?

টুপু অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে কুশলের মুখের দিকে। তারপর খুব গভীর একটা শ্বাস ফেলে বলে—শোনো, আমি জীবনে দেদার পার্টি দিয়েছি। পার্টির শেষে যখন সবাই চলে যায়, তখন এঁটো বাসন, শূন্য মদের বোতল, ভাঙা কাচ, দলিত ফল সব পড়ে থাকে। ঘরটা বীভৎস লাগে। মনে হয় পরিত্যক্ত, ভুতুড়ে। তাই আজ কাউকে বলিনি।

—আমাকে যে বললে!

—তুমি! ওঃ, তোমার কথা আলাদা। আজ আমরা দুজনে পার্টি করব। আর আমাদের চারদিকে শূন্য চেয়ার, ফাঁকা ঘর, আর নির্জনতা থাকবে। কুশলদা, তোমার একার জন্যই আজ পঞ্চাশজনের আয়োজন। তুমি সব এঁটো করে নষ্ট করে যাও! আমি দেখি।

—পাগল! কুশল বলে।

—আমি পুরুষকে লজ্জা পেতে বহুকাল ভুলে গেছি। কিন্তু জান, আবার আমার খুব ইচ্ছে করে লজ্জা করতে। আমাকে একটু লজ্জা দাও কুশলদা।

—পাগল! কুশল বলে।

—শোন, তুমি ভাবছ আমি মদ খেয়েছি! না গো, এই দেখ, শুঁকে দেখ মুখ। বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। এই বলে ছোট্ট সুন্দর মুখখানা হাঁ করে কাছে এগিয়ে আনে টুপু।

কুশল ওর মুখের বাতাস শুঁকল। কি সুন্দর গন্ধ! ঐ ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ মোহাচ্ছন্ন হয়ে।

টুপু শ্বাস ফেলে মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল—আজ আমার জন্মদিন কুশলদা। তুমি আমাকে কী দেবে ?

সোনার একটা গয়না এনেছে কুশল। কিন্তু সেটা বের করল না। একটু ভাবল। তারপর বলল—টুপু, বহুকাল হল তোমাকে

একটা কথা বলার চেষ্টা করছি। আজ তোমাকে সেই কথাটা বলি বরং। সেইটেই জন্মদিনের উপহার বলে নিও।

—কথা! বলে টুপু হাঁ করে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলে—এতদিন বলনি কেন?

—সময় হয়নি। কথারও সময় আছে টুপু।

টুপু হেসে মাথা নিচু করে লজ্জায়। তারপর অল্প একটু শ্বাস-কষ্টের সঙ্গে বলে—আজ বুঝি সময় হয়েছে?

—হ্যাঁ। খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই এবার বলি। টুপু...

টুপু দুহাতে কান চেপে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে—পায়ে পড়ি, বোলো না, বোলো না তো! বললেই ফুরিয়ে যাবে।

—বলব না? কুশল অবাক।

টুপু স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে হাসল, বলল—সারা জীবন ধরে ঐ কথাটা একটু একটু করে বোলো। কথা দিয়ে নয়, অন্যরকমভাবে।

উকিলের চিঠি

'ও মিছরি, তোর নামে একটা উকিলের চিঠি এসেছে দেখগে যা। এই বলে মিছরির দাদা ঋতীশ টিয়ার ঝাঁক তাড়াতে ক্ষেতের মধ্যে নেমে গেল।

গোসাবা থেকে দুই নৌকো-বোঝাই লোক এসেছে অসময়ে। লাট এলাকার ভিতর বাগে কোন বিষয়কর্মে যাবে সব। এই অবেলায় তাদের জন্য খিচুড়ি চাপাতে বড় কাঠের উনুনটা ধরাতে বসেছিল মিছরি। কেঁপে উঠল। তার ভরন্ত যৌবনবয়স। মনটা সব সময়ে অন্যধারে থাকে, শরীরটা এই এখানে। আজকাল শরীরটা ভার লাগে তার। মনে হয়, ডানা নেই মানুষের।

উকিলের চিঠি শুনে যে উনুন ফেলে দৌড়োবে তার জো নেই। বাবা গুলিপাকানো চোখে দেখছে উঠোনের মাঝখানে চাটাইতে বসে। বড় অতিথিপরায়ণ লোক। মানুষজন এলে তার হাঁকডাকের সীমা থাকে না। তাছাড়া দাদু, ঠাকুমা, মা, কাকা-জ্যাঠারা সব রয়েছে চারধারে। তাদের চোখ ভিতর—বার সব দেখতে পায়। উটকো লোকেদের মধ্যে কিছু বিপ্রবর্ণের লোক রয়েছে, তারা অন্যদের হাতে খাবে না। সে একটা বাঁচোয়া, রান্নাটা করতে হবে না তাদের। চাল-ডাল ওরাই ধুয়ে নিচ্ছে পুকুরে। বাঁকে করে দু বালতি জল নিয়ে গেছে কামলারা। উনুনটা ধাঁধিয়ে উঠতেই মিছরি সরে গিয়ে আমগাছ-তলায় দাঁড়াল।

কালও বড্ড ঝড়জল গেছে। ঐ দক্ষিণধার থেকে ফৌজের মতো ঘোড়সওয়ার ঝড় আসে মাঠ কাঁপিয়ে। মেঘ দৌড়োয়, ডিমের মতো বড় বড় ফোঁটা চটাসফটাস ফাটে চারধারে। আজ সকালে দশ ঝুড়ি পাকা জাম, গুটিদশেক কচি তাল কুড়িয়ে আনা হয়েছে ক্ষেত থেকে। ঘরের চালের খড় জায়গায় জায়গায় ওলট-পালট। মাটির দেয়াল জল টেনে ডোস হয়ে আছে, এখন চড়া রোদে শুকোচ্ছে সব। আমতলায় দাঁড়িয়ে মিছরি দেখে, ঋতীশ দাদা টিয়ার ঝাঁক উড়িয়ে দিল। ট্যাঁ ট্যাঁ ডাক ছেড়ে সবুজ পাখিরা উড়ে যাচ্ছে নদীর দিকে। মনে হয় মানুষের ডানা নেই।

যারা এসেছে তারা সব কেমনধারা লোক যেন। রোগা-ভোগা ভীতু-ভীতু চেহারা, পেটে সব খোঁদল-খোঁদল উপোসী ভাব। জুল-জুল করে চারধারে চায় আর লজ্জায় আপনা থেকেই চোখ নামিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে একজন আধবুড়ো লোক এসে উনুনটায় দুটো মোটা কাঠ ঢুকিয়ে দিল, ফুলঝুরির মতো ছিটকে পড়ল আগুনের ফুলকি। একটা কাঠ টেনে আধপোড়া একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল লোকটা। এই গরমেও গায়ের ময়লা ঘেমো তেলচিটে গেঞ্জিটা খুলছে না, বুকের পাঁজর দেখা যাবে বলে বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছে। তাকে দেখে হাসি পেল মিছরির।

সেই লোকটা চারধারে চেয়ে মিছরিকে দেখে কয়েক কদম বোকা পায়ে হেঁটে এসে বলল—আনাজপাতি কিছু পাওয়া যায় না?

ক্ষেতভর্তি আনাজ। অভাব কিসের? মিছরি বলল—এক্ষুনি এসে পড়বে। ক্ষেতে লোক নেমে গেছে আনাজ আনতে।

—একটু হলুদ লাগবে, আর কয়েকটা শুকনো লঙ্কা। যদি হয় তো ফোড়নের জন্য একটু জিরে আর মেথি।

যদি হয়! যদি আবার হবে কি! খিচুড়ি রাঁধতে এসব তো লাগেই, সে কি আর গেরস্তরা জানে না! মা সব কাঠের বারকোশে সাজিয়ে রেখেছে।

লোকটার দিকে চেয়ে মিছরি বলল—সব দেওয়া হচ্ছে। ডাল-চালটা ধুয়ে আসুক।

লোকটা আকাশের দিকে একবার তাকাল। খুব সংকোচের গলায় বলল—বেলা হয়েছে।

সে কথার মধ্যে একটা খিদের গন্ধ লুকিয়ে আছে। শত চেষ্টা করেও লোকটা খিদের ভাবটা লুকোতে পারছে না। গেঞ্জিতে ঢাকা হলেও ওর পাঁজরা দেখা যায়। কারা এরা? কোত্থেকে এল, কোথাই বা যাচ্ছে? ছোটো বোন চিনি যদিও মিছরির পিঠোপিঠি নয়, তবু বোনে বোনে ঠাট্টা ইয়ার্কির সম্পর্ক। ফ্রকপরা চিনি তিনটে ব্যাঙ-লাফ দিয়ে মসলার বারকোশ নিয়ে এসে ঠক করে উনুনের সামনে উঠোনে রেখে, ঝুপসি চুল কপাল থেকে সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—এই যে মসলা দিয়ে গেলাম কিন্তু। দেখ সব, নইলে চড়াই খেয়ে যাবে।

রোগা লোকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বারকোশটা নিচু হয়ে দেখল।

বলল—উরে ব্বাস, গরমমসলা ইস্তক। বাঃ বাঃ, এ না হলে গেরস্ত!

চিনি দুটো নাচুনিপাক খেয়ে মিছরির ধারে এসে জিভ ভ্যাঙাল, বলল—যা দিদি, তোর নামে উকিলের চিঠি এসেছে। বড্ড মোকদ্দমায় পড়ে গেছিস ভাই। চিঠিটা ভিজিয়ে একটু জল খাস শোওয়ার সময়, মিষ্টি লাগবে।

বলে নিচু ডালের একটা পাকা আম দুবার লাফ দিয়ে পেড়ে ফেলল চিনি। শিঙে দিয়ে চুষতে চুষতে যেদিকে মন চায় চলে গেল।

উকিলের চিঠি বলে সবাই খ্যাপায়। আর মোকদ্দমাও বটে। এমন মোকদ্দমায় কেউ কখনো পড়েনি বুঝি।

ধীর পায়ে লাজুক মুখে মিছরি ঘরে আসে। এমনিতে কোনো লাজলজ্জার বালাই নেই। বাপের বাড়িতে হেসে খেলে সময় যায়। কিন্তু ঐ চিঠি যেদিন আসে সেদিন যত লজ্জা। বরের চিঠিই যেন বর হয়ে আসে।

মিছরির বর উকিল।

ছোটোকাকা প্রায় সমানবয়সী। দাদা ঋতীশের চেয়েও ছ' মাসের ছোটো। আগে তাকে নাম ধরেই 'শ্যামা' বলে ডাকত মিছরি, নিজের বিয়ের সময় থেকে 'ছোটো কাকা' বলে ডাকে।

ছোটো কাকা মিছরির নাকের ডগায় দুবার নীলচে খামখানা নাচিয়ে ফের সরিয়ে নিয়ে বলল—রোজ যে আমার কাপড় কাচতে খিটখিট করিস, আর করবি ?

অন্য সময় হলে মিছরি বলত—করব, যাও যা খুশি করোগে।

এখন তা বলল না। একটু হেসে বলল—কাপড় কাচতে কাচতে খিটখিট করব কেন, তোমার নস্যির রুমাল বাবু ও কাচতে বড় ঘেন্না হয়।

—ইঃ ঘেন্না! যা তাহলে, চিঠি খুলে পড়ে সবাইকে শোনাবো।

—আচ্ছা, আচ্ছা, কাচবো।

—আর কী কী করবি সব বল এই বেলা। বৌদি রান্না করে মরে, তুই একেবারে এগোস না, পাড়া বেড়াস। আর হবে সেরকম ?

—না।

—দুপুরে আমার নাক ডাকলে আর চিমটি কাটবি ?

—মাইরি না।

—মনে থাকে যেন! বলে ছোটোকাকা চিঠিটা শুঁকে বলল—এঃ, আবার সুগন্ধী মাখিয়েছে!

বলে কাকা চিঠিটা ফেলে দিল সামনে। পাখির মতো উড়ে চিঠিটা তুলে নিয়ে মিছরি এক দৌড়ে বাগানে।

কত কষ্ট করে এতদূর মানুষ আসে, চিঠি আসে। রেলগাড়িতে ক্যানিং, তারপর লঞ্চে গোসাবা, তারপর নৌকোয় বিজয়নগরের ঘাট, তারপর হাঁটাপথ। কত দূর যে! কত যে ভীষণ দূর!

খামের ওপর একধারে বেগনে কালিতে রবার স্ট্যাম্প মারা। কালি জেবড়ে গেছে, তবু পড়া যায়—ফ্রম বসন্ত মিদ্দার, বি. এ. এল এল. বি-অ্যাডভোকেট। আর বাংলায় মিছরির নাম ঠিকানা লেখা অন্যধারে। রবার স্ট্যাম্পের জায়গায় বুঝি এক ফোঁটা গোলাপগন্ধী আতর ফেলেছিল, সুবাস বুক ভরে নিয়ে বড় যত্নে, যেন ব্যথা না লাগে এমনভাবে খামের মুখ ছিঁড়ল মিছরি। এ সময়টায় তাড়াতাড়ি করতে নেই। অনেক সময় নিয়ে, নরম হাতে, নরম চোখে সব করতে হয়। মা ডাকছে—ও মিছরি, আনাজ তুলতে বেলা গেল। লোকগুলোকে তাড়া দে, বিপিনটা কি আবার গ্যাঁজা টানতে বসে নাকি দ্যাখ।

বড় বিরক্তি। লোকগুলোর সত্যি খিদে পেয়েছে। আকাশমুখো চেয়ে উঠোনে হাভাতের মতো বসে আছে সব। তাদের মধ্যে যারা একটু মাতব্বর, তারা বাবুর সঙ্গে এক চাটাইতে বসে কথাবার্তা বলছে। রান্নার লোকটা বিশাল কড়া চাপিয়ে আধসেরটাক তেল ঢেলে দিল।

মিছরি ক্ষেতে নেমে গিয়ে কুহুস্বরে ডাক দিল—বিপিনদা, তোমার হল? রান্না যে চেপে গেছে। অড়হর গাছের একটা সারির ওপাশ থেকে বিপিন বলে—বিশটা মদ্দ খাবে, কম তো লাগবে না। হুট বলতে হয়ে যায় নাকি! যাচ্ছি, বলো গে, হয়ে এল।

মিছরি চিঠিটা খোলে। নীল, রুলটানা প্যাডের কাগজ। কাগজের ওপরে আবার বসন্ত মিদ্দার এবং তার ওকালতির কথা ছাপানো আছে। নিজের নাম ছাপা দেখতে লোকটা বড় ভালবাসে।

হুট করে চিঠি পড়তে নেই। একটু থামো, চারদিক দেখ, খানিক অন্যমনে ভাবো, তারপর একটু একটু করে পড়ো, গেঁয়ো মানুষ যেমন করে বিস্কুট খায়, যত্নে ছোট্ট ছোট্ট কামড়ে।

চিঠি হাতে তাই মিছরি একটু দাঁড়িয়ে থাকে। সামনের মাঠে একটা ছোট্ট ডোবায় কে একজন কাদামাখা পা ধুতে নেমেছিল। জলে নাড়া পড়তেই কিলবিলিয়ে একশো জোঁক বেরিয়ে আসে। মিছরি দেখতে পায়, লোকটা মাঠে বসে পায়ের জোঁক ছাড়াচ্ছে। ক্ষেতের

উঁচু মাটির দেয়ালের ওপর কোন কায়দায় একটা গরু উঠে পড়েছে কে জানে। এইবার বাগানের মধ্যে হুড়াস করে নেমে আসবে।

নামুকগে। কত খাবে। বাগান-ভর্তি সবজি আর সবজি। অঢেল, অফুরন্ত। বিশ বিঘের ক্ষেত। থাক।

উকিল লিখছে—হৃদয়াভ্যন্তরস্থিতেষু প্রাণপ্রতিমা আমার···। মাইরি, পারেও লোকটা শক্ত কথা লিখতে। লিখবে না! কত লেখাপড়া করেছে।

হু-হু করে বুক চুপসে একটা শ্বাস বেরিয়ে যায় মিছরির। লোকটা কত লেখাপড়া করেছে তবু রোজগার নেই কপালে! এ কেমন লক্ষ্মীছাড়া কপাল তাদের!

উকিল লিখেছে—ঘুমিয়া জাগিয়া কত যে তোমাকে খুঁজি! একটু থমকে যায় মিছরি। কথাটা কী! ঘুমিয়া? ঘুমিয়া মানে তো কিছু হয় না। বোধ হয় তাড়া-হুড়োয় ঘুমাইয়া লিখতে গিয়ে অমনটা হয়েছে। হোকগে, ওসব তো কত হয় ভুল মানুষের। ধরতে আছে?

ছ্যাঁক করে ফোড়ন পড়ল তেলে। হিং ভাজার গন্ধ। রান্নার লোকটা বুঝি কাকে বলল—এর মধ্যে একটু ঘি হলে আর কথা ছিল না।

জ্যাঠা বোধ হয় সান্ত্বনা দিয়ে বলল—হবে হবে। তা মিছরি, পাথরবাটিতে একটু ঘি দিয়ে যা দিকিনি!

মিছরি আর মিছরি! ও ছাড়া বুঝি কারো মুখে কথা নেই! মিছরি নড়ল না। চিঠি থেকে চোখ তুলে উদাসভাবে আকাশ দেখল। আবার একটা টিয়ার ঝাঁক আসছে গাঙ পেরিয়ে। আসুক।

ছোটোকাকার এক বন্ধু ছিল, ত্র্যম্বক। মিছরির বিয়ের আগে খুব আসত এ বাড়িতে। বিয়ের পর আর আসে না। কেন বলো তো! মিছরি উদাস চেয়ে থাকে। কোনোদিন মনের কথা কিছু বলেনি তাকে ত্র্যম্বক। কিন্তু খুব ঘন ঘন তার নাম ধরে ডাকত। সিগারেট ধরাতে দ[illegible] আগুন চাইতে।

কেন যে মনে পড়ল!

উকিল লিখেছে—ত্রিশ টাকার মধ্যে কলিকাতায় ঘর পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজিয়াছি। মাঝে মাঝে ভাবি, বনগাঁ চলিয়া যাইব। সেখানে প্র্যাকটিসের সুবিধা হইতে পারে। বাসাও সস্তা।

তাই যদি যেতে হয় তো যাও। আমি আর পারি না। বিয়ের পর

এক বছর চার মাস হল ঠিক ঠিক। আর কি পারা যায়, বলো উকিলবাবু। তোমার পাষাণ হৃদয়, তার ওপর পুরুষমানুষ, লাফঝাঁপ করে তোমাদের সময় কেটে যায়। আর আমি মেয়েমানুষ লঙ্কাগাছে জল ঢেলে কি বেলা কাটে আমার, বলো? চোখের নোনা জলে নোনা-গাঙে জোয়ার ফেলে দিই রোজ। উকিলবাবু, পায়ে পড়ি······

খিচুড়িতে আলু, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়স, ঝিঙে, পটল সব ঢেলে দিয়ে রোগা বামুনটা আম গাছের তলায় জিরেন নিচ্ছে। গলার ময়লা মোটা পৈতেটা বেরিয়ে গেঞ্জির ওপর ঝুলে আছে। বড্ড রোগা, ঘামে ভিজে গেছে তবু গেঞ্জি খোলেনি পাঁজর দেখা যাওয়ার লজ্জায়। বিড়ি ধরিয়ে ছোটোকাকাকে বলল—বৌ আর ছেলেপিলেদের সোনারপুর ইস্টিশানে বসিয়ে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। তারা সব কদিন ভিক্ষে-সিক্ষে করে খাবে। ঠিক করেছি বাদার যেখানে পাব জমি দখল করে ঘর তুলে ফেলব আর চাষ ফেলে দেবো। মশাই, কোনোখানে একটু ঠাঁই পেলাম না আমরা। বাঁচতে তো হবে, নাকি!

ছোটোকাকা বলে, কতদূর যাবেন? ওদিকে তো সুন্দরবনের রিজার্ভ ফরেস্ট আর নোনা জমি। বাঘেরও ভয় খুব। লোকটা বিড়ি টেনে হতাশ গলায় বলে, আসতে আসতে এতদূর এসে পড়েছি আর একটু যেতেই হবে। বাঘেরও খিদে, আমাদেরও খিদে, দুজনাকেই বেঁচে থাকতে হবে তো।

উকিলবাবু আর কী লেখে? লেখে—সোনামণি, আমার তিনকুলে কেহ নাই, নইলে তোমাকে বাপের বাড়ি পড়িয়া থাকিতে হইত না। যাহা হউক, লিখি যে আর কয়দিন ধৈর্য ধর। কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু হইবেই। ওকালতিতে পসার জমিতে সময় লাগে।

বুঝি তো উকিলবাবু, বুঝি। তোমার যেদিন পসার হবে ততদিন আমি থাকব তো বেঁচে! যদি মরে যাই, তবে তোমার লক্ষ্মীমন্ত ঘরে আর কোন না কোন পেত্নী এসে আমার জায়গায় ডোঁড়মুশে সংসার করবে। বালা বাজিয়ে হাওয়া খাবে, মাছের মুড়ো চিবোবে, গাল ভরতি পান খেয়ে রুপোর বাটায় পিক ফেলবে। ততদিন কি বাঁচবো উকিলবাবু?

বিপিন কলাপাতা কেটে উঠোনে ফেলছে। ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে দলটার মধ্যে। ঝপাঝপ পাতা টেনে বসে পড়ল সব। বাঁ হাতে সকলের পাঁচ ছটা করে কাঁচা লঙ্কা, পাতে একথাবা নুন। খিচুড়ি

এখনো নামেনি। সবাই কাঁচা লঙ্কা কামড়াচ্ছে নুন মেখে। ঝালে শিস দিচ্ছে।

উকিলবাবু কী লেখে আর? লেখে—বন্ধুর বাসায় আর কতদিন থাকা যায়? ভাল দেখায় না। ধারও অনেক হইয়া গেল। লজ্জার মাথা খাইয়া লিখি, কিছু টাকা যদি পারো……

গরম খিচুড়ি মুখে দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে চেঁচিয়ে ওঠে জিভের যন্ত্রণায়। একজন বুড়ো বলে—আস্তে খা। ফুঁইয়ে ফুঁইয়ে ঠাণ্ডা করে নে।

—উঃ, যা রেঁধেছো না হরিচরণ, লাট বাড়ির বাস ছেড়েছে।

মিছরি আমতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। বেলা হেলে গেছে। গাছ-তলায় আর ছায়া নেই। রোদের বড় তেজ।

দলের মাতব্বর জিজ্ঞেস করে মিছরির বাবাকে—ওদিকে কি কানো আশা নেই মশাই? অ্যাঁ! এত কষ্ট করে এতদূর এলাম।

মিছরি ঘরে চলে আসে। চোখ জ্বালা করছে। বুকটায় বড় কষ্ট।

পড়ন্ত বেলায় মিছরি তার উকিলকে চিঠি লিখতে বসে—আশা হারাইও না। পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে…।

দূরত্ব

মন্দার টেবিলের ওপর শুয়ে ছিল। থার্ড পিরিয়ড তার অফ। মাথার নিচে হাত, হাতের নিচে টেবিলের শক্ত কাঠ। বুকের ওপর ফ্যান ঘুরছে। শরীরটা ভাল নেই কদিন। সর্দি। ফ্যানের হাওয়াটা তার ভাল লাগছিল না। কিন্তু বন্ধ করে দিলে গরম লাগবে ঠিক। শার্টের গলার বোতামটা আটকে সে শুয়েছিল। ক্রমে ঘুম এসে গেল। আর ঘুম মানেই স্বপ্ন, কখনো স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমোয় না মন্দার।

স্বপ্নের মধ্যে দেখল তার বৌ অঞ্জলিকে। খুব ভিড়ের একটা ডবল-ডেকার থেকে নামবার চেষ্টা করছে অঞ্জলি। অঞ্জলির কোলে একটা কাঁথা জড়ানো আঁতুড়ের বাচ্চা। নিচের মানুষরা অঞ্জলিকে ঠেলে উঠবার চেষ্টা করছে, পিছনের মানুষরা নামবার জন্য অঞ্জলিকে ধাক্কা দিচ্ছে, চারিদিকের লোকেরা অঞ্জলিকে কনুই দিয়ে ঠেলছে, সরিয়ে দিচ্ছে, ধাক্কা মারছে, তার মুখখানা কাঁদো কাঁদো, কোলের বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে, কোনদিকেই যেতে পারছে না সে। নামতেও না, উঠতেও না, বাচ্চাটা অঞ্জলির শরীর ভাসিয়ে বমি ক'রে দিল, পায়খানা করল, পেচ্ছাব করছে। চারিদিকে রাগী, বিরক্ত, ব্যস্ত মানুষরা চেঁচাচ্ছে, গাল দিচ্ছে, যেন বাচ্চাসুদ্ধ অঞ্জলি জাহান্নামে যাক, না গেলে তারাই পাঠাবে। ঘুমের মধ্যেই মন্দার ভিড় ঠেলে অঞ্জলির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিল আকুলভাবে। কিন্তু প্রতিটি লোকই পাথর। কাউকে ঠেলে সরাতে পারছে না মন্দার। সে চেঁচিয়ে বলছিল—আমি কিন্তু নেমে পড়েছি অঞ্জলি, তোমাকেও নামতে হবে-এ। নামো শিগগির নামো, বাস ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেই স্বর এত দুর্বল যে ফিসফিসের মত শোনা গেল। ক্রুদ্ধ কণ্ডাক্টার ডবল ঘণ্টি বাজিয়ে দিচ্ছে····অঞ্জলির কী যে হবে।

দুঃস্বপ্ন। চোখ খুলে মন্দার বুকের ওপর ঘুমন্ত পাখাটা দেখতে পায়। পাশ ফিরে শোয়।

অঞ্জলি এখন আর তার ঠিক বৌ নয়। মাস ছয়েক আগে মন্দার মামলা দায়ের করেছিল। আপসের মামলা। সেপারেশন হয়ে গেছে অঞ্জলি যখন চলে যায় তখন তার পেটে মাস দুয়েকের বাচ্চা। এত-

দিনে বোধ হয় বাচ্চা হয়েছে, মন্দার খবর রাখে না। দেখেনি। ছেলে না মেয়ে, তা জানতে ইচ্ছেও হয়নি। কারণ, বাচ্চাটা তার নয়।

বিয়ের সাতদিনের মধ্যে ব্যাপারটা ধরতে পারল মন্দার। তখনই মাস দুয়েকের বাচ্চা পেটে অঞ্জলির। তা ছাড়া অঞ্জলির ব্যবহারটাও ছিল খাপছাড়া। কথার উত্তর দিতে চাইত না, ভালবাসার সময়গুলিতে কাঁটা হয়ে থাকত। তবু দিন সাতেক ধরে অঞ্জলিকে ভালবেসেছিল মন্দার। মেয়েদের সম্পর্কহীন জীবনে অঞ্জলি ছিল প্রথম রহস্য। দিন সাতেকের মধ্যেই বাড়িতে অঞ্জলিকে নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়। মন্দারের কানে কথাটা তোলে তার ছোটো বোন। শুনে মন্দারের জীবনে এক স্তব্ধতা নেমে আসে। অঞ্জলি অস্বীকার করেনি। মন্দার সোজা গিয়ে যখন অঞ্জলির বাবার সঙ্গে দেখা করে, তখন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধটি কেঁদে ফেলেছিলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে একটিও কথা বলেননি। শুধু বলেছিলেন—ওর সিঁথিতে সিঁদুরের দরকার ছিল, আমি সেটুকুর জন্য তোমাকে এই নোংরামিতে টেনে নামিয়েছি। ওকে তুমি ফেরত দেবে জানতাম। যদি একটি কথা রাখো, ওর ছোট বোনের বিয়ে আর দু মাস বাদে, সব ঠিক হয়ে গেছে, শুধু এই কটা দিন কথাটা প্রকাশ কোরো না। মামলা তারপর দায়ের কোরো। আমি কথা দিচ্ছি, মামলা আমরা লড়বো না।

অঞ্জলি ফেরত গেল বিয়ের দশ দিনের মাথায়। দু মাস অপেক্ষা করে মামলা আনে মন্দার। অঞ্জলি লড়ল না, ছেড়ে দিল। অঞ্জলির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বিয়ের পর আট মাস কি ন'মাস কেটে গেছে। মন্দার এখনও কেমন বেকুবের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে।

পাশ ফিরে শুতেই দেখা যায়, বইয়ের আলমারি। আলমারির ওপরেই উঁইপোকার আঁকাবাঁকা বাসা। সেদিকে চেয়ে থেকে সে স্বপ্নটা কেন দেখল তা মনে মনে নাড়াচাড়া করল একটু। আসলে স্বপ্নের তো মানে থাকে না। আর এ তো ঠিকই যে, অঞ্জলির কথা সে এখনো ভুলে যায়নি। এসব কি ভোলা যায়?

আজ মঙ্গলবার। আজই তার দুটো ক্লাশ। একটা সেকেণ্ড পিরিয়ডে নিয়েছে, আর একটা ফিফথ্ পিরিয়ডে নেওয়ার কথা। এ সময়টায় কলেজে ক্লাশ বেশি থাকে না। পি, ইউ-তে এখনো ছেলে ভর্তি হয়নি, পার্ট টু বেরিয়ে গেছে। সপ্তাহে দু দিন ছুটি থাকে তার, অন্য দিন একটা দুটো ক্লাশ নেয়, বাকি সময়টা শুয়ে থাকে। কেউ কিছু বলে

না। সকলেই জেনে গেছে, মন্দার চ্যাটার্জির ডিভোর্স হয়ে গেছে, তার মন ভাল না, সে একটু অস্বাভাবিক মানসিকতা নিয়ে কলেজে আসে। এসব ক্ষেত্রে একটু আধটু স্বেচ্ছাচার সবাই মেনে নেয়। মন্দার টেবিলে উঠে শুয়ে থাকলেও কেউ কিছু বলে না। থার্ড পিরিয়ড চলছে, ঘরে কেউ নেই, মন্দার একা। আবার ঘুমোতে তার ইচ্ছে করছিল না। ঐ ঘটনার পর কয়েকটা দিন খুবই অস্বাভাবিক বোধ করেছিল ঠিকই। বোধ হয় তার সাময়িক একটা মাথা খারাপের লক্ষণও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা নয়। সময়, সময়ের মতো এখন সান্ত্বনাকারী আর কেউ নেই। মন্দারের মনে সময়ের স্রোত তার পলির আস্তরণ দিয়ে দিয়েছিল। আজ হঠাৎ ঐ দুঃস্বপ্ন।

বেয়ারাকে ডেকে এক পেয়ালা চা আনিয়ে খেল মন্দার। তারপর ছেলেদের খবর পাঠাল, ফিফ্‌থ পিরিয়ডের ক্লাশটা আজ সে করবে না। অনেকদিন ধরে বৃষ্টি নেই, বাইরে একটা চমকানো রোদ স্থির জ্বলে যাচ্ছে। বাইরে মন্দারের জন্য কিছু নেই। সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে এতদিনে তার একটা বাচ্চা হতে পারত; আর তাহলে এখন মন্দার এই ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে সেই শিশুটির কাছেই ফিরে যেত হয়তো বা সেই শিশুশরীরের গন্ধটি শ্বাসে টেনে নিতে।

এত বড় জোচ্চুরি যে টেঁকে না, তা কি অঞ্জলি জানত না? তার বাবাও কি জানত না? তবে তারা খামোখা কেন ঐ কাণ্ড করল? কেবল একটু সিঁদুরের জন্য কেউ কি একটা লোকের সারা জীবনের সুখ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে? কীরকম বোকামি এটা? দু মাসের বাচ্চা পেটে লুকিয়ে রেখে বিয়ে—ভাবা যায় না, ভাবা যায় না।

স্বপ্নে দেখা অঞ্জলির অসহায় ব্যথাতুর মুখখানার প্রতি যে সমবেদনা জন্মলাভ করেছিল তা ঝরে গেল। জাগ্রত মন্দারের ভিতরটা হঠাৎ আক্রোশে রাগে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু কিছু করার নেই। ট্রামে বাসে অচল আধুলি পেয়ে ঠকে যাওয়ার মতোই ঘটনা। কিছু করার থাকে না। অঞ্জলি আজও তার নামে সিঁদুর পরে কিনা কে জানে।

মন্দার বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। গরমের দুপুর রাস্তা ফাঁকা। সে ট্যাক্সিটায় বসে ঘাড় এলিয়ে স্বপ্নটার কথা না ভেবে পারে না। ভিড়ের ভিতর একটা ডবলডেকার থেকে নামতে পারছে না অঞ্জলি, কোলের বাচ্চাটা তার সারা শরীর ভাসিয়ে দিচ্ছে নিজের শরীরের অভ্যন্তরীণ ময়লায়, ক্বাথে। নিষ্ঠুর মানুষেরা অঞ্জলিকে ঠেলছে,ধাক্কা

দিচ্ছে। গাল এবং অভিশাপ দিচ্ছে। এই স্বপ্নের কোনো মানে হয় না। অঞ্জলির সংগে তার আর দেখা হয়নি। দেখা হওয়ার কথাও নয়। এখন সে কি তার প্রেমিকের ঘর করছে? কে জানে! স্বপ্নে মন্দার অঞ্জলিকে সেই ভিড় থেকে, অপমান লাঞ্ছনা আর বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। জাগ্রত মন্দার কোনোদিনই সেই চেষ্টা করবে না।

ট্যাক্সিওয়ালাটা খোঁচায়। কেবলই ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাবেন?

মন্দার বিরক্ত হয়ে বলে—সোজা চলুন, বলে দেবো।

কিছুক্ষণ দিক ঠিক করতে সময় গেল। কলকাতার কত অল্প জায়গা চেনে মন্দার! তার চেনা মানুষেব সংখ্যাও কত কম। এখন এই ট্যাক্সিতে বসে কারো কথাই তার মনে পড়ে না, যার কাছে যাওয়া যায়। কোনো জায়গাও ভেবে পায় না সে যেখানে গিয়ে নিরিবিলিতে একটু বসে থাকবে। বাসায় ফেরার কোনো অর্থ নেই। সেখানে পলিটিক্যাল সায়েন্সের গাদাগুচ্ছের বইতে আকীর্ণ ঘরখানা বড্ড রস-কসহীন। গত কয়েকমাস সেই বই প্রায় ছোঁয়নি। থিসিসের কিছু পাতা লেখা হয়েছিল, পড়ে আছে। ঘরে কেবল বিছানাটাই মন্দারের প্রিয়। যতক্ষণ ঘরে থাকে, শুয়েই থাকে মন্দার। ঘুমোয়, ভাবে, সিগারেট খায়। আজকাল কেউ ঘরে ঢোকে না ভয়ে।

ট্যাক্সিটা কিছুক্ষণ ইচ্ছেমতো এদিক-ওদিক ঘোরালো সে। তার-পর অচেনা রাস্তায় এসে পড়ায় চিন্তিতভাবে এক জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ভাড়া দিয়ে নেমে গেল।

কোথায় নেমেছে তা বুঝতে পারল না, তবু এ তো কলকাতাই! ঘুরে-ফিরে ডেরায় ফিরে যাওয়া যাবে। ভয় নেই। কিছুক্ষণ হাঁটলে বোধ হয় ভালই লাগবে।

অচেনা রাস্তা ধরে আন্দাজে সে হাঁটে। বুঝতে পারে, চৌরঙ্গির কাছাকাছি অঞ্চল। নির্জন পাড়া, গাছের ছায়া পড়ে আছে, বাড়িগুলো নিঃঝুম। কয়েকটা দামী বিদেশী গাড়ি এধারে-ওধারে পড়ে আছে। মন্দার চম্‌কি রোদে কিছুক্ষণ হাঁটে। ভাল লাগে না, তা বুঝতে পারে না। রোদ বড্ড বেশি। গরম লাগে, ঘাম হয়। শরীরের শ্রম মনের ভার লাঘবে কাজ করে না। মন জিনিসটা বড় ভয়ানক।

আসলে সে বুঝতে পারে, একবার অঞ্জলির সংগে তার দেখা হওয়া

দরকার। গত ছ মাস ধরে বন্ধনমুক্ত মন্দার সুখী নয়। এই সুখী না হওয়ার কারণ সে খুঁজে পায় না, পাচ্ছে না। সে ঠকে গিয়েছিল বলে আক্রোশ? তাকে একটা চক্রান্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ঘৃণা? সে অঞ্জলিকে ছুঁয়েছিল, ভালবেসেছিল বলে বিবমিষা? উত্তরটা অঞ্জলির কাছে আর একবার না গেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডবলডেকারের পাদানির ভিড়ে অঞ্জলিকে স্বপ্নে দেখার কোন মানে না থাক্, গত ছ মাস মন্দার যে সুখী নয় এটা সত্য। ভয়ঙ্কর সত্য। বিস্মৃতির পলি পড়ছে মনে, ক্রমে শান্ত হয়ে আসছে, এবং এই ভাবেই একদিন হয়তো বা সে দার্শনিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান নেই। সে আবার বিয়ে করবে ঠিকই। মেয়ে দেখা হয়েছে। সামনের শ্রাবণে সে খুবই অনাড়ম্বর একটি অনুষ্ঠান থেকে তার নতুন স্ত্রীকে তুলে আনবে। কিন্তু তবু অসুখীই থেকে যাবে মন্দার। অঞ্জলির কাছে একটা রহস্য গোপন রয়ে গেছে।

অঞ্জলি দেখতে ভাল, অন্যদিকে খুবই সাধারণ। বি-এ পড়তে পড়তে বিয়ে হয়েছিল। খালি গলায় গাইতে পারত।' রঙ চাপা, মাথায় গভীর চুল, ভীরু চাউনি ছিল। আর তেমন কিছু মনে পড়ে না। বিয়ের সাতদিন বাদে এক রাত্রিতে প্রায় উন্মাদ মন্দার জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি প্রেগন্যান্ট?

অঞ্জলি ভীষণ ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য দুটো হাত সামনে তুলে, ভীরু, খুব ভীরু চোখে চেয়ে বলেছিল—আমার বাবা এই বিয়ে জোর ক'রে দিয়েছেন, আমি চাইনি—

—তুমি প্রেগন্যান্ট কিনা বলো।

—হ্যাঁ।

—মাই গুডনেস্!

অঞ্জলি তবু কাঁদেনি. কেবল ভয় পেয়েছিল। কী হবে তা অঞ্জলি বোধ হয় জানত। মন্দার যখন অস্থির হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল তখন ঘরে অঞ্জলির বাক্স গোছানোর শব্দ পেয়েছিল। অর্থাৎ অঞ্জলি ধরেই নিয়েছিল চলে যেতে হবে। মানুষ বরাবর এই সরে-যাওয়াটা বিশ্বাস করে।

ক্লান্ত মন্দার আবার একটা ফুটপাথের দোকান থেকে ভাঁড়ের চা খায়। গাছের তলায় কয়েকটা পাথর। তারই একটার ওপর, অন্য-মনে বসে ভাঁড়টা শেষ করে। অঞ্জলির কাছে যাওয়াটা ভারী বিশ্রী

হবে। ভাঁড়টা ছুড়ে ফেলে দেয় সে। অঞ্জলিদের বাড়িতে টেলিফোন নেই।

আবার একটা ট্যাক্সি নেয় মন্দার। এবার সে উত্তর কলকাতার একটা কলেজের ঠিকানা বলে ড্রাইভারকে। তারপর চোখ বুজে পড়ে থাকে। নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করার কোনো মানে নেই। তবু এখন একটা কিছু বড় দরকার মন্দারের। কী যে দরকার তা ঠিক জানে না। নন্দিনীর সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় নেই। বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে পারিবারিক যোগাযোগে।

নন্দিনীকে পেতে একটুও কষ্ট হল না : ক্লাশ ছিল না বলে কমন-রুমে আড্ডা দিচ্ছিল। বেয়ারা ডেকে দিয়ে গেল।

মন্দারকে দেখে নন্দিনী ভীষণ অবাক। লোকটা কী ভীষণ নির্লজ্জ! সামনের শ্রাবণে বিয়ে, তবু দেখ তার আগেই কেমন দেখা করতে এসেছে!

—আপনি?

—আমি মন্দার....

—জানি তো!

—একটু দরকারে এলাম, কটা কথা বলতে।

—কী কথা?

—আমার প্রথমা স্ত্রীর সম্পর্কে।

—সেও তো জানি।

—ওঃ।

—আর কিছু?

—না, আর কিছু নয়। ভেবেছিলাম বুঝি তোমাকে আমাদের বাসা থেকে কিছু জানানো হয়নি।

—আপনি ওটা নিয়ে ভাববেন না। আমি ভাবি না।

মন্দার নন্দিনীকে একটু দেখে। চোখা চেহারার মেয়ে। খুব বুদ্ধি আছে মনে হয়। বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো জলুস নেই। রঙ ফর্সা, লম্বাটে মুখ, ছোটো নাক। আলগা সৌন্দর্য কিছু নেই।

মন্দার বলল—কিছু মনে করলে না তো।

নন্দিনী হাসে—এই কথা বলার জন্য আসার কোন দরকার ছিল না। আজকাল চড়া রোদ হয়।

—ট্যাক্সিতে এসেছি।

—অযথা খরচ।

—আমার খুব একা লাগছিল।

নন্দিনী একটু মাথা নিচু করে ভাবল। নন্দিনীর সঙ্গে মন্দারের মাত্র একবার দেখা হয়েছিল পাত্রী দেখতে গিয়ে। বিয়ে অবশ্য ঠিক হয়ে গেছে, তবু এতদূর মন্দার না করলেও পারত। তার লজ্জা করছিল।

নন্দিনী মুখ তুলে আস্তে বলল—আমার এখন অফ্ পিরিয়ড চলছে, শেষ ক্লাশটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের—ওটা তো না করলেও চলবে।

—না করলেও চলবে কেন?

নন্দিনী একটু হেসে বলে—পলিটিক্যাল সায়েন্সে ফেল করব না।

মন্দারও একটু হাসে। বলে—তাহলে তো তোমার ছুটিই এখন?

—মনে করলেই ছুটি।

—কোথায় যাবে?

—আমি কী জানি! যদি কেউ নিয়ে যেতে চায়।

খুবই চালু মেয়ে তার ভাবী বৌ। এত চালু মন্দার ভাবেনি। ওর ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় ও খুব কথা বলে। বেশ বুদ্ধির কথা, চটপট কথার জবাব দিতে পারে, রসিকতা করতে জানে, সাধারণ লজ্জা-সংকোচ ওর নেই। পাত্রী দেখতে গিয়ে এতটা লক্ষ করেনি মন্দার। তখন অভিভাবকদের সামনে হয়তো অন্যরকম হয়েছিল। একে সঙ্গে নিতে ইচ্ছে করছিল না মন্দারের। কথা নয়, চুপচাপ বসে থাকবে, এমন একজন সঙ্গী দরকার তার। যার মন খুব গভীর, যার স্পর্শ-কাতরতা খুব প্রখর। যে কথা ছাড়াই মানুষকে বুঝতে পারে।

মন্দার ঘড়িটা দেখে—বলল—আমার চারটেয় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ থাক। কোনো দিন আসবো!

একটু হতাশ হয় নন্দিনী। বলে—আসার তো দরকার ছিল না।

—ছিল। তুমি বুঝবে না।

—বুঝবো না কেন?

—আমি নিজেই বুঝি না।

বলে মন্দার কলেজ থেকে বেরিয়ে এল।

মাত্র গোটা চারেক টাকা পকেটে আছে। তবু মন্দার আবার

ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল। খানিকদূর হেঁটে পেয়েও গেল একটা। দক্ষিণ দিকে ট্যাক্সি চালাতে বলে আবার ঘাড় এলিয়ে চোখ বোজে সে। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটা দেখতে পায়। সেই ডবলডেকারের পা-দানি, ভিড়, টাল-মাটাল অঞ্জলি, কোলে শিশু।

অঞ্জলিদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল মন্দার। ভাড়া দিতে গিয়ে পকেট সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল। টাকা আর খুচরো যা ছিল সব দিয়েও পনেরো পয়সা কম হল। ট্যাক্সিওয়ালা হেসে সেটা ছেড়ে দিয়ে গেল।

দরজা খুললেন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ। অঞ্জলির বাবা। খুলে ভারি অবাক হলেন।

—বাবাজীবন, তুমি ?

—আমিই।

—এসো এসো।

মন্দার ঘরে ঢোকে। অঞ্জলির মা নেই। ভাইরা বৌ নিয়ে আলাদা থাকে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িটা একটু অগোছাল।

—বসবে না ? বুড়ো তাকে চেয়ার এগিয়ে দেয়।

মন্দার বসে। জিজ্ঞেস করে—কী খবর ?

—খবর আর কী ? কোনো রকম। বুড়ো গলা-খাঁকারি দেয়।

—আমি অঞ্জলির খবর জানতে চাইছি।

বুড়োর ঠিক বিশ্বাস হয় না। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নেয়। বলে—সে ভিতরের ঘরে আছে।

মন্দার চুপ করে থাকে।

বুড়ো খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করেন—কী চাও মন্দার ? ওকে কিছু বলবে ?

—হুঁ।

—যাও না, নিজেই চলে যাও ভিতরে। ডাকলেই সাড়া পাবে।

সাত দিনের জন্য এ বাড়িটা তার শ্বশুরবাড়ি ছিল, এই সুন্দর বৃদ্ধটি ছিলেন তার শ্বশুর। বাড়িটা মন্দারের চেনা। একটু সংকোচ হচ্ছিল, তবু মন্দার উঠল।

বৃদ্ধ বলে—ভিতরে বাঁদিকের ঘরে আছে।

মন্দার যায়।

দরজা খোলা। অঞ্জলি শুয়ে আছে বিছানায়। পাশে একটা পুঁটলির মতো বাচ্চা তুলতুল করে। সে ঘুমোচ্ছে।

মন্দার ঘরে পা দিতেই অঞ্জলি মুখ ফিরিয়ে তাকাল। চমকে উঠল কিনা কে জানে। অবাক হল খুব। উঠে বসল খুব ধীরে। কোনো প্রশ্ন করল না। কেবল বাচ্চাটাকে একটা হাত বাড়িয়ে আড়াল করার চেষ্টা করল। চোখে ভয়। মন্দার হাসে। জিজ্ঞেস করে—কবে হল ?

—আজ আট দিন।

—ভাল আছো ?

—না। খুব কষ্ট গেছে।

—আমার শরীরে রক্ত ছিল না। বলে শ্বাস ফেলল অঞ্জলি—খুব কষ্ট গেছে। বিকারের মতো হয়েছিল। তুমি বোসো। ঐ চেয়ার টেনে নাও। কিছু বলবে ?

—বলব।

—কী ?

—আমি ভীষণ অসুখী।

—হওয়ার কথাই। এখন কী করতে চাও ?

—কয়েকটা ভাইটাল প্রশ্ন করব।

—করো।

—তোমার প্রেমিকটি কে ?

বিস্ময়ে চোখ বড় করে অঞ্জলি বলে—প্রেমিক ?

—ঐ বাচ্চাটার বাবার কথা বলছি।

—সে আমার প্রেমিক হবে কেন ? তাকে তো আমি ভালবাসতাম না, সেও আমাকে বাসত না।

—তাহলে এটা কী করে হল ?

—হয়ে গেল। কত কিছু এমনিই হয়ে যায় যা ঠিক বুঝতেই পারা যায় না।

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল। ভুল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন সে করতে চায়নি। এই প্রশ্ন করতে সে আসেনি ? তবে কী প্রশ্ন ? কী প্রশ্ন ?

সে বলল—তুমি ওর বাবাকে বিয়ে করবে না ?

—বিয়ে ! ভারী অবাক হয় অঞ্জলি, বলে—তা কি সম্ভব ? সে কোথায় চলে গেছে। তা ছাড়া আমি তা করতে যাবো কেন ? ওটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে !

এও ভুল প্রশ্ন। মন্দার বুঝতে পারে। এবং তারপর সে আবার একটা ভুল প্রশ্ন বলে—তুমি কি আমার কাছে কিছু চাও ?

—না। তুমি অনেক দিয়েছো।

—কী দিয়েছি ?

—এই বাচ্চাটার একটা পরিচয়।

মন্দার বিস্ময়ে প্রশ্ন করে—ও কি আমার বাচ্চা হিসেবেই চালু থাকবে নাকি ?

—যদি তুমি অনুমতি দাও।

মন্দার একটু ভেবে বলে—থাকুক।

অঞ্জলি খুশি হল। বলল—আমি জানতাম, তুমি আপত্তি করবে না।

আমি বিয়ে করছি অঞ্জলি।

—জানি। করাই উচিত।

তবু সঠিক প্রসঙ্গটা খুঁজে পাচ্ছে না মন্দার। এসব কথা নয়, এর চেয়ে জরুরি কী একটা বলবার আছে তার। বুঝতে পারছে না। খুঁজে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তাই সে বেকুবের মতো বসে থাকে।

—তোমার শরীরে রক্ত নেই ?

—না। কিছু খেতে পারতাম না গত কয়েক মাস। বাচ্চাটা তখন আমার শরীর শুষে খেয়েছে। ওর দোষ নেই। বাঁচতে তো ওকেও হবে। শরীরটা তাই গেছে।

—তোমার অসুখটা কেমন ?

—বুঝতে পারছি না। তবে ভীষণ দুর্বল।

—তুমি শুয়ে থাকো বরং! শুয়ে শুয়ে কথা বলো।

—তাই কি হয়! বলে বসে বসে অঞ্জলি একটু কাঁদে, বলে শ্বশুরবাড়িতে এসেছো, তোমাকে কেউ আদরযত্ন করার নেই। দেখ তো কী কাণ্ডটা!

মন্দার চুপ হয়ে থাকে।

অঞ্জলি তক্ষুনি নিজের ভুল সংশোধন করে বলে—অবশ্য এখন তো আর শ্বশুরবাড়ি এটা নয়, আমারই ভুল।

মন্দার একটু দুঃখ পায়। অঞ্জলির মুখটা ফোলা ফোলা, শরীরও তাই। বোধ হয় শরীরে জল এসে গেছে ওর।

মন্দার জিজ্ঞেস করে—তোমার বাচ্চাটা কেমন হয়েছে ?

—ভাল আর কী। আমার শরীর থেকেই তো ওর শরীর! একটা খারাপ হলে আর একটা ভাল হবে কী ক'রে ?

কিন্তু কী কথা বলতে এসেছে মন্দার ? মনে পড়ছে না, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ এসব সাধারণ কথা নয় ; এ ছাড়া আর একটা কী কথা যেন ! মন্দার চুপ ক'রে বসে থাকে। ভাবে। অঞ্জলি তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে সেই ভীতু ভাব। বোধ হয় সব সময়ে নিজের অপরাধের কথা ভাবে ও, আর সব সময়ে ভয় পায় তার অপরাধের প্রতিফল কোনো না কোনো দিক থেকে আসবেই।

মন্দার জিজ্ঞেস করল—এ জানাজানির পর তোমার অবস্থা নিশ্চয়ই বেশ খারাপ ?

অঞ্জলি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—তা জেনে কী হবে ?

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল মাত্র।

সেই শ্বাসের শব্দে অঞ্জলি তার দিকে তাকাল, জলভরা চোখ। বলল—আমি খুব একা। আমার কেউ নেই।

—জানি।

—তুমি ভীষণ দয়ালু। তোমার তুলনা নেই। তুমি আমার ওপর রাগ করতে চাইছো, কিন্তু পারছো না।

মন্দার একটু চমকায়। কথাটা সত্য। সে অঞ্জলির ওপর রাগ ঘৃণা সবই প্রকাশ করতে চায় কিন্তু তার মনের মধ্যে কিছুতেই রাগের সেই ঝড়টা ওঠে না। উঠলে ভাল হতো বোধ হয়। মন্দার আবার একটা শ্বাস ফেলে।

বাইরে থেকে অঞ্জলির বাবার গলা পাওয়া যায়—মন্দার !

মন্দার মুখ ফিরিয়ে ভারী অবাক হয়। সুন্দর বৃদ্ধটি দরজায় দাঁড়িয়ে। তাঁর এক হাতে খাবারের প্লেট, অন্য হাতে চায়ের কাপ। মন্দারের চোখে চোখ পড়তেই লাজুক মুখে বলে—বাড়িতে কাজের লোক নেই তাই....

মন্দার বিস্মিতভাবে বলে—নিজেই করলেন ?

—আমার অভ্যাস আছে। আঁতুড় ঘরে বসে খেতে ঘেন্না করে না তো বাবা ! তুমি না হয় বাইরের ঘরে এসো।

—আমি কিছু খাবো না।

—খাবে না ? বলে বুড়োমানুষ ভারী অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। সাধা-সাধি করতে বোধ হয় তারা ভয় পায়। মন্দারকে তাদের ভীষণ ভয়।

যেন বা বুড়ো জানত যে মন্দার এ বাড়ির খাবার খাবে না, তাই মাথা নিচু ক'রে বলে—আচ্ছা, তাহলে বরং থাক্।

অঞ্জলি অবাক হয়ে তার বাবার দিকে চেয়েছিল। মন্দারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—কলেজ থেকে এলে তো?

—হুঁ।

—খিদে পায়নি?

অঞ্জলি চুপ করে থাকে। কিছু বলার নেই। তারা অপরাধীর মত মন্দারের দিকে চেয়ে আছে। জোর করে খাওয়াবে এমন সম্পর্ক নয়।

অসহ্য। মন্দার উঠে গিয়ে বুড়োর হাত থেকে প্লেট আর কাপ নিয়ে বলে—ঠিক আছে। খাচ্ছি।

বাপ বেটিতে খুব অবাক হয়। তারা একটুও আশা করেনি এটা।

বুড়ো চলে গেল। মন্দার অঞ্জলিকে বলে—এসব ফর্মালিটির দরকার ছিল না। অঞ্জলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—ডিভোর্স জিনিসটা বাবা বোঝেন না। সেকেলে মানুষ। ওঁর কাছে এখনও তুমি জামাই, বরাবর তাই থাকবে। ওঁদের মন থেকে এসব সংস্কার তুলে ফেলা ভারী মুস্কিল।

মন্দার উত্তর দেয় না।

অঞ্জলি নিজে থেকেই আবার বলে—বাবার আর দোষ কী! আমি নিজেও মন থেকে সম্পর্ক তুলে দিতে পারিনি। স্বামী জিনিসটা যে মেয়েদের কাছে কী!

—ওসব কথা থাক।

অঞ্জলি মাথা নেড়ে বলে—থাকবে কেন! এখন তো আর আমার ভয় নেই। এইবেলা বলতে সুবিধে। আমি হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবও না।

—কী বলতে চাও?

সংস্কারের কথা। মেয়েলি সংস্কার। মন্ত্র, সিঁদুর, যজ্ঞ—এসব কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারি না। তুমি আমার কেউ না, তবু মনে হয়, কেবলই মনে হয়....অঞ্জলি চুপ ক'রে থাকে। একটু কাঁদে বুঝি।

মন্দার তাড়াতাড়ি বলে—অঞ্জলি, তোমাকে আমি কী একটা কথা বলতে এসেছিলাম, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ কথাটা খুবই জরুরী।

—বলো।

—বললাম তো মনে পড়ছে না।

—একটু বসে থাকো, মনে পড়বে। যদি ঘেন্না না করে তবে খাবারটা খেয়ে নাও। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে মনে পড়ে যাবে।

মন্দার অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। অঞ্জলি তার দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে যেন বুঝবার চেষ্টা করে।

মন্দার একটু আধটু খুঁটে খায়, চায়ে চুমুক দেয়। মনে পড়ে না।

—তুমি কি আমার কথা মাঝে মাঝে ভাবো? অঞ্জলি আচমকা জিজ্ঞেস করে।

—ভাবি।

—কেন ভাবো?

—তুমি আমার ওপর বড্ড অন্যায় করেছিলে যে।

—সে তো ঠিকই।

—তাই ভুলতে পারি না। মানুষ ভালবাসার কথা সহজে ভোলে; প্রতিশোধের কথাটা ভুলতে পারে না।

—আমি এত অসহায় যে আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কিছু নেই তোমার। আমি তো শেষ হয়েই গেছি।

—কিন্তু আমার তো শোধ নেওয়া হয়নি।

—কী শোধ নেবে বলো?

—কী জানি ভেবেই তো পাচ্ছি না।

—হায় গো, কী কষ্ট!

—খুব কষ্ট। দুপুরে কলেজে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখন তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি।

—কিরকম দুঃস্বপ্ন?

— ভীষণ খারাপ। বলে মন্দার চুপ ক'রে স্বপ্নের দৃশ্যটা মনে মনে দেখে। ডবল-ডেকারে পা-দানিতে অঞ্জলি, কোলে বাচ্চা, চারদিকে আক্রমণকারী মানুষ। কিছুতেই অঞ্জলির কাছে পৌঁছোতে পারছে না মন্দার।

—বলবে না? অঞ্জলি বলে।

মন্দার শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—অঞ্জলি, আমি হয়ত শ্রাবণে বিয়ে করব। পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে। তাতে কি তুমি দুঃখ পাবে?

—পাবো। তবে এটা আশা করছিলাম বলে সয়ে নেওয়া যাবে।

—শোন, আমি তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসবো, এরকম বসে থাকবো একটু দূরে, কথা বলবো। কিছু মনে করবে না তো?

—মনে করবো! কী যে বলো! তুমি আসবে ভাবতেই কী ভীষণ ভালো লাগছে!

—আসবো। কী তোমাকে বলতে চাই তা যতদিন না মনে পড়ছে ততদিন আসতেই হবে।

—এসো যখন খুশি।

—আসবো। অঞ্জলি, ততদিন তুমি ভাল থেকো, সাবধানে থেকো।

অঞ্জলি চুপ করে থাকে।

—চারদিকে বিশ্রী মানুষ-জন, তারা তোমাকে ঠেলবে, ধাক্কাবে, ফেলে দেবে, চারদিকে বিপদ।

—কী বলছো?

—খুব বিপদ তোমার। এই বাচ্চাটাকে নিয়ে কি তুমি বাস থেকে নামতে পারবে। আমি যে কিছুতেই তোমার কাছে যেতে পারছি না।

—তুমি কী বলছো?

—সেইটাই তো বুঝতে পারছি না অঞ্জলি! একটু সময় লাগবে। তোমার বাচ্চাটা কি ছেলে না মেয়ে?

—ছেলে!

অকারণ প্রশ্ন। মন্দারের জেনে কোন লাভ নেই। সে বসে রইল। মনে পড়ছে না। কতদিনে মনে পড়বে তার কোন ঠিক নেই।

যতদিন না পড়ে ততদিন বসে থাকা ছাড়া, অপেক্ষা করা ছাড়া, পরস্পরের মুখের দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে থাকা ছাড়া মানুষের আর কী করার আছে?

বাবা

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই দিদিমার কাছে শুনলাম, বহুকাল পর আমাদের বাবা এসেছে। শুনেই হুড়মুড় করে আমরা দুই ভাই, বোন উঠে পড়লাম। তারপর ছুট লাগালাম বাইরে।

আমাদের বাস গঞ্জে, মামাবাড়িতে। বাড়িটা একটু খোলামেলা, গাছপালা আছে। বারবাড়িতে একটা কদমগাছের তলা দাদামশাই গোল করে বাঁধিয়ে নিয়েছেন। বিকেলে এখানে দাদামশাইয়ের আড্ডা বসে।

সেই বাঁধানো জায়গাটায় গাছের ছায়ায় মোটা কালো মতো একটা লোক বসে আছে। তার ঝুঁড়ো গোঁফ, মাঝখানে সিঁথি, ছোট কুতকুতে চোখ। পরনে মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি, ধুতি, পায়ে বিশাল জুতো। পাশে স্যুটকেশ, শতরঞ্চিতে বাঁধা বিছানা আর একটা ছাতা। এই শীতকালেও লোকটা বেশ ঘেমেছে। মাকে জন্মে ঘোমটা মাথায় দিতে দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম, মা মাথায় ঘোমটা টেনে লোকটাকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে।

আমার বোন রেবা নাক কুঁচকে বলল, এইটে বাবা নাকি?

আমারও এই বাবা তেমন পছন্দ হয়নি। অবাক হয়ে বাবা দেখতে দেখতে বললাম, তুই ঠিক বাবার চেহারা পেয়েছিস।

অন্য সময় হলে রেবা আমাকে চিমটি কাটত বা কিল মারত। কিন্তু এখন বাবার এই চেহারা দেখে সে অবাক। বলল, কিন্তু ফটোতে কক্ষনো এ রকম চেহারা নয়। দূর! এ বাবা হতেই পারে না।

বাবার আগের চেহারা আমিও দেখিনি। পিঠোপিঠি আমরা দুই ভাইবোন জন্মানোর কিছু পরেই মামাবাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে বাবা ইগতপুরীতে চলে যায়। গত বারো তেরো বছরে আর দেশে ফেরেনি। কী নিয়ে রাগারাগি তা আমরা খুব ভাল জানি না। তবে শুনেছি বিয়ের পর নাকি বাবা দাদামশাইয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল তামাকের ব্যবসা করবে বলে। ব্যবসা ফেল মারে। মামারা তখন এক জোট হয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে। বাবা তখন বেকার, তার

ওপর সদ্য ব্যবসায় মার খেয়ে পাগল-পাগল। আবার সে ঝগড়ায় নাকি মাও ছিল বাবার বিরুদ্ধে। বাবা একবস্ত্রে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। জ্ঞান হয়ে অবধি আমরা শুনে আসছি, আমাদের বাবা সাধু হয়ে চলে গেছে। কেউ বলত, মরে গেছে। যাহোক, বছর পাঁচেক বাদে মহারাষ্ট্রের ইগতপুরী থেকে একখানা পোস্টকার্ড আসে মায়ের নামে 'আমি বাঁচিয়া আছি। চিন্তা করিও না। ইতি বসন্ত চট্টোরাজ।'

ঠিক বটে বাবার যে সব ফটো আছে তাতে বাবার এ চেহারা নয়। বরং ছিপছিপে ফিটফাট বাবু চেহারা। খুব সুন্দর না হলেও, চলে। কিন্তু এই বাবাকে বন্ধুদের দেখাবো কী করে?

রেবা দৃঢ়স্বরে বলল, বাবা নয়। অন্য লোক। সেজে এসেছে।

আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, বাবাই। দেখছিস না তোর মতো চেহারা। কালো কুতকুতে চোখ।

উহুঁ। সেজে এসেছে। কিছুতেই বাবা নয়।

দরজার আড়াল থেকে আমরা অনেকক্ষণ দৃশ্যটা দেখলাম। জামাই এসেছে বলে তিন মামা পুকুরে জাল ফেলেছে, দুই মামাকে নিয়ে স্বয়ং দাদামশাই গেছেন বাজারে। দিদিমা ঝিকে দিয়ে অ্যাই মস্ত একতাল ময়দা আন্‌ডোলে ঘি ময়ান দিয়ে ঠাসাচ্ছেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। বড় মামিমা ছেলে হতে বাপের বাড়ি গেছে। মেজো আর সেজো মামি ঘরদোর সাজাচ্ছে। দুই মামি আয়না কাড়াকাড়ি করে নিজেরা সাজছে। শুধু আমরা দুই ভাই-বোন বাসি মুখে বাবা দেখতে এসেছি।

হঠাৎ দেখলাম বাবা চনমন করে চারদিক চাইছে। তারপর মাকে জিজ্ঞেস করল,"আরে লেড়কা-লেড়কি দুটো কোথায়? ও-দুটোকে নিয়ে আসো।"

কথায় একেবারে পশ্চিমা টান। আমাদের মন আরো খারাপ হয়ে গেল।

মা পাখা রেখে যেই ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে অমনি রেবা হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে অস্ফুট গলায় বলল, বাবা নয়। বাবা নয়। বলতে বলতে এক দৌড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর পাছদুয়ার দিয়ে বেরিয়ে কোথায় যে চলে গেল কাঁদতে কাঁদতে, একটা বেলা তাকে খুঁজেই পাওয়া গেল না।

আমি রেবার মত বোকা নই। খুঁতখুঁতেও নই। আসলে রেবা

ভারী সুন্দর। টকটকে ফর্সা রঙ, টানা টানা চোখ। সবাই সুন্দরী বলে ওর মাথাটাই বিগড়ে দিয়েছে। অহঙ্কারও খুব। বাবার চেহারাটা আর হাবভাব ওর অহঙ্কারে ঘা দিয়েছে।

মা এসে আমাকেই ধরে নিয়ে গেল বাবার কাছে। বলল, এই তোমার ছেলে। মেয়েটা এই সাত সকালে কোথায় পাড়া বেড়াতে গেছে বোধ হয়। বাবা এসেছে, এ খবরটা সবাইকে দিতে হবে তো।

বাবা কুতকুতে চোখ যতটা বড় করা যায় তত বড় করে আমাকে হাঁ হয়ে দেখল খানিক। তারপর চুকচুক করে খুব হাসতে লাগল। বলল, বাপরে! এইসন বড়া হয়ে গেছে নাকি বাচ্চাগুলান!

মা মৃদু হেসে বলে, তা হবে না! বারোটি বছর পার করে তো ফিরলে।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে ভালমানুষি গলায় বলে, হাঁ, হাঁ, ও বাত তো ঠিক। কিন্তু বাপরে! কত বড়!

আমরা লোকের কাছে শুনেছি, বাবা লোকটা খুব সরল, পরিশ্রমী কিন্তু বুদ্ধি ততটা ধারালো নয়। তাছাড়া ছেলেবেলায় তার বাপ-মা মরে যাওয়ায় এবং তিন কুলে কেউ না থাকায় খুব কষ্টে মানুষ হয়েছে। তাই লোকটার জন্য আমার একটু মায়া ছিল। মামাবাড়িতে আমরা যদিও যথেষ্ট আদরে মানুষ, তবু আমাদের বিশ্বাস ছিল বাবা এলে আমরা এর চেয়ে দশ গুণ সুখে থাকব।

তা এই নিতান্ত সাদামাটা লোকটাকে দেখে আমার স্বপ্নগুলো সব ভেঙেচুরে পড়ে গেল। রূপকথার বাবা তো এ নয়, এ নিতান্তই গণেশখুড়ো কি রামজ্যাঠা কিংবা হারাধন দাদুর মতো আর একজন। আলাদা কিছু নয়। ঘামে বাবার পাঞ্জাবিটা ভেজা-ভেজা, গাড়ির নোংরা লেগেছে তাতে। গালে দুদিনের দাড়ি খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে। বাবা আমাকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখল।

মা বলল, প্রণাম কর।

বাবা অমনি তাঁতকে পা দুটো টেনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বলল, না, না, থাক থাক। পরে হবে, পরে হবে।

আমারও প্রণাম করার তেমন রুচি হচ্ছিল না। বাঁচলাম।

বাবা আবার চুক চুক করে হেসে বলল, লম্বা খুব হইছে। কিন্তু তাকতওলা হয় নাই। কী খোকা, এত রোগা কেন? ভরপেট খাও না?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, খাই তো।

খাও? বাঃ বাঃ। বাবা খুব খুশি।

বুঝতে পারছিলাম বাবা আমাকে লজ্জা পাচ্ছে। অস্বস্তি বোধ করছে। যেন বা বিশ্বাস করতে পারছে না যে আমি তার ছেলে। আসলে রেবার মতো না হলেও আমি বেশ ফর্সা, লম্বা, ছিপছিপে। দিদিমা আমাকে যে গৌরগোপাল নাম দিয়েছে তা এমনি তো নয়, সুন্দর বলেই। আমরা দুই ভাইবোনই মামাবাড়ি ধাঁচের চেহারা পেয়েছি। এই ফুটফুটে চেহারা দেখে বাবা বোধ হয় আরও ঘাবড়ে গেছে।

এ সময়ে মামিরা সেজেগুজে এসে বাবাকে পাকড়াও করে ভিতর-বাড়িতে নিয়ে গেল। বাবা সব ব্যাপারেই খুব হাসছে। দাড়িটাড়ি কামিয়ে স্নান করে আসার পরও বাবার চেহারা তেমন কিছু খোলতাই হল না। তবে দেখলাম, লোকটা মোটা হলেও ভুঁড়িওলা মোটা নয়। রীতিমত পালোয়ানী স্বাস্থ্য। আমি টারজান ইত্যাদি বীরদের পরম ভক্ত। বাবার সেই টারজানি চেহারা দেখে দুঃখটা একটু কমলো। কিন্তু রেবা তো টারজান চায় না। চাইলেও সে ফর্সা টারজান চায়, সুন্দর টারজান চায়।

দুপুরে যখন সবাই বিশাল ভোজে বসেছি তখন বাড়ির বুড়ো চাকর খুঁজে খুঁজে কোত্থেকে যেন রেবাকে ধরে নিয়ে এল। তার মুখচোখ লাল, গম্ভীর, চোখের কোলে অনেক কান্নার চিহ্ন। কারো দিকে তাকাচ্ছে না।

দাদামশাই হাঃ হাঃ করে হেসে বাবাকে বললেন, কী হে বসন্ত, মেয়েকে চিনতে পারো?

বাবা রেবার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ, সশ্রদ্ধ। গরাস গিলে আবার খুব হাসল। তারপর উদ্বেগের গলায় বলল, খুঁকিকে কেউ মারল নাকি? অাঁ!

রাত জেগে গাড়িতে এসেছে বলে খাওয়ার পরই বাবাকে আলাদা করে কোণের ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল। তার প্রচণ্ড নাক ডাকতে লাগল।

আমরা দুই ভাই-বোন পরামর্শ করতে বসলাম। এই লোকটাকে নিয়ে এখন আমরা কী করব? লোকটা সুন্দর নয়, সেটা না হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু ঐ উজবুকের মতো কথাবার্তা! ঐ হিন্দি-মেশানো বুলি! ঐ বোকা-হাবা গোবেচারা ভাব। চোখে ঐ চোর-চোর অপরাধী-অপরাধী চাউনি। আমাদের চাকর লক্ষ্মণদাও যে ওর চেয়ে চালাক-চতুর।

রেবা মাথা নেড়ে বলল, আমি কিছুতেই বাবা বলে ডাকতে পারব না।

তবে কী বলে ডাকবি? বসন্তবাবু?

ইঃ, বাবু বলতে গেছি কিনা! একটুও বাবুর মতো চেহারা নয়। দেখলেই মনে হয়, কারো বাড়ির চাকর।

এ ব্যাপারে শুধু আমরা দুই ভাইবোনই নয়, মামা-মামিরাও এক-মত। এমন কি দুই মামি পর্যন্ত হাসাহাসি করছে আড়ালে। জামাই বোকা, জামাই গেঁয়ো, জামাই কালো। সেসব শুনে আমাদের আরো মন খারাপ হয়ে গেল।

শুধু মার মুখচোখেই একটা চাপা আনন্দের আভা। চোখ দুটো উজ্জ্বল, ফর্সা মুখে রক্ত ফেটে পড়ছে যেন।

বিকেলে আমাদের মালি ক্ষেত কোপাচ্ছিল। বাবা গিয়ে মালির হাত থেকে কোদাল নিয়ে এক চোপাটে অনেকটা জায়গা কুপিয়ে মস্ত মস্ত মাটির চাংড়া তুলে ফেলল। আমরা বাবার কাণ্ড দেখছিলাম দাঁড়িয়ে। বাবা লাজুক হেসে আমাকে বলল, মাটি কোপালে একসার-সাইজ হয়। ভুখ লাগে। তুমি মাটি কোপাও না?

আমি মাথা নেড়ে বলি, না।

কোপালে ভাল হয়। কসরত না করলে কি শরীরে তাগদ হয়?

দিন দুইয়ের মধ্যে বাবার সঙ্গে আমার একটু একটু ভাব হয়ে গেল। রেবা অবশ্য বাবার কাছে একদমই ঘেঁসত না। কিন্তু আমাকে ডেকে নিয়ে আড়ালে জিজ্ঞেস করত, লোকটা কী বলছে রে? আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করে? বাস্তবিকই বাবা রেবার কথা জিজ্ঞেস করত। বলত, রেবা আমার কাছে আসে না কেন বলো তো! আমি কালো বলে নাকি? হাঃ হাঃ মেয়েটা খুব সুন্দর হইছে তো।

আমি সে কথা রেবাকে বললে রেবা একটু যেন খুশি হত।

মা আমাদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল ঠিকই। কিন্তু মুখে কিছু বলত না। তৃতীয় দিনে মা রেবার হাতে এক গ্লাস দুধ দিয়ে বলল, তোর বাবাকে দিয়ে আয়।

ভয়ে মায়ের মুখের ওপর 'না' বলতে পারল না রেবা। আস্তে আস্তে গিয়ে বাবার সামনে গ্লাসটা রেখে 'এই যে আপনার দুধ' বলেই দৌড়ে পালিয়ে এল।

বাবার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল করে তোলার জন্য মা আমাদের

কাছে তার অনেক গুণের কথা বলত। আসলে বসন্ত চট্টোরাজ খুব সৎ মানুষ। দাদামশাইয়ের কাছ থেকে যে পঁচিশ হাজার টাকা উনি নিয়েছিলেন তা শোধ দেওয়ার পর উনি এ-বাড়িতে পা দিয়েছেন। উনি মহারাষ্ট্রে গিয়ে প্রথমে কুলিগিরি করেন, ডকে কাজ করেন। অ-মানুষিক কষ্টে ধীরে ধীরে নিজের একটা ব্যবসা দাঁড় করিয়েছেন। ইত্যাদি।

আমি মাকে জিগ্যেস করলাম, আমরা কি বাবার সঙ্গে ইগতপুরী চলে যাব?

মা বলল, যেতে তো হবেই। তবে উনি এবারে আমাদের নেবেন না। কয়েক মাস পরে এসে নিয়ে যাবেন। ওখানে আমাদের বাড়িটা তৈরি হচ্ছে। সেটা শেষ হলেই যাবো।

রেবা জেদ করে বলল, আমি যাবো না। আমার এ জায়গাই ভাল।

মা বড় বড় চোখে রেবার দিকে চেয়ে বলল, এটা তোমাদের আসল বাড়ি নয়। বড় হলে বুঝবে মামাবাড়িতে চিরকাল থাকা যায় না। থাকা ভাল না। মামার বাড়িতে মানুষ হওয়াটা অমর্যাদার।

পরদিনও রেবা বাবাকে গিয়ে এই যে আপনার দুধ বলে দুধ দিয়ে এল। কিন্তু দৌড়ে পালিয়ে এল না। আস্তে আস্তে এল।

আমার সঙ্গে আরো ভাব করার জন্যই বোধ হয় বাবা একদিন আমাকে বলল, খোকা, তোমার বইপত্র সব নিয়ে এসো তো দেখি, কেমন পড়িলিখি করছ।

অগত্যা আমি বইপত্র নিয়ে তার কাছে গেলাম। বাবা অবশ্য পড়াল না। কাছে বসিয়ে আমার পিঠে অনেক হাত বুলিয়ে দিল আর মহারাষ্ট্রে কী কী পাওয়া যায় তার গল্প করতে লাগল।

আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। বললাম, রেবাকে বই নিয়ে আসতে বলি?

বাবা আঁতকে উঠে বলল, উ বাবা! উকে আমি খুব সমঝে চলি। উ;তো আমাকে জাম্বুবান বলে ভাবে কিনা। ভাবে, বুঝি জঙ্গল থেকে আসছি। এই বলে খুব হাঃ হাঃ করে হাসল বাবা।

রেবা না পারলেও আমি কিন্তু আস্তে আস্তে বাবাকে বাবা বলে মেনে নিতে পারছিলাম। লোকটা দারুণ ভালো, খুব সরল, প্রাণভরা মায়াদয়া আর ভালবাসা। চেহারাটা টারজানের মতো হলেও লোকটা পিঁপড়েকেও মারতে জানে না।

দিন দশেক কেটে যাওয়ার পর একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় আমরা ভাইবোনে হঠাৎ দেখলাম, আমাদের বাড়ির সামনে অনেক লোক জড়ো হয়েছে আর ভিতরে ভীষণ চেঁচামেচি হচ্ছে।

আমরা দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে ঢুকে দেখি, সামনের ঘরে বাবা একটা লোহার চেয়ারে মুখ নিচু করে বসা, তাকে ঘিরে আমার পাঁচ মামা রুদ্রমূর্তিতে দাঁড়িয়ে। ভিতরের দরজায় পাথরের মতো মা। পদার আড়ালে মাসি আর মামিদের মুখ উঁকি মারছে।

বড় মামা গর্জন করছে, জোচ্চোর! জোচ্চোর! চরিত্রহীন। কেন আগে বলোনি যে, তুমি সেখানে আর একটা বিয়ে করেছো? আগে জানা থাকলে এ-বাড়িতে তোমাকে ঢুকতে দিতাম ভেবেছো? বদমাশ কোথাকার, এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বিদেয় হও।

মেজো মামা বরাবরই একটু গুণ্ডা প্রকৃতির। এতক্ষণ ফুঁসছিল, হঠাৎ আমাদের দেখে তার রাগ ফেটে পড়ল, এই দুটো ফুলের মতো শিশু, এদের কথা তোমার মনে পড়ল না লুম্পেন কোথাকার? অ্যাঃ! এদের কী হবে? বলতে বলতে মেজো মামা হঠাৎ গিয়ে বাবার চুল ধরে মাথাটা খুব জোরে নাড়া দিয়ে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় কষাল গালে।

আমরা হতভম্ব। বাকরহিত। রেবা আমাকে ধরে কাঁপতে লাগল।

ওদিকে সব মামাই তখন বাবাকে গিয়ে ধরেছে। ধাক্কা দিচ্ছে, টানছে, ঠেলছে। একটু বাদে টিনের চেয়ারটা উল্টে পড়ে গেল।

দাদামশাই কোথায় ছিলেন জানি না। হঠাৎ তিনি গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকে ছেলেদের বললেন, বসন্তকে ছেড়ে দাও। এ-বাড়ির একটা সম্মান আছে মনে রেখো। ওকে চলে যেতে দাও।

মামারা তবু গজরায়। কিন্তু সরেও আসে। বাবা মেঝে থেকে আস্তে আস্তে ওঠে। পাঞ্জাবিটা একটু ছিঁড়ে গেছে ঘাড়ের কাছে, চুলগুলো দাঁড়িয়ে আছে। মুখে একটা ভ্যাবলা-ক্যাবলা ভাব, ভীতু চাউনি। বাবা অবশ্য কারো দিকেই তাকাল না। ঘরের দেয়ালের সঙ্গে তার স্যুটকেস আর বিছানা দাঁড় করানোই ছিল। বোধ হয় বিপদ বুঝে পালাচ্ছিলই বাবা। এখন উঠে গিয়ে সেই স্যুটকেস এক হাতে আর অন্য বগলে বিছানাটা তুলে নিল।

বেরোবার মুখে একবার শুধু আমাদের দিকে চাইল বাবা। আমার

দিকে একটুক্ষণ, রেবার দিকে তার চেয়ে কিছু বেশি সময়। একবারও বুঝি ঠোঁট নড়ল। কিন্তু কোন কথা বেরোলো না। তার বদলে তার দুই চোখে একফোঁটা করে জল গড়িয়ে পড়ল।

পাড়া-প্রতিবেশীর ছিছিক্কার, মামাদের তর্জন-গর্জন এবং মায়ের পাথরের মতো শীতল দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বসন্ত চট্টোরাজ ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। আমাদের বাড়ি থেকে। আমাদের জীবন থেকে চিরকালের মতো বোধ হয়। তখনো তার মাথার চুল খাড়া হয়ে আছে, পাঞ্জাবির ঘাড়টা ছেঁড়া। নাগরার শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল রাস্তায়।

সেদিন রাত্রে আমরা ভাই-বোনে শুয়েছি বিছানার দুধারে। মাঝখানে মায়ের বালিশ। কিন্তু মা তখনো শুতে আসেনি। কখন আসবে তা বলা মুশকিল। মা কথা বলছে না, সারাদিন নিস্তব্ধ আর স্থির হয়ে বসে আছে ঠাকুরঘরে।

আমাদের আর পাঁচ জনের সামনে মুখ দেখানোর উপায় নেই। কী লজ্জা! বাবা শুধু বিয়েই করেনি, তার তিন-তিনটে ছেলে আছে। ইগতপুরীতে। নির্মলা দেবীর নামে একটা খামে চিঠি লিখেছিল বাবা। সেটা ডাকে দিতে গিয়ে ছোটমামার সন্দেহ হয়। হিন্দিতে লেখা চিঠিটা খুলে মামা ডাকঘরে এক হিন্দি জানা লোককে দিয়ে পড়ায়। তখনই সব ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু এখন আমরা লোককে মুখ দেখাই কী করে? রাগে আমি ভিতরে ভিতরে জ্বলে যাচ্ছিলাম। বসন্ত চট্টোরাজ তার ছাতাটা ফেলে গেছে। আমি ঠিক করে রেখেছি, ছাতাটা কাল ভেঙেচুরে পুকুরে বিসর্জন দেবো।

রেবা ডাকল, দাদা!

কী?

সবাই লোকটাকে অমন করে মারল কেন রে?

আমি গর্জন করে উঠি, মারবে না? কত বড় সর্বনাশ করেছে আমাদের জানিস?

রেবা মৃদুস্বরে বলল, জানি। তারপর একটু চুপ করে থেকে রেবা আপনমনে একটা হিসেব করতে করতে বলল, তোকে নিয়ে লোকটার চারটে ছেলে, কিন্তু মেয়ে নেই। মেয়ে বলতে একমাত্র আমি। তাই না? লোকটা তাই আমাকে ভীষণ ভালবাসত। চলে যাওয়ার সময় কী বলল রে?

আমি অবাক হয়ে বলি, কী সব বলছিস ? চুপ কর।

রেবা অনেকক্ষণ চুপ করে মটকা মেরে পড়ে রইল। তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি ওর চুল টেনে বললাম, কী হয়েছে বলবি তো ?

রেবা কান্না জড়ানো গলায় হেঁচকি তুলে বলল, সবাই মিলে কেন অমন করে মারল বাবাকে ? কেন মারবে এরা ? কেন আমার বাবাকে সবাই মারবে ?

ছেলেটা কাঁদছে

গজপতি হাট বসিয়েছে তেজোময়ীর জমিতে। গেল হপ্তায় দুদিনই খুব জমেছিল। ভোরবেলা থেকে গরুর গাড়ি, রিক্সা, সাইকেল ভ্যানে চারদিক ছয়লাপ। জিনিস পড়তে পায়নি। সন্ধের আগেই হাট সাফ। তাও ছাউনিগুলো এখনো সব তৈরি হয়নি, জমি উঁচু করতে যে কাঁচা মাটি ফেলা হয়েছিল তা এখনো ভসভসে। তাতে হাজারো পায়ের ছাপ রোদে শুকিয়ে ঢেউ ঢেউ হয়ে আছে। দুপুরবেলা জনমনিষ্যি নেই। এক হাতে মাথায় ছাতা, অন্য হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে সাইকেল চালিয়ে নাড়াল থেকে ফেরার পথে গজপতি ফাঁকা হাটটার সামনে এসে নেমে পড়ল। তার মনটা ভাল নেই। লম্বা ছাউনি মোট চোদ্দখানা, ছোটো গোটা দশেক। খড়, বাঁশ আর কাঠের খুঁটির এই সব চালা পয়লা ঝড়েই উড়ে যাবে। গজপতির খুব ইচ্ছে, চালার মেঝেগুলো ইঁট দিয়ে বাঁধিয়ে দেয়। খরচের ভয় তেমন নেই। প্রথম ছ'মাসটা খাজনা না নিলেও তারপর থেকে হাটের আয় ভালই হবে। পুষিয়ে যাবে। কিন্তু মুশকিল হল, জমিটার একজন চার আনির হিস্যাদার আছে। সে যে কবে এসে উদয় হয়।

ঠেকা দেওয়ার কাঠিতে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে এই রোদে গজপতি জমিতে নেমে পড়ল। দুটো চালা এর মধ্যেই একটু হেলে পড়েছে। কয়েকটার চালের খড় টেনে নিয়ে গেছে কেউ। এসব অবশ্য হবেই। গজপতি ঘুরে ঘুরে পায়ের ছাপই দেখে। স্বর্গতা তেজোময়ীর এই হাটে মানুষ আসছে। মানুষ যেখানে আসে সেটাই তো তীর্থ।

রাজবাড়ির পিলখানায় বহুকাল আগে একসঙ্গে চোদ্দটা হাতি দেখেছিল গজপতি। শুঁড় দোলাচ্ছে, শরীর দোলাচ্ছে। একসঙ্গে চোদ্দ হাতি! কী যে সুন্দর, কী যে অবাক-করা দৃশ্য। ইচ্ছে ছিল নিজে একটা পিলখানা বানাবে, ঠিক ঐ রকম চোদ্দটা হাতি থাকবে তাতে। সারাদিন দুলবে আর দুলবে। ছেলেবেলায় মনের জমিতে কত আগাছা জন্মায়। বড় হয়ে আগাছা নিড়িয়ে বিষয়বুদ্ধির বীজ বুনে দিতে হয়। এই হাট বসানোর মধ্যে গজপতির বিষয়বুদ্ধিটাই সবাই দেখবে। তা দেখুক। রাজবাড়ির পিলখানা খালি করে

সেই স্বপ্নের হাতিরা চলে গেছে। তবু এখনো চোখ বুজলেই সেই চোদ্দ হাতির ধীর লয়ে নাচের দোল যেমন দেখতে পায় গজপতি, তেমনি এই হাটটাকেও সে দেখতে পেত। তার জমি-জিরেত নেই, পয়সাকড়ি নেই। বলতে কি একটা বয়েস পর্যন্ত সে তেজোময়ীর পোষা কুকুরটার মতোই ছিল। জামবনীতে নিজের পৈতৃক বাড়ির রাবণের সংসারে একটা রোগা বউ আর একটা বোকাসোকা ছেলে কষ্টে-সৃষ্টে বেঁচেছিল মাত্র। বিয়ের বছর দুইয়ের মধ্যেই তেজোময়ী বেঁচে থাকতে বউ ছেলের কাছে ফিরে যায়নি। বউ আসতে চায় না। বোকা ছেলেটাকে গাঁসুদ্ধ ছেলেপুলেরা খ্যাপায়। নষ্ট মেয়েমানুষ বলে তেজোময়ীর নিজেরও দুঃখ ছিল। অনুতাপ ছিল। সেই জ্বালা-পোড়ায় বুড়ো হওয়ার আগেই মরে গেল। মরার সময়েও ভারী সুন্দর দেখতে ছিল তেজোময়ী। আর তেজও কিছু কম ছিল না। সকলের নাকের ডগাতেই বিধবা হয়ে গজপতির সঙ্গে বাস করত। কেউ কিছু বলতে সাহস পায়নি। এমন কি ইস্কুলের হেডমিসট্রেস পদ থেকে তাকে সরানোর কথাও ওঠেনি কখনো।

তেজোময়ীর স্বপ্ন ছিল ঐ ইস্কুলটা। দিন-রাত তার ঐ ছিল ধ্যান-জ্ঞান। গজপতি তেজোময়ীর কাজে লাগত বটে, কিন্তু তার জীবনের কোনো অংশে সে ছিল না। গজপতি ভাবে, সে না হয়ে অন্য কেউ হলেও বোধহয় তেজোময়ীর চলে যেত। শুধু জ্যোৎস্না ফুটলে তেজো-ময়ী বারান্দার ইজিচেয়ারে বসত, সিঁড়িতে বসে বাঁশি বাজাত গজপতি। মাঝে মাঝে তখন সে তেজোময়ীর চোখে জল চিক্‌চিক্‌ করতে দেখেছে। এছাড়া আর কোনো দুর্বলতা ছিল না। নামের সঙ্গে স্বভাবের এমন ছিল মিল। আর গজপতির উল্টো। সেই চোদ্দটা হাতি গজপতির সাত জন্মেও হওয়ার নয়, তবু ভারী নামটা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তবে হাতি না হোক একটা হাট বসানোর স্বপ্ন বহুদিন হয় দেখছে গজপতি। মেলা লোক জড়ো হয়, বিকিকিনি করে, মেলামেশা হয়, হাটের এই চরিত্রটা বড় ভাল লাগে তার। হাটবাজারের মতো জিনিস নেই। কিন্তু এখন এই খাঁ খাঁ দুপুরে হাটের চালার নিচে বসে হাট বসানোর অর্থহীনতাই টের পায় গজপতি। মানুষ চলে যায়। তার পায়ের ছাপও চিরকাল থাকে না। তবে থাকে কী? দুবিঘে জমি, কিছু নগদ টাকা গজপতি পেলো তেজোময়ী মরার পর, তাই দিয়ে এই হাট। কিন্তু চার আনার হিস্যাদারটা যে কে তা বুঝে উঠতে পারছে না।

কাগজপত্রে তার নাম দেখা যাচ্ছে, যোগেন ঘোষ। থাকেন রাণীগঞ্জ। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। দু'খানা চিঠি দিয়েও জবাব মেলেনি। বেঁচে থাকতে তেজোময়ীর মুখ থেকেও নামটা কখনো ফসকায়নি। তাহলে লোকটা কে? এই চিন্তায় গজপতির চুল পাকতে লেগেছে, রাতে দুঃস্বপ্ন দেখছে, ভাল হজম হচ্ছে না।

হাট বসানো বড় সহজ কথা নয়। জমির দখল পেতে বিস্তর ঝামেলা যাচ্ছে। এখনো সত্যিকারের দখল পায়নি। হাট বসানোর অনুমতি আদায় করা, ঢোল সহরত করে লোককে জানান দেওয়া, ব্যাপারিদের ঠেলেঠুলে নিয়ে আসা, এই করতে গিয়ে গজপতির কণ্ঠমণি বেরিয়ে পড়েছে। তবু একটু খুঁত থেকে গেল। সে ঐ যোগেন ঘোষ, চার আনার হিস্যাদার। মনে মনে তাকে ছকে ফেলেছে গজপতি, দৈত্যের মত বিকট চেহারা। রোমশ। রেগে গেলে বিপুল দুই হাতে বুক চাপড়ায়। চোখের দৃষ্টি খুনীর মতো। হয়তো সত্যিকারের খুনীই। গজপতি কাল রাতেও স্বপ্ন দেখেছে, যোগেন ঘোষ এসে তার গলা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলছে, চার আনা মানে? পুরো ষোলো আনাই আমার। তুই তো তেজোময়ীর কেপ্ট ছিলি, তোর আবার হিস্যা কিসের? ভয়ের কথা হল, তেজোময়ীর পদবীও ছিল ঘোষ। যোগেনের সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক থেকে থাকলে কোর্ট-কাছারিতে অনেক দূর গড়াবে।

অন্যদিকেও খবর সুখের নয়। নাড়াল থেকে জামবনী কাছে হয়। সরাসরি জামবনীতে গিয়ে ডাকাবুকো ভাইপোদের পাল্লায় পড়তে সাহস হয়নি বলে নাড়ালে ঘাপটি মেরে বসে কাল থেকে বউ-ছেলের খোঁজ করছিল গজপতি। নাড়ালের হাবু নস্কর বন্ধু লোক। মুরুব্বিও বটে। তাকে ধরে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, ভাইপোরা খুব সেয়ানা হয়েছে। কাকার খবরও তারা রাখে। তবে ফাঁকা গাঁয়ে ঢুকলেই ঠ্যাং ভেঙে দেবে। বউকেও খবর পাঠিয়েছিল গজপতি। কিন্তু বউ হাবুকে বলেছে, সেই মানুষটার সঙ্গে এতকাল যখন ঘর করিনি তখন আর শেষ বয়সে করতে যাব কেন? এ বাড়িতে ঝিয়ের মতো খাটছি, তাই খাটবো। গজপতির বোকা ছেলেটা সে বাড়িতে গরু-টরু রাখে। সে নাকি ভারী বিয়ে-পাগলা। গাঁয়ের ছেলেরা তার পিছুতে লাগে অহরহ। ভাবলে কষ্ট হয়। বোকা ছেলেটার পিছুতে লাগে কেন সবাই? ছাতাটা মুড়ে একটা চালার নিচে বসে আছে গজপতি। বৈশাখের রোদে আদিগন্ত জ্বলছে। বড্ড খরা। তেজোময়ীর কোন ছেলেপুলে ছিল না। কথাটা ভাবতে

ভাবতে সে একটা ময়লা ন্যাতার মতো রুমাল বের করে মুখের ঘাম আর ধুলো মুছল। গলাটা শুকিয়ে আছে তেষ্টায়। হাটে জলের বন্দোবস্ত নেই। করতে হবে। নইলে এই মাঠের হাট অকালে পাততাড়ি গোটাবে। গেল হপ্তায় দুদিনই হাটের লোক আশেপাশের পুকুর বা টিউবয়েলে জল খেতে গিয়ে পড়শীদের নিন্দ আর গালমন্দ খেয়েছে।

হবে, সবই হবে। মস্ত ইঁদারা বা পুকুর, টিপকল। মাঠটা ছেয়ে যাবে দোচালায়। এত বড় হাট কেউ দেখেনি। পূর্বধারে একটা গো-হাটা করারও ইচ্ছে আছে গজপতির। শিবরাত্রিতে মেলা বসাবে! কে জানে, তেজোময়ী খুব শিবরাত্রি করত। নিচু চালা থেকে একটা গরু খড় টেনে খাচ্ছিল। সেটাকে তাড়িয়ে গজপতি ফের ছাতা মাথায় সাইকেলে চাপল।

বাড়িটাও তেজোময়ীর। উইল অনুসারে এখন গজপতির। তবে সর্বত্রই ঐ এক অদেখা চার আনার হিস্যাদার! বাড়িতে দুটো মাত্র ঘর। একটু বারান্দা। ভিতরে একটু উঠোন। উঠোনে পাতকুয়া। এর চার আনা ভাগাভাগি কী করে যে হবে তা মাথায় আসে না গজ-পতির। আর ভাগাভাগিই যে হবে তার কোনো ঠিক নেই। দৈত্য যোগেন ঘোষ এসে যদি তাকে ঘাড় ধরে ভিটে-ছাড়া করে তাহলেও তো কেউ গজপতির পক্ষ নেবে না। তেজোময়ীর জারকে এই অঞ্চলের লোক ভাল চোখে দেখে না তো। তারা ঠিক যোগেনের পক্ষ নেবে।

গজপতি পাতকোর ঠাণ্ডা জলে স্নান করে ভাত রেঁধে খেল। একটু গড়িয়ে নিল। সন্ধেবেলা মস্ত চাঁদ উঠলে পর সিঁড়িতে বসে বাঁশি ধরল গজপতি। বারান্দার ইজিচেয়ারে তেজোময়ীও এসে বসল। চোখ বুজে বাঁশির মধ্যে বুকের সবটুকু বাতাস উজাড় করে দিতে দিতে স্পষ্টই টের পায় সে তেজোময়ীকে। এত লোক থাকতে ঐ সুন্দর মেয়েটা যে কেন গজপতিকেই তুলে এনেছিল তা কখনো জেনে নেওয়া হয়নি। সত্যি বটে, বয়সকালে গজপতির চেহারাটা ছিল কেষ্টঠাকুরের মতো। মাজা রঙ। ঢুলু ঢুলু চোখ। ঢল-ঢলে মুখ। আর ছিল বাঁশি। কিন্তু শুধু এইটুকুতেই ভুলবার মানুষ তো তেজোময়ী ছিল না। তবে? জ্যোৎস্নাটা বড় ধাঁ ধাঁ করছে। গুলিয়ে যাচ্ছে সব কিছু। একটা বয়সের পর জ্যোৎস্নাটাও ভাল লাগে না বোধহয়। কিছুই তো আর থেমে নেই। সব পালটে যাচ্ছে। গজপতির কেষ্টঠাকুরের মত চেহারাটা

এখন শুকিয়ে হতুকি। বাঁশির দমেও আজকাল টানাটানি। তেজোময়ী নেই, খামোকা চাঁদটা জ্যোৎস্নার কেরদানি দেখাচ্ছে। ভারী ছটফট করছে মনটা। তার বোকা ছেলেটাকে কারা ঢিল মারে?

একটা রিক্সা এসে থেমে আছে সড়কে। এতক্ষণ লক্ষ করেনি গজপতি। একটা মোটা মতো লোক নেমে পয়সা দিচ্ছে এতক্ষণে। গজপতি চেয়ে রইল।

লোকটা একটা বাক্স হাতে সোজা সামনে এসে বলল, বেশ বাজান তো মশাই। শুনতে ইচ্ছে করে।

গজপতি জ্যোৎস্নায় লোকটাকে ঠাহর করতে একদৃষ্টে চেয়েছিল।

লোকটা বলল, চিনবেন না। রাণীগঞ্জ থেকে আসছি চিঠি পেয়ে। আমার নামই যোগেন।

যেমন চমকাবার কথা তেমন চমকাল না গজপতি। বোধহয় যোগেন যে একদিন আসবেই তা বুঝতে পেরে মনটা ভিতরে ভিতরে তৈরি ছিল। গজপতি ঠক করে উঠে পড়ে বলল, রাতে এখানেই খাবেন তো। ভাত চাপাই গে।

যোগেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আর খাওয়া। তা চাপাবেন' খন। এই বুঝি বাড়ি? গজপতি বেশি কথায় গেল না। সত্যি বটে, যোগেনের চেহারাটা দত্যির মতো না হলেও দশাসই। তবে টপ করে গলা টিপে ধরার লোকও নয়। বয়স গজপতির কাছাকাছি, দু চার বছর কম। লণ্ঠন নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখায় গজপতি।

ক' কাঠা জমি?

মোট তিন।

বেচলে কত পাওয়া যাবে?

হাজার দশ পনেরো।

ধুস। তার সিকি-ভাগ আর কত হবে?

রাত্রে আলুর দম রাঁধল গজপতি। বেশ হল সেটা খেতে। যোগেন প্রথম দফা ভাত শেষ করে আরো দু হাতা নিয়ে বলল, উনি ছিলেন আমার মা।

তেজোময়ী? গজপতি হাঁ।

সৎ মা। বাবার দ্বিতীয় পক্ষ।

তবে যে শুনি, তেজোময়ীর স্বামী অল্প বয়সে মারা যায়।

পঁয়ষট্টি আর বয়স কী? মরার বয়েস তো নয়।

তাহলে তেজোময়ীর সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা তো বেশ ঘনিষ্ঠই বলতে হবে।

ঘনিষ্ঠ নয়? মা বলে কথা। বাপের বউ। এক মাস অশৌচ পাললাম কি এমনি এমনি? না পেলে উপায় কী বেঁচে থাকতে সম্পর্ক ছিল না মায়ের চরিত্রদোষের জন্য। তা বলে তো আর সমাজ ছাড়বে না! আপনারও শুনেছি বউ-বাচ্চা আছে!

গজপতি চুপ করে থাকে। যোগেন আর একবার আলুর দম চেয়ে নেয়। বলে, আমি অবশ্য মায়ের দোষ দেখি না! কাঁচা বয়সের বিধবা। অমন হতেই পারে। আপনি বাঁশিটাও বেশ ভালই বাজান। গজপতি লজ্জা পায়। ভাত নাড়াচাড়া করে।

পরদিন সকালে যোগেনকে রডে বসিয়ে সাইকেল মেরে হাটে নিয়ে এল গজপতি।

এই সেই হাট, যার কথা বলছিলাম।

যোগেন খুব আলগোছে দেখছে। তেমন আগ্রহ প্রকাশ করছে না। শুধু বলল, নতুন, বসিয়েছেন বুঝি? চলছে কেমন?

খুব চলবে।

ভাল। চললেই হল।

এর নাম দিয়েছি তেজোময়ীর হাট, নামটা ভাল না?

মায়ের নামে হাট তার আর ভালমন্দ কী।

হঠাৎ গজপতি যোগেনের হাতটা চেপে ধরে বলে, হাটটা যখন হয়েছে তখন থাক। তুলে দেবেন না। যোগেন তার ঘন ভ্রূ তুলল, আমি কে? মোটে তো চার আনার হিস্যা।

রাণীগঞ্জে আপনি কী করেন?

অনেক কারবার ছিল মশাই। সব তুলে দিয়েছি। এখন একটু কয়লার বিজনেস টিমটিম করে চলছে। লাখোপতি সব ঠিকাদার চারদিকে, হাজার হাজার টাকা ঘুস ফেলছে। আমি কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পাই।

তাহলে এসে এখানেই বরং জেঁকে বসুন।

আর আপনি?

আমার একটা কাজ আছে।

কী কাজ?

একটা ন্যালাখ্যাপা ছেলে আছে আমার। কাল খবর পেয়েছি

ছেলেটার পেছনে নাকি গাঁয়ের ছেলেরা খুব লাগে। ঢিল টিল মারে। সেই থেকে মনটা খুব বিগড়ে আছে। ন্যালাখ্যাপা ছেলেটাকে সবাই ঢিল মারবে কেন বলুন।

ঠিক কথাই তো।

তাই ভাবছি! গিয়ে ছেলেগুলোকে খুব কড়কে দেবো।

তাই তো উচিত।

আর নিজের ছেলেটাকেও শেখাবো, অন্যে ঢিল মারলে কি করে উল্‌টে ঢিল মারতে হয়।

যোগেন সরল হাসি হেসে বলে, সেও তো উচিত কথাই।

গজপতি বলে, আর এই সব করতে করতেই বাকি জীবনটা চলে যাবে। কী বলেন?

খুব যাবে, খুব যাবে।

যাই তাহলে?

পিলখানার সেই চোদ্দটা হাতি স্বপ্নে মিলিয়ে গেছে কবে। তেজোময়ী নেই, যোগেন ঘোষও এসে গেল। বাঁশির দম ফুরিয়েছে। তবে আর কী? গজপতি সাইকেলে উঠে পড়ে। জামবনী অনেক দূর। সাইকেলের চাকায় তেমন হাওয়া নেই। মোড়ের দোকানে হাওয়া ভরে নেবে। ন্যালাখ্যাপা ছেলেটাকে বড় ঢিল মারছে ছেলেরা। গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছেলেটা হয়তো "বাবা বাবা" বলে কাঁদছে।

ইচ্ছে

দেশলাইয়ের কাঠির অর্ধেক ভেঙে দাঁত খুঁচিয়েছিল কখন। বিড়ি ধরাতে গিয়ে সাঁটুলাল দেখে খোলের মধ্যে সেই শিবরাত্রির সলতে আধ-খানা বারুদমুখো কাঠি দেমাক দেখিয়ে পড়ে আছে।

আজ চৈত্রের হাওয়া ছেড়েছে খুব। কাল বৃষ্টি গেছে ক' ফোঁটা, কিন্তু আজই তেজালো রোদ আর খড়নাড়ার মতো শুকনো হাওয়া দিচ্ছে দেখ। হাওয়ার থাবায় এক ঝটকায় কাঠির মিনমিনে আগুন নিবে যাবে। যদি তাই যায় তো আরো চার পো পথ বিন-বিড়িতে হাঁটো। তারপর হাজারির দোকানের আগুনে-দড়িতে বিড়ি ধরিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু অতক্ষণ বিড়ি ছাড়া হাঁটা যায়! মুখে থুথু আসবে, বুক আঁকুপাঁকু করবে, কী নেই-কী নেই মনে হবে।

সাঁটুলাল দেশলাইয়ের বাক্সটা নাড়ে। ভিতরে টুকাটুক শব্দ করে আধখানা কাঠি দেমাকভরে নড়ে চড়ে। কাঠিটার মতলব বুঝতে পারে না সাঁটু। শালা কি বিড়ি ধরানোর ঠিক মুখে নিবে গিয়ে তাকে জব্দ করবে?

তার জীবনে পাপের অভাব নেই। ফর্দ করতে গেলে শেষ হওয়ার নয়। বেশি কথা কি, এই দেশলাইটাই তো গত পরশু বাবুদের উঠোনে পড়ে থাকতে দেখে হাতিয়ে নেয়। ঝি উনুন ধরাতে এসে ফেলে গিয়েছিল ভুলে। পরে এসে দেশলাই খুঁজে না পেয়ে বাপান্ত করছিল। তা সে সাঁটুর উদ্দেশেই বলা, নাম ধরে না বললেও, শুনে সাঁটু ভেবেছিল—না, কাল থেকে ভাল হয়ে যাবো।

সাঁটু দেশলাইটা হাতে নিয়ে মাঠের মধ্যিখানে ঢিবিটার ওপর বসে থাকে। দাঁতে আটকানো বিড়ি। ধরায়নি। সাঁটু ভাবে, বাবুদের বাড়ির ঝি সরস্বতীর কি উচিত হয়েছে সাঁটুকে অমন বাপ-মা তুলে গাল দেওয়াটা? ছেলের মাথা খেতেও বলেছে। যত যাই হোক সরস্বতী তো সাঁটুরই বউ! আজ না হয় সে পয়সাওলা লোকের সঙ্গে বিয়ে বসেছে। তা সুখচন্দ্রের পয়সাই বা এমন কী! আটাকল খুলে ধরাকে সরা দেখছে। তারও আগের পক্ষের বউয়ের হ্যাপা সামলাতে হয়। সরস্বতী

ভাবে সুখচন্দ্র তাকে চিরকাল মাথায় নিয়ে নাচবে। ফুঃ! লাথি দিল বলে। বেশি দিন নয়।

ছেলের মাথা খেতে বলা সরস্বতীর ঠিক হয়নি। ছেলে তো সাঁটুর একার নয়, তারও। কিন্তু রেগে গেলে সরস্বতীর আর সে সব খেয়াল থাকে না। রেগে গেলে সরস্বতী একেবারে দিগ্‌বসনা।

টিবির ওপর কয়েক জায়গায় ঘাস পুড়ে টাক পড়েছে। এখানে সেখানে আঙ্‌রা পড়ে আছে, ছাই উড়ছে অল্পস্বল্প। ডাকাতে সাধুটা ক'দিন আগেও এখানে থানা গেড়ে ছিল।

আজকাল সাঁটুলালের খুব ইচ্ছে হয় কারো কাছে গিয়ে মনের দুঃখের কথা সব উজাড় করে বলে। তার দুঃখ ঝুড়িভরা। সাধুর খোঁজ পেয়ে একদিন সন্ধেবেলা চলেও এসেছিল সাঁটুলাল। সাধুটা নাকি ভীষণ তেজালো, শূল চিমটে কিংবা ধুনি থেকে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে লোককে তাড়া করে। তা তেজালো সাধুই সবার পছন্দ। সাঁটুরও।

সন্ধেবেলা সাঁটু টিবিতে উঠে দেখল লেংটি-পরা জটাধারী ভয়ংকর সাধু বসে বসে খাচ্ছে। কাছেপিঠে কেউ নেই, কেবল বেলপুকুরের মতিলাল একধারে চোরের মতো খোলা ছাতা সমুখে ধরে বসে আছে। তামাকের কারবারে মতিলাল গতবার খুব মার খেয়েছে। সেই থেকে লটারির টিকিট কেনে, হাতে গুচ্ছের কবজ আর সাধুর খোঁজ পেলেই সেখানে গিয়ে খুঁটি গাড়ে।

সাঁটুলালকে দেখে মতিলাল হাতের ইশারায় ডেকে বলল—এখন কথাটথা বোলো না, বাবার ভোগ হচ্ছে। আর খুব সাবধান, বাবা কিন্তু হাতের কাছে যা পায় ছুঁড়ে মারে। আমার ছাতার আড়ালে সরে এসো বরং।

মতিলালের ছাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে সাঁটুলাল সাধুর খাওয়া দেখে চোখের পাতা ফেলতে পারে না। ভাল ঠাহর হচ্ছিল না অল্প আলোয়, তবু মনে হচ্ছিল যেন কিসের একটা বড়সড় ঠ্যাং চিবোচ্ছে।

মতিলাল ঠেলা দিয়ে বলল—দেখছ কী! নিজের চোখে যা দেখলাম প্রত্যয় হয় না।

সাঁটু মতির কাছ ঘেঁসে বলল—কি দেখলে?

মতিলাল ফিসফিস করে বলে—সবটা দেখিনি। সন্ধের মুখে মুখে এসে হাজির হয়ে দেখি বাবার সামনে একটা আধজ্যান্ত শেয়াল

পড়ে আছে, মুখ দিয়ে ভকভক করে রক্ত বেরোচ্ছে, তখন পাঁজরও ওঠা-নামা করছিল। ধুনি জ্বেলে সেই আধজ্যান্ত পশুকে আগুনে ভরে দিল মাইরি, কালীর দিব্যি। তারপর ঐ দ্যাখো, কেমন তার করে খাচ্ছে।

সাঁটু শুয়োরের মাংস পর্যন্ত খেয়েছে, কিন্তু শেয়াল পর্যন্ত যেতে পারেনি। শুনে আর একটু মতিলালের কাছ ঘেঁসে বসল। মতিলাল কানে কানে বলল—স্বয়ং পিশাচসিদ্ধ মহাদেব। বুঝেছো। এমন মহাপুরুষের সঙ্গ পাওয়া কত জন্মের ভাগ্যি।

শেয়াল খেয়ে সাধু ঘাসে হাত পুঁছে মাটির ওপর শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। মতিলাল খুব সন্তর্পণে উঠে গিয়ে সাধুর পা দাবাতে লেগে যায়।

সাধুর শেয়াল খাওয়া দেখে সাঁটুর গা বিরোচ্ছিল। মতি হাতের ইশারায় ডাকলে সে হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা কাছে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ধানাই পানাই বলতে শুরু করল—বাবা, আমি বড় পাপী। তা বাবা, দুঃখী লোকেরা পাপ না করেই বাঁচে কিসে বলো! তাই ভাবছি বাবা, তুমি যদি আশীর্বাদ করো তো কাল থেকে ভাল হয়ে যাবো।

সাধু চিত হয়ে শুয়েছিল, কথা শুনে মুখটা ফিরিয়ে একবার তাকাল শুধু। ভারী ছুঁচোলো নজরটা। সাঁটুর তো ছুঁচ ফোটানোর মতো যন্ত্রণা হয়েছিল।

সাধু কিন্তু গাল দিল না, একটু হেসে বলল—শালা নিমকহারাম পাঁচটা টাকা আর একটা জবাফুল নিয়ে আসিস কাল। এখন যা।

সাঁটু চারদিকে চেয়ে শেয়ালের নাড়িভুঁড়ি, ছাল আর পোড়া মাথাটা দেখে 'ওয়াক' তুলে সেই যে চলে এসেছিল আর যায়নি। যাবেই বা কোন মুখে? জবাফুলের যোগাড় ছিল, কিন্তু পাঁচটা টাকা?

সাধু চোত সংক্রান্তির সানে যাবে বলে তল্পি গুটিয়েছে, কিন্তু ঢিবির ওপরকার মাটিতে দাদের মতো পোড়া দাগ রয়ে গেছে। বাতাসে একটা পচাটে গন্ধও। শেয়াল খেলে লোকে পাগল হয় বলে শুনেছে সাঁটুলাল।

অর্ধেক কাঠিটা দেশলাইয়ের খোলের বারুদে ঠুকবে কি ঠুকবে না তা খানিক ভাবে সাঁটু। এ বাতাসে ধরবে না মনে হয়।

ঢিবি বেয়ে সাঁটুলাল নেমে আসে খানিক। এবার বাতাসে একটু আড়াল পড়েছে। 'জয় মা কালী' বলে সাঁটু কাঠিটা ঠুকে দিল খোলে। বিড়বিড়িয়ে উঠল আগুন। গেল ঃ গেল ঃ হুই রে ঃ সাঁটু বিড়ি হাতের খাপের মধ্যে গুঁজে প্রাণপণে টানে।

জয় মা! ধরেছে। নিবেই গিয়েছিল আগুনটা, শুধু কাঠিটা লালচে হয়ে ছিল বলে ধরল।

ভারী খুশি মনে ঢিবির ওপর বসে সাঁটুলাল দূরের দিকে চেয়ে থাকে! বিড়িটা শেষ হয়ে এলে এটা থেকেই আর একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে হাঁটা দেবে।

পাপ-তাপগুলো সবই যেমন-কে-তেমন থেকে গেল তার। কাউকে বলা হল না। মতিলালের পাপ-তাপ বোধ হয় সাধু টেনে নিয়ে গেছে। সাঁটুলাল বিড়ি টানতে টানতে ভাবল—নাঃ শালা, কাল থেকে ভাল হয়ে যাবো।

বড় রাস্তা দিয়ে একটা বাস আসতে দেখে সাঁটু তাড়াতাড়ি উঠে হাঁটা ধরে।

হাত তুলতে বাসটা থেমেও গেল। কিন্তু কনডাকটার নিত্যচরণ মুখ চেনে। উঠতে যেতেই হাত দিয়ে দরজাটা আটক করে বলল—উঠছো যে, পয়সা আছে তো?

—আছে আছে।

দোনা-মোনা করে নিত্যচরণ দরজা ছাড়লো বটে কিন্তু নাহক অপমান করে বলল—সিটে বোসো না, মেঝেয় বোসো।

তাতে সুবিধেই সাঁটুলালের। মেঝেয় বসলে তেমন নজর পড়বে না। পয়সা মাফও হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া সিটে জায়গাও নেই। সে বসেই ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বার করে নিত্যচরণের দিকে বাড়িয়ে দিল। যদি নেয় তো ভাল, না নিলে খুব দিক করবে।

তা নিত্যচরণ নিল। নেওয়ারই কথা। নিত্যচরণের দ্বিতীয়পক্ষ উলুবেড়ে থেকে চিঠি দিয়েছে আজ। বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে অত হাওয়ার মধ্যেও কী করে কোন কায়দায় যেন নিত্যচরণ বিড়িটা ধরিয়ে ফেলল। তারপর বুকপকেট থেকে ন্যাতানো পোস্টকার্ডটা বের করে জড়ানো অক্ষরের লেখা পড়তে থাকে একমনে। তার মুখে রাগ, বিরক্তি, বৈরাগ্য আর হাসি ফুটে উঠতে থাকে। চামেলি লিখেছে—শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। তারপর লিখি যে, সুপারি সব পাড়া হইয়াছে। কিন্তু মুকুন্দ ঠাকুরপো এবং ভাশুরঠাকুর হিসাব দেয় নাই। এত কটা মোটে দিয়াছে। তুমি বৈশাখে এসে হিসাব চেও। আমাকে দিন রাত্রি কথা শুনায়। কেন আমি কি কেউ না। সতীনপো পর্যন্ত বলে তিন্নির মা, মা ডাকে না। কথা আরো কত আছে। বলে দুই

বৌতে সমান ভাগ। ভাগ বড়। আমার ভাগের খড় শ্যামলালকে বিক্রি করিয়াছি। পাঁচ টাকা এখনো বাকি আছে। তোমার টাকা পাইনি। কী করে সংসার চলে বলো? তিন্নির আমাশা হওয়ায় কত খরচ হয়েছে সে খবর কেই বা রাখে। আমার কে আছে। হাটবারে মুকুন্দ ঠাকুরপোকে পাউডার আনিতে পয়সা দিয়াছিলাম। সে কি দোষের বলো। ঠাকুরপো আনে নাই, পয়সা আমার হাতেও দেয় নাই, তিন্নির হাতে ফেরত দিয়া বলিয়াছে অত বিবি সাজতে হবে না পাঁচজনে কুকথা বলে। সতীন চরিত্রের দোষের কথা বলে বেড়ায়। মা কালীর নামে দিব্যি কেটে লিখি যে সে কথা কেউ বলিতে পারিবে না। পোস্টকার্ডে আর জায়গা নাই। প্রাণনাথ রাখো শ্রীচরণে! চরণাশ্রিতা চামেলি।

শেষ লাইনটা 'রাবণ বধ' যাত্রা থেকে নেওয়া। নিত্যচরণ শ্বাস ফেলে পোস্টকার্ডটা আবার পকেটে ঢোকায়। বিড়ি নিবে গেছে, আবার ধরিয়ে নিল নিত্যচরণ।

সাঁটুলাল নিত্যচরণের মুখের ভাব দেখছিল একমনে। মোটে মাইল-খানেক রাস্তা। দেখি না দেখি না বলে কাটিয়ে দেবে। চিঠিটা আর একটু যদি লম্বা হত। লোকে যে কেন লম্বা লম্বা চিঠি লেখে না তা বোঝে না সাঁটুলাল।

নিত্যচরণ অবশ্য পয়সা আদায় করল না শেষ পর্যন্ত। নামবার সময় শুধু বলল—এই চারশ বিশ, বাস কি জল দিয়ে চালাই আমরা? তেল কিনতে পয়সা লাগে না!

বাস তেলে চলে না জলে চলে তা জেনে সাঁটুর হবেটা কী? সে নিজে যে কিসে চলে সেইটাই এক ধাঁধা। চলেও গেল এই বছর পঞ্চাশেক বয়স পর্যন্ত।

পথটা খুব পার হওয়া গেছে। চোত মাসের রোদে এ পথটুকু কমতি হল সে একটা উপরি লাভ।

সুখচন্দ্রের সঙ্গ আগে আগে কথা বলত না সাঁটুলাল। এখন বলে। ভেবে দেখেছে, সুখচন্দ্রের দোষ কী? সরস্বতীকে তো সে নিজে এসে ভাগায়নি। সরস্বতী নিজে থেকেই ভেগে গেল। বরং অন্য কারো চেয়ে সুখচন্দ্রের সঙ্গে আছে সে বরং ভাল। লোকটা কাউকে বড় একটা দুঃখ দেয় না! ফুর্তিবাজ লোক! যা আয় করে তা খেয়ে পরে ওড়ায়। বাজারের সেরা জিনিসটা আনবে। মরসুমের আমটা, কাঁঠালটা বেশি দাম দিয়ে হলেও কিনবে, ঘরে তার রেডিও পর্যন্ত

আছে ! আগের পক্ষে বাঁজা বউ শেফালীকেও খারাপ রাখেনি। নিজের বাড়ি শেফালীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য পাড়ায় সরস্বতীর জন্য আলাদা ঘর তুলেছে। দুই বাড়িতেই যাতায়াত।

অনেক ভেবেচিন্তে সাঁটুলাল দেখেছে, ব্যাপারটা খারাপ হয়নি। প্রথম প্রথম তার অভিমান হত বটে। কিন্তু এও তো ঠিক যে তিন তিনটে বাচ্চা সমেত সরস্বতী তার ঘাড়ে গন্ধমাদনের মতো চেপে ছিল এতদিন। এই যে সে গত রাতে খাড়ুবেড়েতে যাত্রা শুনতে গিয়ে রাত ভোর করে তারপর বেলাভর ঘুমিয়ে নাড়ুগোপালের মতো হেলতে দুলতে তিন প্রহর পার করে ফিরছে, সরস্বতী থাকলে হতে পারত এমনটা ? মাগী গিয়ে এখন তার ঝাড়া হাত-পা। ওদিকে ছেলেপুলেগুলো দু'বেলা খেতে পায়, পরতে পায়। সরস্বতীর চেহারা আদতে কেমন তা সাঁটু-লালের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পাঁচ-সাত বছর পর থেকে কেউ বুঝতে পারত না। এখন সরস্বতী পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুন চামড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হাত-পায়ের গোছ হয়েছে খুব। গায়ে রস হয়েছে। চোখে ঝলক খেলে। বেশ আছে।

গোঁজ মুখ করে ঘুরে বেড়াত সাঁটুলাল, একদিন সুখচন্দ্র ডেকে বলল—সাঁটুভায়া, ভগবান আমার মধ্যেও আছে, তোমার মধ্যেও আছে। তুমি আমি কি আলাদা ? সরস্বতী এসে জুটল, ফেলি কী করে বলো ?

এমনি দুচার কথা হতে হতে সাঁটুলাল ভাব করে ফেলল। তবে সরস্বতীর পুরোনো সব রাগ যায়নি। সুখচন্দ্র যতই মিতালি করুক সরস্বতী এখনো দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর আকাশ বাতাসকে শুনিয়ে তার কেচ্ছা গায়।

গাওয়ার মতো কেচ্ছা কম নেই সাঁটুলালের। তার সারাটা জীবন চুরি ছ্যাঁচড়ামি আর ছিনতাইয়ের কাণ্ডে ভরা। সে সব পুরোনো কথা। গত সপ্তাহে পালপাড়ার কদমতলায় সাঁটু নিজের মেয়ে কুন্তিকে গঙ্গা-যমুনা খেলতে দেখে মায়ায় পড়ে দাঁড়িয়ে গেল। শত হলেও সন্তান। মেয়েটাও খানিক খেলা করে বাপের কাছে এল দৌড়ে। একগাল মিষ্টি হেসে ডাকল—বাবা! বুক জুড়িয়ে যায়। মেয়েটার খালি গা, পরনে শুধু একটা বাহারী রঙচঙে ইজের।

সাঁটুর চোখটাই পাপে ভরা। যেখানে মত লোভানি আছে সেখানে তার পাপ নজর পড়বেই কি পড়বে ! মেয়েটাকে দেখতে গিয়ে প্রথমেই

তার নজর পড়ল মেয়ের কোমরের কাছে ইজেরের কসি এক জায়গায় একটু উল্টো ভাঁজ হয়ে আছে। আর সেই ভাঁজে স্পষ্ট একটা আধুলি আর কয়েকটা খুচরো পয়সার চেহারা মালুম হচ্ছে।

মেয়েকে জড়িয়ে ধরে খানিক আদর করেছিল সাঁটু। তারপর মেয়ে ফের গঙ্গাযমুনার কোটে ফিরে গেল, সাঁটু গেল বাজারে বাবুর জন্য সিগারেট আনতে। আর যেতে যেতেই টের পেল, কখন যেন তার হাতে একটা আধুলি দুটো দশ পয়সা আর একটা পাঁচ পয়সা চলে এসেছে। মাইরি! মা কালীর দিব্যি! সে টেরও পায়নি কখন আপনা থেকে পয়সাগুলো এসে গেল। একেবারে আপনা থেকে!

এসে যখন গেলই তখন তাকে ভগবানের দেওয়া পয়সা মনে করে সাঁটুলাল তৎক্ষণাৎ নগদানগদি তাড়ি খেয়ে ফিরল। বাবুর বাড়ির ফটকে তৈরি হয়েই দাঁড়িয়েছিল সরস্বতী, আর তার গা ঘেঁসে কুন্তি। আর যাবে কোথায়! প্রথমে মেয়েটাই দেখতে পেয়ে চেঁচাল—মা! মা! ঐ যে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী ঠিক কলের গানের পুরোনো বয়ান ছেড়ে যেতে লাগল—বাপের ঠিক নেই, নষ্ট মাগীর পুত, কেলে-কুত্তার পায়খানা! ডোমে ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে তোকে টেনে ভাগাড়ে ফেলবে। নিব্বংশের ব্যাটা, মেয়েকে পয়সা দিয়ে ডাল আনতে পাঠি-য়েছি—আর মেয়েরও বলিহারি বাবা—কোন আক্কেলে তুই ঐ গরু-চোরের ব্যাটাকে সোহাগ দেখাতে গেলি! গেল তো ঘাটের মড়ার আক্কেল দেখ! মেয়ের ইজেরের কসি থেকে পয়সা মেরে দিল। বলি ও ঢ্যামনা, পয়সার জন্য তুই না পারিস কী বল দেখি!

বলত আরো। বাবুর বউ বেরিয়ে এসে চোখা গলায় বলল—দেখ সরস্বতী, ছোটলোকের মতো চেঁচাবে তো দূর হয়ে যাও। সাঁটু, তুমিও এক্ষুনি বিদেয় হও। একটা চোর, আর একটার মুখ আঁস্তাকুড়। আমার বাচ্চাটা এ সব শুনে আর দেখে শিখবে। যাও, যাও।

সরস্বতী অবশ্য বাবুর বউকে ভয় পায় না। উল্টে তেজ দেখায়। কিন্তু সেদিন আর বাড়াবাড়ি করেনি। শুধু শাসিয়ে রেখেছিল আটা-চাকির বিশেকে দিয়ে মার খাওয়াবে। সেদিনই সন্ধের মুখে বিশে সাঁটুকে ধরে দোকানঘরের পিছনে আবডালে টেনে নিয়ে দিলও ঘা কতক। আরো দিত, সুখচন্দ্র সাড়াশব্দে এসে পড়ে বলল—যাক গে, বারো আনা তো মোটে পয়সা! কিন্তু সুখচন্দ্র মাপ করে তো সরস্বতী করে না! সে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—মুখ দিয়ে রক্ত

বেরোবার পর ছাড়া পাবে। সাঁটুলাল সরস্বতীর পা ধরতে উবু হয়ে বসে বলল—কাল থেকে আর হবে না।

সাঁটুলাল নিজেকে আজও জিজ্ঞেস করে—পয়সাটা কি সত্যিই মেরেছিল সাঁটু। সাঁটু শিউরে উঠে বলে—মাইরি না। মা কালীর পা ছুঁয়ে বলতে পারি। শালার পয়সাগুলোই ফক্‌কড়, বুঝলে! আমাকে জব্দ করতে কোন ফাঁকে সুট করে চলে এল হাতে।

এই সব দুঃখের কথা সাঁটুলাল কাউকে বলতে চায়। উজাড় করে বলবে সব। কিন্তু সাধুটা সটকেছে। আছেই বা কে?

গতকাল সাঁঝের মুখে বাবুর বউ নদীয়াল মাছ কিনতে পয়সা দিয়ে পইপই করে বলেছিল—দেখো সাঁটু, পয়সার হিসেব দিও। সরে পোড়ো না।

সাঁটুলাল মনে মনে দিব্যি কেটেছিল—আর নয়। এবার মানুষ হতে হবে। পাঁচজনের কাছে দেখানোর মতো মুখ চাই।

পয়সাটা ফেরত দিত সাঁটু যদি নিজে সে ফিরত। হল কি গ্রহের ফের। বাজারে গিয়ে দেখল নদীয়াল মাছ ওঠেনি। কয়েকটা ন্যাটা চ্যাং মাছ উঠছে যা বাবুরা খায় না। পয়সা নিয়ে ফিরেই আসছিল। তেমনি সময়টায় হরগোবিন্দ খবর দিল খাড়ুবেড়েয় যাত্রা হচ্ছে। যাবে নাকি সাঁটুলাল? আগুপিছু ভাবনা সাঁটুলালের কোনো কালেই ছিল না। চাঁদনী রাত ছিল। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল। বাবুর বাড়িমুখো হতে আর ইচ্ছে হল না তার। মনে মনে ভাবল—আজকের রাতটাই শেষ পাপ-তাপ করে নিই। কাল থেকে মাইরি—কাল থেকে ভাল হয়ে যাব একেবারে। এই ভেবে তাড়ি খেয়ে নিল প্রাণভরে। তারপর খাড়ুবেড়ের রাস্তা ধরল।

আজ তাই ফিরতে একটু লজ্জা-লজ্জা করছে তার। সরাসরি গিয়ে ঢুকে পড়লে বাবুর বউ বড় চেঁচামেচি করবে।

সাঁটুলাল তাই বাজারের দিকে আটাচাক্‌কির দোকানে গিয়ে উঠে বলল কী খবর হে সুখচন্দ্র? ভাল তো?

সুখচন্দ্র বেশ মানুষ। মুখে একটা নির্বিকার ভাব। ঝড় হোক, ভূমিকম্প হোক সুখচন্দ্রের মুখে কোনো শুকনো ভাব নেই। বলল—ভাল আর কই? কাল থেকে নাকি তুমি হাওয়া। বাবুর বাড়িতে খুব চেঁচামেচি হচ্ছে, যাও।

—যাচ্ছি। বলে সাঁটুলাল বেঞ্চিতে বসে পড়ে। বিশে চাক্‌কি

চালাচ্ছিল। আটা উড়ছে ধুলোর মতো চারদিকে। হুড়ো দিয়ে বলল—যাও যাও। কাজের সময় বসতে হবে না।

সাঁটুলাল দাঁত খেঁচিয়ে বলে—তুমি কে হে। যার দোকান সে কিছু বলে না তোমার অত ফোপরদালালি কিসের?

লেগে যেত। কিন্তু এ সময় সাঁটুর ছেলে বিণ্টু রাস্তা থেকে উঠে এসে সুখচন্দ্রকে বলল—বাবা, মা বলে দিল ফেরার সময় আনাজ নিয়ে যেতে।

সাঁটু প্রাণভরে দেখছিল। তার ছেলে। হ্যাঁ তারই ছেলে। সুখচন্দ্রকে 'বাবা' ডাকছে। আহা ডাকুক। ওর 'বাবা' ডাকার মতো লোক চাই তো। সে নিজে তো আর মানুষ নয়।

ছেলে বেরোলো তো পিছু পিছু সাঁটুলালও বেরোয়। ছেলে কয়েক কদম হেঁটেই পিছু ফিরে বলে—তুমি আসছো কেন?

সাঁটু একটু রেগে বলে—কেন, তোর বাবার রাস্তা?

—তুমি অন্য বাগে যাও। নইলে মাকে বলে দেবো।

—কী বলবি?

—তুমি কুল্গির পয়সা চুরি করেছিলে না? মনে নেই?

—ওঃ চুরি। গঙ্গাযমুনা খেলতে গিয়ে ছুঁড়ি কোথায় পয়সা হারিয়ে আমার ঘাড়ে চাপান দিলে।

—সে যাই হোক, তুমি কাছে আসবে না আমাদের।

—বাপকে কি ভুলে গেলি বিণ্টু?

ছেলে চলে গেল।

পালপাড়ার পুকুরধারে শেফালী ধরল তাকে। গা ধুয়ে ঘরে ফিরছে। দেখতে পেয়ে বলে—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

শেফালী মোটা মানুষ। শরীর ঢিলাঢালা হয়ে গেছে। ঘামাচিতে গা কাঁথার মতো হয়ে আছে। গোলপানা থোম্বা মুখখানা দেখলে কাতলা মাছের মাথার কথা মনে পড়ে। দাঁতে নস্যি দেওয়ার নেশা আছে। একগাল হেসে বলল—খবর শুনেছো নাকি? তোমার যে আবার ছেলে হবে।

ছেলে কি বাতাসে হয়। সাঁটু অবাক হয়ে বলে—আমার ছেলে হবে কি গো!

—ঐ হল! তোমার বউয়ের।

সাঁটু লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বলল—কী যে বলো বউঠান!

—বলছি বাপু, শুনে রাখো। তবে এও বলি, সরস্বতীর পেটেরটা যদি তোমার ছেলে না হয় তবে সে তোমাদের সুখবাবুর ছেলেও নয়।

সরস্বতীর ছেলে হবে শুনে সাঁটুলাল খুশিই হল। আহা! হোক, হোক। ছেলেপুলে বড় ভালবাসে সরস্বতী। ছেলেপুলে নিয়ে সব ভুলে থাকে।

খুশি মনে সাঁটুলাল বলল—ভাল, ভাল।

ভাল কী! অ্যাঁ! ভালটা কী দেখলে? পাঁচজনে যাই বলুক, আমি তো সুখবাবুর মুরোদ জানি। ছেলের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা সে মেনিমুখোর নেই। থাকলে আমার বাঁজা বদনাম ঘুচত। তুমি বুঝি ভেবেছো সুখবাবুর ক্ষমতায় কাণ্ডটা হচ্ছে? আচ্ছা দিনকানা লোক তোমরা। এ সুখবাবুর কাজ নয় গো। সাঁটি আছে।

—কিসের সাঁট?

থোম্বা মুখে ঢলাঢলি হাসি খেলিয়ে শেফালী বলে—দেখেও দেখ না নাকি! বিশে যে তোমাকে সেদিন খুব ঠেঙাল সে কেন জানো? বিশেকে যে দীনবন্ধুবাবু তার কারবারে বেশি মাইনেয় লাগাতে চেয়েছিল তাতে বিশে গেল না কেন জানো? সে যে এখানে বিশ টাকা মাইনে আর দু'বেলা খোরাকি পেয়ে আঠার মতো কেন লেগে আছে জানো? বোঝো না? বিশে আর সরস্বতীর ভাবসাব দেখেও বোঝো না? চোক কান খোলা রেখে চলবে। তা হলে আর পাঁচজনের কাছে শুনে বুঝতে হবে না। যাও, বাড়ি গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো।

ভাবাভাবির কী আছে তা সাঁটুলাল বোঝে না। দিনের মতো পরিষ্কার ব্যাপার। তবে কিনা সাঁটু এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। আসল ব্যাপার হল, সরস্বতীর আবার ছেলে হচ্ছে।

বাড়ি ঢুকতেই আগে বাবুর সঙ্গে দেখা। বাগানের রাস্তায় শোয়ানো চেয়ার পেতে বসে বই পড়ছে। কেবল বই পড়ে। শোনা যায় কলেজের খুব নাম-করা মাস্টার। মেলা বিদ্যা জানে। যদিও ধান আর চিটের তফাত বুঝতে পারে না। তা সে যা হোক, বেশি বোঝেন না বলেই ভাল। বুঝলে বড় মুশকিল।

বাবু মুখ তুলে দেখে বললেন—সাঁটুলাল যে! কোথায় গিয়েছিলে?

—এই আজ্ঞে। কাল থেকে আর হবে না।

—সে জানি। কিন্তু বাড়ির সবাই ভাবছিল খুব।

—আর হবে না।

বাবু রোগা রোগা লোক, বেশি কথা বলে না। শুধু গম্ভীর হয়ে বলল—বিশ্বাসী লোক পাওয়া বড় মুশকিল দেখছি।

ভিতর-বাড়িটা থমথম করছে। বউদি এই সবে দুপুরের ঘুম থেকে উঠল। মুখ-টুখ ফুলে রাবণের মা। তার ওপর এলোকেশী ঠোঁটে শুকনো রক্তের মতো পানের রস। গলায় কপালে ঘাম। আঁচল কুড়োতে কুড়োতে কুয়োতলায় যাচ্ছিল, ভিতরের বারান্দায় তাকে দেখে থমকে গিয়ে বলল—তুমি কার হুকুমে বাড়িতে ঢুকেছো? বেরোও এক্ষুনি।

সাটুলাল টপ করে কান ধরে ফেলে বলল—কাল থেকে আর হবে না।

ঘুম থেকে উঠলে মানুষের তখন তখন আর তেমন তেজ থাকে না। বউদিরও রাজ্যের আলিস্যি। হাই তুলে বলল—পয়সাটা ফেরত দেবে তো?

—মাইনে থেকে কাটান দিয়ে দিবো বরং।

—চায়ের জল চড়াও গে যাও। বলে বউদি কুয়োর দিকে গেল।

চায়ের জল চড়ানোর কথা সাটুলালের নয়। সে বাইরের কাজের লোক। জল তোলে, গরুর দেখাশোনা করে, দুধ দোয়ায়, বাগান করে, কাপড় কাচে আর ফাই-ফরমাশ খাটে। ঘরের কাজ সরস্বতীর ওপর। রান্না, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁটানো আর মোছা। তাই চায়ের জল করার কথায় অবাক মানে সাটুলাল।

কাজ তেমন জানা নেই। তবু পায়ে পায়ে রান্নাঘরের দিকে এগোলো। রান্নাঘরের দরজা খোলা। মেঝের একপাশে সরস্বতী শোওয়া। অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

আহা, ঘুমোক। আবার না জাগে। এ সময়টায় শরীর এলিয়ে যায়। সরস্বতীর হাঁ-মুখের কাছে মাছি উড়ছে, বসছে। হাত নেড়ে তাড়াল সাটুলাল।

তারপর খুব সাবধানে সরস্বতীকে ডিঙিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে সে। কেরোসিনের স্টোভকে জুত করতে পারছিল না। খুটুরমুটুর করে নাড়ছিল। শব্দ পেয়ে সরস্বতী পাশ ফিরে রক্তচোখে চেয়ে বলল—ও কী! রান্নাঘরে ধুলোপায়ে ঢুকেছো যে বড়! বাইরের জামা-কাপড় নিয়ে ছিষ্টি ছুঁচ্ছো! তুমি কি মানুস? সাতবাসী হেগো মোতা কাপড়। তার ওপর কোথায় কোন আঁস্তাকুড়ে রাত কাটিয়েছো! বেরোও!

সাঁটুলাল সরস্বতীর মুখপানে চেয়ে খুব হাসে। বেশ লাগছে দেখতে। মা হওয়ার চেহারাই আলাদা।

সরস্বতী উঠে বসতে বসতে বলল—চৌকাঠ পেরোলে কেমন করে বলো তো! আমাকে ডিঙোলে নাকি?

—তা কী করবো!

—কী করব মানে? জলজ্যান্ত মানুষকে ডিঙোতে হয়?

সাঁটুলাল খুব গম্ভীর মুখ করে বলল—পোয়াতি মানুষ যেখানে সেখানে শুয়ে থাকো কেন? এ সময়টায় অসাবধান হওয়া ভাল না।

কে জানে কেন, এ কথায় সরস্বতীর মুখে রক্তন পড়ে গেল। আর একটাও কথা না বলে উঠে চলে গেল বোধহয় কুয়োতলায়। একটু বাদে ভেজা মুখচোখ নিয়ে ফিরে এসে বলল—সরো, আমি চা করছি।

সাঁটুলাল সরল বটে, কিন্তু গেল না। দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সরস্বতীর দিকে। সরস্বতী টের পাচ্ছে তবু চোখ তুলে তাকাচ্ছে না।

সরস্বতী তাকাচ্ছে না বলে যে সাঁটুকে খাতির দেখাচ্ছে তা নয়। আসলে এই পোড়ামুখখানা দেখাতে তার ইচ্ছেই করে না।

স্টোভের সলতে কমে গিয়েছিল। টিনের চোঙগুলো খুলে সরস্বতী সলতে টেনে বড় করে দেশলাই জেলে সলতে ধরাল। কেটলি চাপিয়ে কেরোসিনের হাত ধুতে গেল উঠোনবাগে। দেশলাইটা পড়ে রইল মেঝেয়।

সাঁটুলালের দেশলাই ফুরিয়েছে। সেই আধখানা কাঠি দিয়ে কখন একটা বিড়ি খেয়েছে। ভাবাভাবির বড় ঝামেলা। দেশলাইটা তুলে নিয়ে সাঁটু সরে পড়ল। রাজ্যের কাজ পড়ে আছে। জল তুলতে হবে, গরুর জাবনা দিতে হবে, গোয়ালে ধোঁয়া। তার আগে আবডালে কোথাও বসে ভরপেট বিড়ি খাবে এখন।

তেঁতুলের ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে সাঁটুলাল পশ্চিম আকাশে রঙের বাহার দেখছিল। বিড়ি খেলে মাথাটা খুলে যায়। সব ভাল লাগে কিছুক্ষণ। তাড়ি খেলে আরো খোলে। গাঁজা খেলে তো স্বর্গরাজ্য হয়ে যায় দুনিয়াটা।

বিড়িটা যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন বাবুর ছ'বছরের মেয়ে বাবলি এসে পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরল—সাঁটুদা, তুমি পয়সা চুরি করে পালিয়েছিলে?

সাঁটু একগাল হেসে বলে—না। মাইরি না।

—আমি জানি। তুমি পয়সা চুরি করে কাল চলে গিয়েছিলে। কান ধরো।

সাঁটু কান ধরে জিভ কেটে বলে, ছি ছি। বড় অন্যায় হয়ে গেছে। কাল থেকে আর করব না।

রোজ নতুন নতুন সব ব্যাপার শিখছে বাবলি। আজকাল ইস্কুলে যায়। ইস্কুল থেকে কত কী শিখে আসে। যেমন এখন বাবলি একটা শুকনো গাছের ডাল কুড়িয়ে এনে বলে—হাত পাতো।

সাঁটু হাত পাতে। বাবলি দুর্বল হাতে গাছের ডালটা দিয়ে সাঁটুর হাতে মারে। বলে, আর করবে? •

—না গো।

—নিলডাউন হও।

সাঁটু নিলডাউন হয়।

আর কী করবে ভেবে না পেয়ে বাবলি বলে—আচ্ছা, হয়েছে। মেরেছি তো! শাস্তি দিয়েছি তো! এস, এবার আদর করি।

বলে কাছে এসে বাবলি সাঁটুর মাথাটা নিজের কাঁধে চেপে ধরে চুলে হাত বুলিয়ে বলে—সাট, সাট, সাট। লেগেছে সাঁটুদা?

বড় যন্ত্রণা হল সাঁটুর বুকটার মধ্যে। এক পুকুর জল উঠে আসতে চায় চোখে। মাথা নেড়ে বলে—না, না, লাগেনি। আমি চোর খুকু-মণি, তাই আমার ছেলেপুলেরাও আমাকে ঘেন্না পায়। তুমি রোজ মেরো আমাকে। বুঝলে?

—এমন শাস্তি দেবো তোমাকে রোজ সাঁটুদা, দেখবে ভয় পেও না, আবার সাট করে দেবো।

ভিতর-বাড়িতে দেশলাই নিয়ে ফের চেঁচামেচি হচ্ছে। হোক। সব দিকে কান দিলে হয় না। সাঁটুলালের অনেক কাজ। তাই উঠে গোয়ালঘরের দিকে গেল।

সন্ধের পর বাগানের রাস্তা থেকে বাবুর শোয়ানো চেয়ার আর জল বা চা রাখবার ছোট টুল তুলতে গিয়ে সাঁটুলাল সিগারেটের প্যাকেটটা পেয়ে গেল। তাতে দু' দুটো আস্ত সিগারেট। সাঁটু খুব অভিমান-ভরে ভাবল, নিলে লোকে বলবে চোর। কিন্তু এই যে হাতের নাগালে দুটো সিগারেট তার ভাগ্যে পড়ে আছে, এর মধ্যে কি ভগবানেরও ইচ্ছে নেই?

সাঁটু সিগারেটের প্যাকেটটা কামিনীঝোপের মধ্যে গুঁজে রেখে দিল। রাতে ভাত খাওয়ার পর জমবে ভাল।

রাতের কাজ সেরে সরস্বতী বিদেয় নিয়েছে। বিকেলে দেশলাই নিয়ে আজ আর বেশি চেঁচায়নি। মুখোমুখি দেখা হতে তেমন চোখে চোখে তাকায়ওনি লাল চোখ করে। বাবু আর বউদিও আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে শুতে গেল।

বাইরের বারান্দায় শতরঞ্চি আর একটা কাঁথা পেতে শুয়ে সিগারেট টানছিল সাঁটুলাল। ঠিক সে সময়ে অন্ধকার ফুঁড়ে সরস্বতী উঠে এসে বলল—আমি পোয়াতি—এ কথা কে বলল তোমায়?

সাঁটু শুয়ে শুয়েই ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে বলে—আমার সঙ্গে থাকতে তিনবার হয়েছিলো, লক্ষণ সব চিনি কিনা! বলবে আবার কে?

সরস্বতী উবু হয়ে বসে বলে—মিছে বলো না। শেফালী কুচ্ছো গেয়ে বেড়াচ্ছে। তার কাছেই শুনেছো। আচ্ছা পাজি মেয়েছেলে যা হোক। নিজের হবে না, অন্যের হলে শতেক দোষ খুঁজবে। এসব কথা জানাজানি হলে সুখকর্তা আর রাখবে ভেবেছো?

সাঁটুলাল মাথা দুলোলো।

সরস্বতী আস্তে করে বলে—শোনো, তুমি সুখচন্দ্রকে বুঝিয়ে বলবে যে, তোমার সঙ্গে যখন থাকতুম তখনো আমার চরিত্তির দোষ ছিল না, এখনো নেই। বুঝলে? তোমার মুখের কথার দাম হবে। নইলে সুখচন্দ্র আজ রাতে ঐ মাগীর কাছে শোবাতে গেছে, রাতভর এমন বিষ ঢালবে কানে যে, পুরুষটা বিগড়োবে। কালই গিয়ে সুখচন্দ্রের সঙ্গে বসে নানা কথার মধ্যে এক ফাঁকে কথাটা তুলো।

উদাসভাবে সাঁটুলাল বলে—তুলবখন।

—তুলো। তুমি লোক খারাপ নও আমি জানি। দুটো টাকা রাখো। বলে আঁচলের গেরো খুলে ভাঁজ করা টাকা বের করতে যায় সরস্বতী।

ভারী লজ্জা পায় সাঁটুলাল। বলে—আরে থাক, থাক। ওসব রাখো।

—নাও। বিড়িটিড়ি খেও। মাসে দশ টাকা মাইনে পাও, তাতে কী হয়। রাখো এটা। আমি সদর ভেজিয়ে রেখে চলে এসেছি। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

—হ্যাঁ, যাও। চারদিকে ভারী চোর-ছ্যাঁচোড়!

—সে জানি। বলে সরস্বতী আঁধারে মিলিয়ে যায়।

সাঁটুলাল দু'নম্বর সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলে। সরস্বতী বলে গেল, সে নাকি ভাল লোক। সত্যিই কি আর বলেছে। মন রাখা কথা। কিন্তু যদি সত্যিই তাকে ভাল লোক বলে জানত সবাই!

হাতের সিগারেটটার দিকে চেয়ে রইল সাঁটুলাল। ভারী রাগ হল নিজের ওপর। আচমকা সিগারেটটা প্রায় আস্ত অবস্থায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের দু' গালে ঠাসঠাস করে কয়েকটা চড় দেয়।

রাগ তাতে কমে না। নিজের ঘাড় ধরে নিজেকে তোলে সে। তারপর নিজেকে নিয়ে ফটকের বার করে দিয়ে বলে—যা হারামজাদা আহম্মক ছ্যাঁচড়া চোট্টা কোথাকার। ফের যদি আসিস তো জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।

এই বলে হাত ঝেড়ে সাঁটুলাল ফিরে আসে। কালই গিয়ে সুখ-চন্দ্রকে বুঝিয়ে আসবে যে, সরস্বতী বড় সতী মেয়ে। তার গর্ভে সুখচন্দ্রেরই ছেলে। আর টাকা দুটোও ফেরত দেবে সরস্বতীকে। সে ঘুস-টুস খাবে না আর। পুরোনো সাঁটুলাল বিদেয় নিয়েছে।

খুব আনন্দে খানিক ডগমগ হয়ে বসে রইল সাঁটুলাল। মনটা ভারী বড়সড় হয়ে গেছে। বুকে যেন হাওয়া-বাতাস খেলছে। প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

কামিনীঝোপের নিচে পড়ে থাকা সিগারেটটা ধোঁয়াচ্ছে। এখনো অনেকটা রয়েছে। খামোকা পয়সা নষ্ট।

সাঁটুলাল গিয়ে সিগারেটটা তুলে আনল ফের। বসে বসে মনের সুখে টানতে লাগল। দেশলাইটা নেড়ে দেখল অনেক কাঠি রয়েছে। বাঁ ট্যাঁকে সরস্বতীর দেওয়া টাকাটা।

সাঁটুলাল ভাবল—এই শেষ পাপ-তাপ বাবা। কাল থেকে ভাল হয়ে যাচ্ছি।

যতীনবাবুর চাকর

যতীনবাবু পানুকে খুব ভাল করে চেনেন না, একথা ঠিক। যতীন-বাবুর দোষ নেই, তাঁর মেলা লোকলস্কর, মেলাই মুনিশ, দারোয়ান, চাকরবাকর। এর মধ্যে পানু কোনজন তা তাঁর না জানার হক আছে। তবে কিনা যতীনবাবুর দুটো কুকুর, সাতটা গাই, গোটা সাতেক ছাগল, পঞ্চান্নটা হাঁস, সত্তরটা মুরগি, সতেরোটা খরগোশ, সাতটা পোষা পাখি আর যতীনবাবুর প্রায় একশো বছর বয়েসী দিদিমা কুসুম দাসী পানুকে ভালই চেনে। তবে তারা আরও অনেককে চেনে, আবার পানুকেও চেনে।

পানু যদি বলে, "আমি যতীনবাবুর চাকর" তা হলে কথাটা মিথ্যেও হয় না, আবার সত্যিও হয় না। মাস গেলে পানু যে আশিটা টাকা মাইনে পায় তা যতীনবাবুর তহবিল থেকেই আসে। দুবেলা পানু যে পাহাড়প্রমাণ ভাত পেটের মধ্যে সাঁদ করায় তাও বটে যতীনবাবুরই ভাত, তবু সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, পানু হল গে চাকরের চাকর। যতীনবাবু তাকে চেনেন না, তার মাথার ওপর ছড়িও ঘোরান না। তাকে হুকুম তামিল করতে হয় সত্যরামের। সত্যরাম এ বাড়ির যত চাকরবাকর আর কাজের লোকের ছড়িদার। সত্যরামের যা দাপট তা কহতব্য নয়। সত্যরামও বটে যতীনবাবুর এক চাকরই, কিন্তু সে কথা মনে আনাও পাপ। সে এখন যতীনবাবুর মেলা মেলা টাকা রোজ ছানাঘাঁটা করে, কাকে রাখবে কাকে ফেলবে তাও সে-ই ঠিক করে, সে-ই বাজার সরকার, খাজাঞ্চি, আরও বা কত কী। পানু শুধু জানে, যতীনবা... নন, তার মাথার ওপর সত্যরাম। তার মরা-বাঁচা সত্যরামের হাতে। সুতরাং সে হল গে যতীনবাবুর চাকরের চাকর।

এ বাড়িতে পানু ঢুকেছিল ছুঁচ হয়ে। তবে ছুঁচই রয়ে গেছে, ফাল আর হওয়া হয়নি। সেই ছুঁচ হয়ে ঢোকাটাও এক বৃত্তান্ত। পানু তখনও তো চাকর হয়নি। বাপ বেঁচে। গরিব বটে, তবু বাপ খাটত পিটত, পানু আলায়-বালায় ঘুরে দিব্যি হেসেখেলে ছিল। পানুর তখন বয়সের জোয়ারে চেহারাখানাও এমন পাকিয়ে দরকচা

মেরে যায়নি। ভারী মিঠে করে বাঁশি বাজাতে পারত। ইচ্ছে ছিল, যাত্রা পার্টিতে ভিড়ে যাবে। গুণীর খুব কদর যাত্রার দলে। সেই সময়ে সে পড়ল গন্ধবাবুর খপ্পরে। সে আর এক বৃত্তান্ত। গন্ধবাবুর মেয়ে হল পারুল। গেছো মেয়েছেলে যাকে বলে। জামা ছেড়ে শাড়ি ধরার বয়সের ফাঁকেই দু দুবার দুটো ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে ফের ফেরত আসে। কোনও কোনও মেয়ে থাকে এরকম, যাকে শেষ অবধি সামলে ওঠা যায় না। স্বজাত স্বঘরের একটি যেমন তেমন পাত্র তখন গন্ধবাবুর খুব দরকার। নইলে মানসম্মান থাকে না।

তা গন্ধবাবুর মানইজ্জত বড় কমও তো নয়। উনি ছিলেন যতীনবাবুর তেলকলের ম্যানেজার। গোঁসাইগঞ্জের হাটে গন্ধবাবু পাকড়াও করলো পানুকে। দু'চার কথার পরই ধাঁ করে কাজের কথা পেড়ে ফেললেন। বেশ হেঁকেই বললেন, পারুলকে যদি বিয়ে করো তবে আখের গুছিয়ে দেবো। চাই কি আজই কাজে লেগে যেতে পারো।

গায়ে খুব গন্ধ মাখতেন বলে লোকটার ওই নাম। আসল নাম রাখাল-টাখাল কিছু হবে। তবে গন্ধবাবু বললে দশখানা গাঁয়ের লোক চেনে। বাড়ি এসে যখন পানু তার বাপকে কথাটা বলল তখন বাবা লাফিয়ে উঠে বলল, আরিব্বাস, এ তো লটারি জিতেছিস। কালই গিয়ে কাজে লেগে যা। মেয়েটার একটু বদনাম আছে বটে, তা বিয়ের পর দু চার ঘা দিলেই সারবে'খন।

পানু অগত্যা কাজে লেগে পড়ল। তেলকলের কাজ গতরের খাটুনি। তবে হবু শ্বশুর মাথার ওপর ছিল বলে ভরসাও ছিল। দিন ফিরবে।

কিন্তু ফ্যাসাদটা বাঁধাল পারুলই। চোত মাসে কাজে লেগেছিল পানু আর জ্যৈষ্ঠে পারুল ফের পালাল। এবার গেল এক ঠিকাদারের সঙ্গে। গিয়ে যে কোন গাড্ডায় পড়ল কে জানে, আর ফিরল না।

গন্ধবাবু তারপর থেকেই পানুর ওপর বিগড়ে গেলেন। না, তা বলে তাড়িয়ে দিলেন না। তবে আগের মতো "এসো, বোসো"-ও আর করলেন না। পানু চাকরি করে, গন্ধবাবু ম্যানেজারি করেন, কারও সঙ্গে কারও আর অন্য কোন সম্পর্ক থাকল না।

সেই সময়ে যতীনবাবুর বাড়িতে কাজের লোকের টান পড়ায় সত্য-রাম এসে তেল কল থেকে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল। সেই

কয়েকজনের মধ্যে পানু একজন। গন্ধবাবু ফিরেও তাকালেন না।

পানুর একটু দুঃখ হয়েছিল বইকি। পারুলের জন্য তাকে দেগে রাখা হয়েছিল বটে কিন্তু গন্ধবাবুর আরও মেয়ে ছিল। পারুলের ছোটো বকুল, তার ছোটো টগর। কিন্তু তাদের কোনও গণ্ডগোল নেই। কই তাদের একজনের সঙ্গেও তো বিয়েটা লাগাতে পারত পানুর। গন্ধবাবু সে-দিক দিয়ে গেলেন না।

গন্ধবাবু আর বেঁচে নেই। তার পরিবার কোথায় কি রকম আছে টাছে তাও জানে না পানু। তার সে সময় নেই। যতীনবাবুর বাড়িতে পাহাড়প্রমাণ কাজ। সত্যরাম আবার কারও বসে থাকা পছন্দ করে না।

যতীনবাবুর দুটো মহল। একটা অন্দর আর একটা বার। অন্দরমহলে যারা যাতায়াত করে তারা সত্যরামের পেয়ারের লোক। পানুর কপালে সত্যরামের নেকনজর জোটেনি। সে বাইরের লোক। বাইরে থেকে ভিতরটা কিছুই দেখা যায় না, তবে আন্দাজ করা যায়। মোটা মোটা দেয়াল, চিক মেলা বারান্দা, পর্দা ফেলা জানালার ওই যে বিশাল তিনতলা অন্দরমহল ও হল রাজার পুরী। ওখানে নরম বিছানা, আতরের সুবাস, পায়েস, রসগোল্লার ছড়াছড়ি। আর সোনা-দানা টাকা-পয়সার পাহাড়।

এই বাইরের মহল আর অন্দরমহলের মাঝামাঝি একখানা একটেরে দালান আছে। আগে ঠাকুর-দালানই ছিল, এখন নতুন ঠাকুর-দালান হয়েছে দক্ষিণ দিকে। এই দালানের একখানা ঘরে যতীনবাবুর দিদিমা থাকে। তিন কুলে কেউ আর নেই বলে বুড়ি যতীনবাবুর কাছে এসে পড়েছিল কোনওকালে। যতীনবাবু ফেলেননি, আবার তেমন মাথায় করেও রাখেননি। গরিব আত্মীয় বড় বালাই। তার ওপর বুড়ি তাঁর আপন দিদিমাও নয়, মায়ের মাসি।

খুনখুনে বুড়ি কুসুম দাসী একদিন পানুকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, দিবি দাদা, একখান ডাব পেড়ে?

পানু তখন নতুন। কিছু জানে না। কোথা থেকে ডাব পেড়ে দেবে তাও বুঝতে পারছে না। হাঁ করে চেয়ে রইল।

বুড়ি বলল, আমি যতীনের দিদিমা। যা, ওই পুবের ঘরের পিছনে যে গাছগুলো আছে সেখান থেকে একটা পেড়ে আন। আজ একাদশী।

যতীনবাবুর দিদিমা! পানুর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তক্ষুনি

গিয়ে তরতরিয়ে গাছে উঠে একটার জায়গায় চারটে পেড়ে আনল।

কুসুম দাসী খুব খুশি। কত আশীর্বাদ করল। ফললে আজ পানুর রাজাগজা হওয়ার কথা। সে তো হয়ইনি সে, তার ওপর ডাব পাড়ার জন্য সত্যরাম এই মারে কি সেই মারে।

তবে সে যা-ই হোক, সেই থেকে বুড়ির সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল পানুর। যতীনবাবুর দিদিমার অবস্থা যে তার চেয়ে খুব বেশি ভাল নয়, তা বুঝতে পানুর দেরি হয়নি। তবে বুড়ি মানুষ ভাল। দ'য়ে পড়লে মানুষের স্বভাব ভাল হয়ে পড়ে, তারা ভারী নরম নরম হয় আর লোকদের ভক্তিমান্যি করতে শুরু করে, এ পানু অনেক দেখেছে। যতীনবাবুর দিদিমাও সেই হিসেবেই ভাল। পানুকে খুব ডাকখোঁজ করে, এটা সেটা জোগাড় করে দিতে বলে, আর লোভও দেখায়, "তোর বে হোক, আমার এক ছড়া তিন ভরির মটরদানা হার আছে, তোর বউকে দেবো।"

পানু হাসে। মটরদানা হারখানা আর দিদিমাকে হাতছাড়া করতে হবে না ইহজন্মে। পারুল সটকে পড়ার পর থেকেই পানু জানে, এই তনচনে কপালে বে আর নেই।

খড় কুচোতে বসে, কিংবা চুন আর বালি দিয়ে ঝামায় ঘসে কুয়ো-পাড়ের শ্যাওলা তুলতে তুলতে, কিংবা পুকুরধারে পাটায় বাবুদের পেল্লায় পেল্লায় মশারি কাচতে কাচতে জীবনটার ওপর যেমন ঘেন্না আসে, তেমনি আবার শিউলি ফুটলে, নলেনগুড় জ্বালের গন্ধ বেরোলে বা কোকিল আচমকা ডেকে উঠলে মনটা ভারী খুশি-খুশি হয়ে ওঠে। জীবনটায় আর একটা খুশির তুফান লাগতে পারত যদি সত্যরাম তার ওপর খুশি থাকত। কিন্তু সেটাই কিছুতেই হয়ে উঠল না। এক একজন থাকে, বেশ আছে, দোষঘাট কিছু করেনি, তবু তার ওপর কেউই যেন খুশি হয় না। তাকে দেখলেই মুখ বেজার করে ফেলে। পানুরও হয়েছে তাই।

পানুর বাপ ম'রা গেল এই তো সেদিন। খবর পেয়ে পানুর তেমন কিছু বুক-তোলপাড় হল না। গরিবদের তেমন আঠা থাকে না কিনা। বাপের সঙ্গে পানুরও বহুকাল ছাড়কাট হয়ে গেছে। তবু খবর পেলে যেতে হয়, তাই গেল। গিয়ে দেখল, দেড় বিঘে জমি আর খোড়ো ঘর-সমেত বাস্তুটা জুড়ে থাবা গেড়ে আছে তার ছোটো ভাই কানু। রাগী কুকুর যেমন লোক দেখলেই গরগর করতে থাকে, তেমনি তাকে দেখেও

কানু কেমন যেন গরগর করতে থাকল। বুঝি ভেবেছিল পানু বাপের সম্পত্তির ভাগ চাইবে। চাওয়ার কথা মনেই হয়নি পানুর। সে বড়-লোকের চাকর, নজর একটু উঁচু হয়েছে। দেড় বিঘে জমি আর নড়বড়ে খেড়ো ঘরের ভাগ চাইবার মতো ছোটো নজর তার আর নেই। সে কথা কানুকে বুঝিয়েও বলল সে, তবু কানু গরগরানিটা থামাল না। বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে তার বেশ ফাঁদানো সংসার। এখানে ভাগিদার জুটলে তার বিপদ। সে তো আর সুখে নেই। তবে ছোঁড়াটা বরাবরই খারাপ ছিল। মদ টদ খায়। জুয়া খেলে, বউকে ধরে পেটায়, বাপকেও ঝাড় দিত মাঝে মাঝে।

পানু ফিরে আসার পর সত্যরাম একদিন তাকে পা দাবাতে ডেকে পাঠাল। সত্যরামের পা দাবানো এক মস্ত সম্মানের ব্যাপার। যে-সে সত্যরামের পায়ে হাত ছোঁয়াতে পারে না। যারা পারে তাদের নির্ঘাৎ দশ বিশ টাকা বেতন বেড়ে যায়। আর তারা নেক-নজরেও থাকে।

পানুর ভারী আহ্লাদ হয়েছিল সত্যরামের ডাক পেয়ে। কিন্তু পা দাবাবে কি, হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই সত্যরাম কাঁকিয়ে উঠে বলল, ওরে থাম থাম, কী লোহার হাত রে বাবা। কড়া পড়ে যে একেবারে শিরিস-কাগজ বানিয়েছিস। আমার নরম শরীর, ওই কেঠো হাত চলবে না।

তা কথাটা সত্যি বটে। পানুর হাত আর হাত নেই। থাবা হয়ে গেছে। মনের দুঃখে সে সত্যরামের ঘর থেকে ফিরে এল। কপালটা খুলি-খুলি করেও খুলল না। সত্যরামও চাকর বটে, কিন্তু বড় চাকর! সর ননি দুধ ঘি খেয়ে আর গতর না খাটিয়ে সে ইদানীং ভারী নাদুস-নুদুস হয়েছে। মুখখানায় আহ্লাদী ভাব। তিন আঙুলে তিনখানা সোনার আংটি। এমন এঁটে বসে গেছে যে, স্যাকরা ডেকে না খোলালে আর খুলবে না। তার পা দাবাতে গেলে পানুকে সাতদিন হাত দুখানা তেলে ভিজিয়ে নরম করে নিতে হবে।

এই সব নানা কথা নিয়ে ভাবে পানু। আর কাজ করে। আর খায়। আর ঘুমোয়। আর ভাবে।

ওদিকে যতীনবাবুর কারবার বাড়ছে, টাকা বাড়ছে, লোক বাড়ছে। ক্রমে ক্রমে চারদিকটা বেশ ফলাও হয়ে উঠেছে। দুখানা গাড়ি কিনলেন যতীনবাবু। বারবাড়ির উঠোনে একখানা দোতলা তুলে ফেললেন। পঞ্জাব থেকে দুটো বিশাল গাই এল।

কিন্তু পানু যে কে সে-ই। তবে এ কথাও ঠিক, যতীনবাবুর উন্নতি যত হয় ততই পানু খুশি হতে থাকে। শত হলেও মনিব তো। যতীনবাবুর রঙখানা দিন দিন ফর্সা হয়েছে, চোখ দুখানা থেকে দু বাটি মধুর মতো সুখ থিকথিক করছে। মুখখানায় সর্বদা যেন হাসি-হাসি ভাব। আগে একজন পাইক সর্বদা ঘুরত। আজকাল দুজন। দু-নম্বর পাইকটার চেহারা কাবলিওলাদের হার মানায়! যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, তেমনি বিশাল বুকখানা। আর চোখ দু'খানায় দোফলা ছুরির ধার। যত টাকা বাড়ছে যতীনবাবুর ততই শত্রু বাড়ছে। তাই বাড়ছে পাইক। নতুন পাইকটার হাতে একটা দোনলা বন্দুকও থাকে। দেখে ভারী ভক্তিশ্রদ্ধা হল পানুর।

দুপুরবেলা বারবাড়ির বারান্দায় তারা ছ'জন বাইরের চাকর খেতে বসে। সত্যরামের পেয়ারের লোকদের জন্য ভিতরে দরদালানে ভিন্ন ব্যবস্থা। তা হোক, পানুর কোনও দুঃখ নেই। যতীনবাবুর বাড়িতে ভাতটা নিয়ে হিসেব কসা হয় না। যত পার খাও। ভাতটা বেশ চেপেই নেয় সকলে। ভাতের মাথায় একটা গর্ত করতে হয়, তাতে বড় হাতা দিয়ে হুড়হুড় করে ডাল ঢেলে দিয়ে যায় হরিহর। একটু ঘ্যাঁট মতো থাকে সঙ্গে। পরে চুনো বা ছোটো মাছের একখানা ঝোল। বাড়িতে ভোজ হলে অবশ্য তাদেরও কপাল ফেরে। আর যতীনবাবুর বাড়িতে ভোজ লেগেই আছে।

খেতে বসে আজ নলিনীকান্ত পানুর কানে কানে বলল, নতুন পাইকটার বৃত্তান্ত শুনছো! সাতখানা খুন করে এয়েছে।

পানু শুনে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়, বলিস কী?

নোনাপুকুরের বটকেষ্ট কাপালিকের কাছে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল। পুলিস গিয়ে ধরে। বটকেষ্টর বড় ভক্ত হল যতীনবাবু। তার কথায় ওঠে বসে। বটকেষ্ট যতীনবাবুকে হুকুম দিল পুলিসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ছাড়িয়ে এনে পাইকের চাকরিতে বহাল করতে। যতীনবাবুও কাঁচাখেকো খুনীটাকে এনে রেখেছে। রোজ দুটো করে মুরগি, ডজন ডজন ডিম ওড়াচ্ছে আর বন্দুক নিয়ে গোঁফ চুমড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভগবান বলে কিছু নেই বুঝলে?

পানু মাথা নেড়ে বলল, সে আমি অনেক আগেই বুঝেছি।

বলাই দাঁতের ফাঁক থেকে একটা মাছের কাঁটা টেনে বের করার চেষ্টা করতে করতে বলল, তবে দীনু পাইক আসায় সত্যরামের বাজার খারাপ। কর্তাবাবু দীনুকে চোখে হারাচ্ছেন আজকাল।

কথা সকলের মনে ধরল। তারা কেউ সত্যরামের পেয়ারের লোক নয়। সত্যরামকে তারা কখনও ঘাঁটায় না এবং মুখে যথেষ্ট খাতির দেখায়। নইলে সত্যরাম যেদিন খুশি ঘাড় ধরে যে-কাউকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। দিয়েছেও কতককে। তবে তারা ছ'জন যে টিঁকে আছে তার কারণ, তারা কাজের লোক, প্রাণপণে খাটে।

পানু মাথা নেড়ে বলল, কথাটা বড় ভয়ের হল।

বলাই বলল, কেন ভয়ের কী? দিক না বন্দুকটা সত্যরামের ইয়েতে ঢুকিয়ে। আমি তো হরির লুট দেবো।

পানু লেবুপাতা ডলে শেষ কয়েকটা গরাস গপাগপ মুখে চালান দেওয়ার ফাঁকে বলল, সত্যরামের কিছু হলে দীনু পাইক যদি আমাদের মাথার ওপর বসে তা হলে তো দিনে দুপুরে হাতে মাথা কাটবে।

ফটিক গতকালই সত্যরামের হাতে জুতোপেটা হয়েছে হাট থেকে তামাক আনেনি বলে। সে বলল, আগে তো সত্যরামের ব্যবস্থা হোক পরে দীনুকে নিয়ে ভাবা যাবে।

কেষ্ট এতক্ষণ কিছু বলেনি। একটা মস্ত লঙ্কা নুনে মেখে একটু একটু করে খেয়ে শিসোচ্ছিল। লঙ্কায় আর একখানা চাটন দিয়ে বলল, খবর তো রাখো না। দীনু পাইক এমনি আসেনি। খবর হয়েছে এ বাড়িতে ডাকাত পড়বে। এত টাকা, ডাকাত না পড়ে পারে!

পাঁচুর সঙ্গে শ্রীপতি এতক্ষণ নিচু গলায় দাক্ষী নামে একটা নতুন ঝিকে নিয়ে রসের কথা বলছিল। দাক্ষীর বয়স কাঁচা, দেখতেও ভাল পাঁচু আর শ্রীপতিরও বয়স কম। দাক্ষী অন্দরমহলের ঝি। বাইরে বড় একটা আসে না। তবে দোতলার জানালা বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে বেপর্দা হাঁ করে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। পাঁচুর সঙ্গে কয়েকবার কথা হয়েছে। মেয়েটার ভাইয়ের বড় অসুখ। টি বি। সারাক্ষণ ভাইটার কথা ভাবে। পাঁচু বলল, কিছু টাকা জমলে ভাবছি ওকে দেবো।

শ্রীপতি মুখখানা উদাস করে বলল, ও টাকায় কী হবে? ক টাকাই বা তুই পাস? ও টাকা তো সাগরে শিশির। অত মজে যাস না বাপ। সত্যরাম টের পেলে ছাল ছাড়িয়ে নেবে।

সবাই যে যার থালা নিয়ে গিয়ে পুকুরধারে মাজতে বসল।

খেয়ে উঠে পানু একটু চিন্তিতভাবে ঘরে এল। দীনু পাইককে নিয়ে তার যেন খুব চিন্তা হচ্ছে।

যদিও কোনওদিন কথাবার্তা হয়নি এমনকি চোখাচোখিও ভাল করে নয় এবং তার নামও যদিও জানেন না তবু যতীনবাবুর প্রতি একটা দুর্বলতা আছে পানুর। শত হলেও মনিব। খুব ইচ্ছে হয় পানুর, একদিন গিয়ে যতীনবাবুকে বলে, আজ্ঞে আমি আপনার চাকর, আমার নাম পানু!

যতীনবাবু হয়তো ভারী অবাক হয়ে বলবেন, ও তাই নাকি? বা! বেশ, বেশ।

ওইটুকুই যথেষ্ট। পানু আর বেশি কিছু চায় না। যতীনবাবু কেমন লোক তা জানে না পানু। কেমন আর হবেন, ভালই হবেন বোধ হয়। ভগবান যাঁকে এমন ঢেলে দেন, লক্ষ্মী যার ঘরে এমন উথালপাথাল তিনি কি আর খারাপ লোক? তা এই যতীনবাবুর জন্য পানুর এখন একটু চিন্তা হচ্ছে। দীনু পাইকের মতো খুনে লোককে নিয়ে ঘোরাফেরা কি ঠিক হচ্ছে কর্তাবাবুর!

বটকেষ্ট কাপালিকের নাম হলো গে মদিকানন্দ! তার সাধন-নামে কেউ অবশ্য তাকে ডাকে না। সবাই তার পুরানো নামই বজায় রেখেছে। লোকে বলে, সে তার একটা বউকে কুয়োয় ফেলে মেরেছে, আর একটাকে গলায় ফাঁস দিয়ে। দুজনাই আশ্রিতা হয়ে সঙ্গে পায় পায়ে যায় বটকেষ্ট। সোনাপুকুরের শ্মশানে এখন তার সাধনপীঠ। খুব রমরমা। লোক যে সুবিধের নয় ঠিকই, কিন্তু পানু এও জানে, লোক ভাল হলে কাপালিকের চলে না। দুনিয়ার আর সব লোকের প্রতি পানুর যে মনোভাব, বটকেষ্টর প্রতিও তাই। মনোভাবটা ভয়ের। এ বাড়িতে যখন আসে তখন তার জন্য খাসি কাটা হয়, টিনি, মদের বোতল আসে আর বাড়িটা কেমন ছমছম করতে থাকে। কারণেই। বটকেষ্টর সঙ্গে দেড়শো ভূত সব সময়ে ঘুরে বেড়ায়। ভূতের গায়ের বোঁটকা গন্ধে বাড়ি একেবারে ম ম করতে থাকে। যতীনবাবু বিশ্বাস করেন, তাঁর যে অবস্থার এত উন্নতি তা ওই বটকেষ্টর জন্য।

তা হবে। পানু অতশত জানে না। কী থেকে কী হয় তা সে কী জানে। বটকেষ্টর ভূতেদেরও সে খুব ভক্তিমান্যি করে এবং ভয় খায়।

খাওয়ার পর তবু উবু হয়ে বসে কুয়োতলার শ্যাওলা ঘসে তুলছিল পানু। শীতকাল। রোদ পশ্চিমে হেলেছে।

সেই রোদে একটা ছায়া পড়ল তার গায়ে।

পানু মুখ তুলে যা দেখল তাতে ফের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। সামনে দীনু পাইক দাঁড়িয়ে। বুকের মধ্যে কেমন একটা গুড়গুড় শব্দ উঠল। হাত পা সব ঠাণ্ডা মেরে যেতে লাগল।

দীনু খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, অ্যাই, তুই গোবরার কানু মণ্ডলের ভাই না?

পানু ভারী চমকে গেল। সে গোবরা গাঁয়ের কানু মণ্ডলের ভাই বটে, কিন্তু সে কথা বেশি লোক জানে না। জানার কথাও নয়! দীনু পাইকের মতো মস্ত লোকের কানে যে কথাটা গেছে এইতেই সে অবাক। পানু ভারী বিগলিত হয়ে বলল, আজ্ঞে।

তোর নাম পানু?

যে আজ্ঞে।

পানু লক্ষ করল, দীনু পাইকের পরনে একটা ফর্সা পায়জামা, গায়ে খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি, তার ওপর জহর কোট। আড়েদিঘে আলিসান লোকটা বোধহয় খালি হাতে মোষের ঘাড় ভেঙে দিতে পারে। দীনু পাইক তার মোটা গলায় গড়গড় শব্দ তুলে বলল, সেদিন গোবরায় গিয়ে কানু মণ্ডলকে ভয় দেখিয়ে এসেছিস?

পানুর এক গাল মাছি। কানুকে কেন, সে তো মশা মাছিকেও ভয় দেখানোর এলেম রাখে না। সবেগে মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে না।

লোকটা কিছুক্ষণ খুনিয়া চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, কানু মণ্ডল আমার ইয়ার। বুঝেছিস কথাটা?

যে আজ্ঞে।

ওর জমিবাড়ির ওপর তোর কোনও হক নেই। আছে?

পানু সভয়ে মাথা নেড়ে বলল, ভাগ তো চাইনি।

আলবত চেয়েছিস।

আজ্ঞে না।

লোকটা আবার কিছুক্ষণ রক্ত-জল-করা চোখে তাকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে বলল, তা ভাল কথা। সাতদিনের মধ্যে গোবরায় গিয়ে কাগজে সইসাবুদ টিপছাপ দিয়ে আসবি।

খুব ভয়ে ভয়ে পানু জিজ্ঞেস করল, কিসের কাগজপত্র আজ্ঞে?

তোর অত খতেনে কী দরকার? যা বলছি তাই করবি। বেশি ট্যাঁ ফোঁ করলে বিপদ আছে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে চোখের পলকে দীনু পাইক হাওয়া হয়ে গেল।

পানু তার ভেজা হাতে কপালটা মুছল। দোতলার জানালা থেকে দাক্ষী নামে নতুন ঝিটা তাকে হাঁ করে দেখছে। দেখছে আরও অনেকেই। দীনু পাইক চলে যাওয়ার পরই পাঁচু, শ্রীপতি, বলাই এসে জুটল।

কী ব্যাপার গো পানুদাদা, দীনু পাইক তোমার ওপর তম্বি করে গেল কেন?

পানু কী আর বলবে, ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, আমি কিছু করিনি, ভাগ-টাগও চাইনি।

কিসের ভাগ? কী করোনি?

পানু মাথা নেড়ে বলল, সে অনেক কথা রে ভাই। তবে আমিও ব্যাপারটা ভাল বুঝছি না।

সবাই মিলে ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ তুমুল কথাবার্তা হল। পাঁচু বলল, ও যা বলছে তাই করো গো পানুদা। পৈতৃক প্রাণটার দাম অনেক বেশি।

পানু শুধু বলল, হুঁ।

রাত্রিবেলা পানু ভাল করে খেতে পারল না। এত তেণ্টা পাচ্ছিল যে ঘটি-ঘটি জল খেয়ে খিদের বারোটা বেজে গেল। রাত্রিবেলা ঘুমও হল না ভাল। ঘন ঘন পেচ্ছাপ চেপে যেতে লাগল। দীনু পাইক যে কানুর বন্ধু তা কে জানত। আর কানুই বা কেন দীনুকে তার পেছনে লাগাল তাও বুঝে ওঠা ভার।

শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ভাবল পানু। মাথাটা গরম হয়ে গেল।

সকালবেলায় যতীনবাবু তার পাইক বরকন্দাজ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পানু সে সময়ে পুকুরধারে চাদর কাচছে। এমন সময় সত্যরামের পেয়ারের লোক মুকুন্দ এসে বলল, ওরে তোর তলব হয়েছে।

সত্যরাম তার ঘরে নরম সাদা বিছানায় বসা। দেয়ালে হরেক ক্যালেণ্ডার। একখানা পেল্লায় লোহার আলমারি। ইস্তক টেবিল চেয়ার। কে বলবে চাকরের ঘর! তা সে যত বড় চাকরই হোক।

তবে কিনা পরিষ্কার ঘরখানা যেমন হাসছে, সত্যরামের মুখে কিন্তু তেমন হাসি হাসি ভাব নেই। ভারী বেজার মুখ। তাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বলল, কী রে, ওই ডাকাতটার সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল? ষড় করছিস নাকি?

পানু আগাপাশতলা অবাক হয়ে বলল, ষড়? কিসের ষড়? গুণ্ডোটা যে আমাকে শাসাচ্ছিল।

শাসাচ্ছিল? কেন রে আহাম্মক, করেছিসটা কী?

সেইটেই তো ভাবছি। ভেবে ভেবে কিছু ঠিক পাচ্ছি না।

খোলসা করে বল।

খোলস করেই বা বলি কী। কপালটাই আজ্ঞে আমার খারাপ।

দীনু পাইক তো আর যাকে তাকে শাসায় না। তার কাছে তুই তো পিঁপড়ে। কিছু গুরুচরণ করে থাকলে ঝেড়ে কেশে ফ্যাল।

পানু উবু হয়ে বসল। তারপর খানিক ভাবল। পারুল না সটকালে আজ তার তেলকলটার ম্যানেজার হওয়ার কথা। গন্ধবাবু সেরকমই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সত্যারাম বা দীনু পাইক কেউই তাকে পেত না। স্বয়ং যতীনবাবুর সঙ্গে সে রোজ মুখোমুখি কথা বলতে পারত। কত বড় সম্মান।

চোখে জল আসছিল পানুর। মায়ের পেটের ভাই হয়ে কানু কিনা বিনা দোষে পেছনে গুণ্ডা লাগাল।

সত্যারাম তার দিকে চোখা নজরে চেয়ে থেকে বলল, দ্যাখ, তোদের কিন্তু আমিই এক রকম বাঁচিয়ে বাড়িয়ে রেখেছি। দোবেলা খেতে জুটছে, ট্যাঁক গরম করা পয়সা জুটছে। এমন আরামে সাতটা গাঁয়ে ঘুরে দেখে আর আর কেউ আছে কি না। তোদের মতো মনিষ্যির পক্ষে কি এটা কম হল?

তা আজ্ঞে ঠিক।

তাই বলছি, ওই ডাকাতটার সঙ্গে ষড় করে আমার পিছনে লাগার মতলব যদি থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আখের ভাল হবে না। বেশি কথা কি, কালকেই সকালে বাবুকে বলে ঘাড় ধাক্কা দেবো।

পানু মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে আমি যথার্থই পিঁপড়ে। দীনু পাইক আমার সঙ্গে ষড় করার লোক নয়। তবে আমার ভাই কানুর সঙ্গে ওর ভাব আছে। বোধ হয় মদ বা জুয়ার আড্ডায় ভাব হয়েছিল। তাই আমাকে শাসাচ্ছিল বাপের সম্পত্তি যা আছে সব যেন লেখাপড়া করে কানুকে ছেড়ে দিয়ে আসি।

তোরও আবার বাপের সম্পত্তি আছে নাকি? এ যে গরুর গাড়ির হেডলাইটের বৃত্তান্ত! তা কত কী আছে?

শুনলে হাসবেন। দেড় বিঘে জমি আর দুটো খোড়ো ঘর।

শুনে কিন্তু সত্যরাম হাসল না। বলল, তা তুই কী বললি ডাকাতটাকে ?

কী আর বলব। রাজি হতে হল।

সত্যরাম কথাটা বোধ হয় মনে মনে ওজন করে দেখল। তারপর বলল, তোর বাড়ি তো গোবরায় !

আজ্ঞে মাইল তিনেক হবে উত্তর দিকে।

চিনি।

আজ্ঞে সবাই চেনে। গোবরার বেগুন খুব নামকরা।

সত্যরাম খিঁচিয়ে উঠে বলল, বেগুনটাই চিনলে। আর কিছু দেখলে না।

কী দেখব আজ্ঞে ?

দেখোনি ক্ষেত খামারের ওপর দিয়ে আমিনবাবুরা শেকল টেনে মাপজোক করছে !

তা দেখেছি বটে।

আহাম্মক কোথাকার। ওখানে বিরাট কারখানা হবে। জমির দাম হু হু করে বাড়ছে। চাষের জমি সব গাপ করে বড় বড় বাড়ি হবে।

পানুর গালে হাত, আজ্ঞে তা তো জানতুম না। কানু বলেওনি।

দেড় বিঘেতে কত কাঠা হয় জানিস ?

তা জানি।

এক এক কাঠার দাম যদি ঠেলে দশ হাজারে ওঠে তবে কানুর ট্যাঁকে কত আসবে তার আন্দাজ আছে ?

পানুর চোখ কপালে, উরে বাবা !

সাধে কি আর দেড় বিঘের জন্য দীনু পাইক তোকে শাসায় ?

গুহ্য কথা আছে না। যতীনবাবু থলিভর্তি টাকা নিয়ে রোজ গোবরায় আনাগোনা করছেন। আজও গেলেন একটু আগে। গোবরার জমি এখন সোনা !

পানুর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। কথা সরছিল না মুখে।

সত্যরাম করুণার স্বরে বলল, যা, কাজ করগে যা। ভেবেচিন্তে একটা কিছু মাথায় এলে বলবখন তোকে।

দীনু পাইক যে মোটে সাতদিন সময় দিয়েছে। কাগজপত্র সব তৈরি। গিয়ে টিপছাপটা দিলেই হয়।

সত্যরাম উদার গলায় বলল, জাতসাপে ধরলে তো আর বাঁচন নেই রে। টিপছাপ দিতে হলে দিবি। তবে একেবারে ফাঁকিতে পড়তে যাবি কেন? দু-চার হাজার চেয়ে বসবি।

যদি মারে?

মরবি তো বটেই। তোর আবার ওয়ারিশও নেই যে তুই মরলে কেউ দাবিদার দাঁড়াবে। নাঃ, তোর কপালটাই খারাপ দেখছি।

পানু উঠল। সত্যরামের মুখচোখে দুশ্চিন্তার ছাপটা তার ভাল লাগছে না।

সত্যরাম যেমনই হোক, পানুর মতো লোকের পুঁটিমাছের পরান তো ওরই হাতের তেলোয় দাপাচ্ছে! মারলে ওই মারবে, রাখলে ওই রাখবে। কিন্তু ওরও যদি বাঁচন মরণের সমস্যা দেখা দেয় তো ঘোর বিপদের কথা।

পানু পুকুরপাড়ে গিয়ে আজ খুব গতর নেড়ে কাপড় কাচল। কাজে মন থাকলে, শরীর ব্যস্ত থাকলে দুশ্চিন্তা একটু কম হয়।

বিকেলের দিকটায় সত্যরামের একটু ছুটি হয়। ঘন্টাটাক একটু নিজের মনে থাকতে পারে সাঁঝবেলাটায়। সত্যরাম এ সময়ে সিদ্ধি খায় আর সাকরেদদের নিয়ে ঘরে বসে কুটকাচালি করে।

পানু চাদরটা জড়িয়ে বাঁশবন পার হয়ে কালীবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। আরতিটা দেখে আসবে। আর ওই সঙ্গে মায়ের কাছে একটু মানসিকও করে আসবে। সাতে নেই পাঁচে নেই মা, তবে কেন আজ আমার এমন বিপদ।

আনমনা ছিল, তাই লোকটাকে দেখতে পায়নি পানু।

দাদা।

পানুর পিলে কেঁপে গেল। দুবার "আঁ আঁ" করল মুখ দিয়ে। পথ আটকে কানু দাঁড়িয়ে।

দাদা, ভয় পেলে নাকি? আরে আমি কানু।

পানুর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। বলল কী? কী? কী চাস তুই?

তোমার সঙ্গে কথা আছে। আড়ালে চল।

পানু মাথা নেড়ে বলল, ও বাবা, আড়ালে আমি যাচ্ছি না।

কানু অবাক হয়ে বলল, অত ভয় পাচ্ছো কেন? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক?

পানু দু পা পিছিয়ে বলল, আমি চললুম। যা বলার চিঠি লিখে জানাস।

কানু বেকুবের মতো দাদার দিকে চেয়ে বলল কী হয়েছে তোমার বলো তো ! আমি যে ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এলুম।

কী বিপদ ?

দীনু গুণ্ডা যে আমাকে ভিটেছাড়া করতে চাইছে।

অ্যাঁ। তা সে তোর পেয়ারের লোক, তা—

কী যে বলো দাদা, তার ঠিক নেই ! কে কার পেয়ারের লোক ? গোবরায় বলে কী সব কলকারখানা হবে টবে, সেই শুনে সবাই জমির দাম চড়িয়ে বসে আছে। সেই কবে জুয়া খেলতে গিয়ে পঞ্চাশটা টাকা ধার নিয়েছিলুম সেই সুবাদে দীনু শালা গিয়ে নানারকম গাইতে লাগল। তোমার মনিবেরও সাট আছে এর মধ্যে।

দীনু কী বলছে ?

বলছে, হাজারটা টাকা নগদ দিচ্ছি ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যা। নইলে ঘরে আগুন দিয়ে বেগুনপোড়া করে ছাড়ব। সব তোমাকে বলা যায় না, শালা দীনু আমার কিছু গুপ্ত কথাও জানে। আমার বড় খারাপ সময় পড়েছে।

পানু আতঙ্কিত হয়ে বলল, তা আমার কাছে কেন ? আমি কী করব ?

বলছিলুম কি এ সময়টায় তুমি যদি তোমার ভাগেরটা না ছাড়ো তাহলে দীনু শালা মুশকিলে পড়বে।

ও বাবা, সাতদিন সময় দিয়েছে। তার মধ্যে লেখাপড়া না করে দিলে ঘাড় নামিয়ে দেবে।

বলো কী, তোমাকেও ধরেছিল এর মধ্যে ? তুমি যে আমার দাদা তা তো তার জানার কথা নয় !

পানু বলল, জেনেছে। তাছাড়া আমাকে তো বলল আমি গিয়ে নাকি তোকে ভাগের জন্য ভয় দেখিয়েছি।

কানু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। বলল, সব্বনাশ। আমার ভরসা তো ছিলে তুমি। এখন তুমিও যদি লিখে দাও তাহলে তো দীনু শালা আমার ঘাড় ধরে আদায় করে নেবে। তোমার কথা গেয়ে একটু ভজঘট পাকানোর তালে ছিলুম যে।

পানু একটু ভাবল। তারপর হালছাড়া গলায় বলল, তা আর কী করা যাবে ! প্রাণটা তো আগে ! শুনেছি গুণ্ডোটা মেলা খুন-খারাবি করেছে।

তা করেছে।

ওরকম লোকের সঙ্গে কি লাগা ভাল ?

কানু এ কথাটার জবাব দিল না। উবু হয়ে বসে চাদরের খুঁটে চোখ মুছল। বেশ কাহিল দেখাচ্ছিল তাকে। গরগরানিটাও আর নেই। দায় পড়লে মানুষের স্বভাব ভাল হয়ে পড়ে। কানুকেও কেমন যেন ভালমানুষের মতো দেখাচ্ছে। কেঁদেকেটে চোখ লাল করে ফেলল কানু। তারপর মুখ তুলে ধরা গলায় বলল, মায়ের দিব্যি কেটে বলছি দাদা, যদি দীনু গুণ্ডাকে ঠেকাতে পারো তবে জমি বেচে যা পাবো অর্ধেক তোমার। এখনই সাত হাজার করে কাঠার দর উঠছে। আমাদের জমির পাশ দিয়ে রাস্তা হচ্ছে বলে দর আরও বেশি !

সত্যরাম বলছিল কাঠা নাকি দশ হাজার।

আর ছ মাস পরে তাই হবে। যদি ততদিন ধরে রাখা যায়।

পানু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল।

বাঁশবনের ভিতরে কুয়াশা আর অন্ধকারে একটু শব্দ উঠল। কে যেন সাবধানী পায়ে আসছে বা যাচ্ছে। বাঁশপাতায় খড়মড় শব্দ উঠছে।

কানু সপাৎ করে উঠে দাঁড়াল।

পানু বলল, কে ?

কে যেন দৌড়ে পালাচ্ছে ওধারে।

কানু সভয়ে বলল, কে গো দাদা ?

পানু মাথা নেড়ে বলল, বুঝতে পারছি না। আবছা মনে হল একটা মেয়েছেলে। দাঁড়া, দেখছি।

আমি আর দাঁড়াব না। ফিরতে দেরি হয়ে যাবে তার ওপর দীনু শালা দেখতে পেলে বিপদ ঘটাবে। কাল পরশু একবার আসবখন।

কানু চলে গেল।

পানু বাঁশবনের ভিতরে একটু চেয়ে রইল। মরা আলোর ঝুঁঝকো মায়ার ভিতর সে একটা খয়েরি ডুরে শাড়ির আভাস দেখেছে। মেয়েছেলেটা দৌড়ে বেশি দূর যায়নি। কথা শুনছিল আড়ি পেতে। কথা যে শেষ হয়েছে তা জানে না। ফের আসবে।

পানু সন্তর্পণে এগোলো। মস্ত একটা শিমুল গাছ আছে ভিতরবাগে। তার যতদূর ধারণা, ওখানে গা-ঢাকা দিয়েছে।

পানু তাড়াহুড়ো করল না। বরং বেশ গুনগুন করে রামপ্রসাদী ভাঁজতে ভাঁজতে শুঁড়িপথটা ধরে দুলকি চালে এগোলো। শিমুল গাছটার ডান ধার বরাবর হয়ে আচমকা গোঁত্তা মেরে ঢুকে গেল বাঁশবনে। তারপর একদম মুখোমুখি।

মেয়েটা নড়ারও সময় পেলে না। একটু হাঁফাচ্ছিল।

তুমি! অ্যাঁ! তুমি তো দাক্ষী!

বছর সতেরো আঠেরোর মেয়েটা সভয়ে চেয়ে রইল পানুর দিকে।

এখানে কী করছিলে শুনি?

দাক্ষী হাঁফসানো গলায় বলে, কী করব, নিজের ইচ্ছেয় এসেছি নাকি?

তবে?

তোমরা সবাই যাকে ভয় খাও সেই দীনুই তো ধরে এনেছে আমাকে।

ধরে এনেছে মানে?

মানে চুলের মুঠি ধরেই এক রকম টেনে বের করে এনেছে। আমার বাবার পেটে লাথি মেরেছিল। কী জানি কেমন আছে বাপটা। ভাইয়ের টি. বি বলে বাবা টাকা নিয়েছিল। ধার। শোধ হয়নি।

বটে! তা এখানে কী করছিলে?

রাক্ষসটা যে আমাকে এ বাড়িতে রেখেছে চারদিকে নজর রাখবার জন্য। কোথায় টাকাপয়সা-গয়নাগাঁটি, কে কেমন, এসব খবর নিতে। আজ সকালে ডেকে পাঠিয়ে তোমার ওপর নজর রাখতে বলল।

ক্কেন? ক্কেন?

তোমার কাছে কেউ আসে কিনা, কী কথা হয় সব খবর দিতে বলেছে। নইলে তো বুঝতেই পারছ।

পানু ভয়ে এবং শীতে কাঁপছিল। রীতিমতো হি-হি কাঁপুনি। কাঁপা গলাতেই বলল, বড্ড শীত করছে।

আমারও।

তা তোমাকে ধরে এনে ও কী করতে চায়?

মেয়েটা করুণ গলায় বলল, এখনও খারাপ কিছু করেনি। তবে কপালে যা আছে হবে। খারাপই হবে। হয়তো নিজে কিছুদিন কাছে রাখবে, তারপর গোহাটার গরুর মতো বেচে দেবে। বাজারের মেয়ে হওয়া ছাড়া ভগবান আর আমার কপালে কী লিখেছেন?

ও বাবা !

শোনো। সাঁপুই গাঁ চেনো ?

চিনি। কাছেই।

সেখানে গোপাল দাসের বাড়ি। আমার বাবা। কেমন আছে আমার বাপটা একটু খবর এনে দেবে ? পেটে লাথিটা লেগে বড় কাতরাচ্ছিল।

তা দেখবখন চেষ্টা করে।

যদি এনে দাও খবরটা তা হলে আজকের কথা আমি গুণ্ডাটাকে বলব না বুঝলে ?

বুঝেছি।

পানুর মতো এ মেয়েটাও কাঁদল। বড় বড় চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল। কাঁদতে কাঁদতে ধরা গলায় বলল, আমি তো গেছিই, নিজের জন্য আর ভাবছি না। বাপটা ভাইটার কী যে হবে !

পানু মৃদু স্বরে বলল, হিম পড়ছে। ঘরে যাও। বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে লোকে নানারকম সন্দেহ করতে পারে। যাও।

যাচ্ছি।

মেয়েটা চলে গেলে বাঁশবনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পানু। হাত-পায়ের কাঁপুনি কমেছে, কিন্তু ভয়টা তার শরীরকে একেবারে কাঠ করে রেখেছে। কিছুক্ষণ পানু নড়তে পারল না।

বাঁশবনের ভিতর দিয়ে কারা আসছে। টর্চ জ্বলছে মাঝে মাঝে। কথা কইছে। যতীনবাবু হবে না। যতীনবাবু তো গেছেন হাওয়া গাড়ি চেপে। ত্যাইতেই ফিরবেন।

পানু কয়েক পা এগোলো। তারপর দাঁড়িয়ে গেল। যতীনবাবুই। সঙ্গে বিভীষণ দীনু পাইক এবং আরও কজন। জমিজমা বিষয়-আশয়ের কথাই হচ্ছে।

পানু আর এগোলো না। দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফিরে এল ঘরে।

ঘটনাটা ঘটল একটু বেশি রাতে। খেতে যাবে বলে ছয় চাকর তৈরি হচ্ছে। পাঁচু গাড়ু নিয়ে মাঠে গেছে। শ্রীপতি রান্নাঘর সেরে এসে হাতমুখ ধুচ্ছে। কেষ্ট টেমির আলোয় গোপালভাঁড় পড়ে শোনাচ্ছে সবাইকে ! বেশ একটা ফূর্তির ভাব।

হঠাৎ দীনু এসে ঘরে ঢুকল। বিশাল চেহারাখানা যেন ঘর ভরে দাঁড়াল।

পানুর দিকে রক্ত জল করা চোখে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, কে এসেছিল তোর কাছে?

পানু থতমত খেয়ে বলল, কই!

জিব টেনে বের করে দেবো। কে এসেছিল?

পানুর মাথাটা টাল খেল। দাক্ষীই কি বলে দিল শেষে? কথা দিয়েছিল বলবে না।

পানু মাটির দিকে চেয়ে বলল, কানু।

বটে! পরামর্শ হল ভাইয়ের সঙ্গে?

হঠাৎ পানু একটু হাসল, বলল, দু ভাইয়ে ঠিক করলুম জমিটা আমরা হাতছাড়া করছি না।

বটে! বলে একটা বাঘা গর্জন ছাড়ল দীনু।

পানু চমকাল না। উঠে দাঁড়াল। দাক্ষী কথা রাখেনি। সেইটে তার মনে বড় বাজছে। খিদেটা পেট থেকে খাঁ খাঁ করে উঠে আসছে বুকে। মনে পড়ছে, পারুল তাকে বিয়ে করবে না বলে সটকে পড়েছিল কার সঙ্গে। সব মিলেমিশে আজ পানুর মাথাটা বড় গোলমাল।

সে একেবারে সমানে সমানে দীনুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, তুমি বড় বেচাল লোক হে। বড় পাপী। খুন করো, মেয়েমানুষকে ধরে আনো, লোকের জমিজমা কেড়ে নাও....

কথাটা শেষ হল না। দীনু একখানা থাপ্পড় তুলল। একেবারে আকাশসমান উঁচু।

পানু যতীনবাবুর বাড়ির বড় বড় মশারি আর কাপড় কাচে, খড় কুচোয়, ঘন্টার পর ঘন্টা কলপাড়ের শ্যাওলা তোলে, জন্মের শোধ ভাতের পাহাড় সাঁদ করায় ভিতরে। তার হাত পা পাকিয়ে দড়ির মতো হয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু ভারী পোক্ত শরীর। শীতে গ্রীষ্মে রোদে জলে একেবারে সই। কোদাল কুড়ুলে তার চমৎকার হাত। মাঝারি মাপের পাটের দড়ি কতবার দায়ের অভাবে টেনে ছিঁড়েছে।

দীনুর চড়টা নামবার আগেই থাবড়াটা পানু কষাল।

সে এমন থাবড়া যা আর কহতব্য নয়।

দীনু পাইক চড়টা নিরীহভাবে নামিয়ে নিজের গালে হাত বোলাতে লাগল অবাক হয়ে। মুখে কথা নেই, এত অবাক।

পানু সামনে দাঁড়িয়েই রইল। বলল, আমরা বাবুর পেয়ারের

চাকর নই, বুঝলে? খেটে খাই। আমাদের প্রাণের ভয় থাকলে চলে না।

দীনু দাঁতে দাঁত ঘসটাল। তারপর পটাং করে গায়ের গরম চাদরখানা খুলে ফেলে দিয়ে দুটো মুগুরের মতো হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল পানুকে।

তারপর কী থেকে যে কী হল তা পানু বলতে পারবে না। কিন্তু লড়াইটা বেশিক্ষণ চলেনি। এক সময়ে সে দেখলো, দেখে খুবই অবাক হল যে, সে অর্থাৎ পানু, দীনু পাইককে উপুড় করে ফেলে তার চুলের ঝুঁটি ধরে মাথাটা চৌকাঠে ঠুকছে আর বলছে, মর, মর, মরে যা।

শ্রীপতি পাঁচুরা এসে না ছাড়ালে দীনুকে মরতেই হত।

তবে মরার চেয়ে খুব কম হল না। দীনুকে গো-গাড়িতে তিন মাইল দূরের হাসপাতালে পাঠাতে হল রাত্রেই।

চাকরি যাবে। জেলও খাটতে হবে। সবই জানে পানু। ঘরে বসে সে বুটের শব্দের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার চারদিকে পাঁচ-জন বাইরের চাকর। মুখ গম্ভীর, কথা নেই।

ঠিক এই সময়ে সত্যরামকে সঙ্গে নিয়ে যতীনবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন।

তটস্থ হয়ে সকলে উঠে দাঁড়াল।

যতীনবাবুর মুখখানা গম্ভীর। সকলের দিকে একে একে চেয়ে দেখে সত্যরামকে জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কোনজন?

আজ্ঞে এই যে। বলে সত্যরাম তাড়াতাড়ি পানুকে দেখিয়ে দিল।

যতীনবাবু কাশ্মীরী শালের ভিতর থেকে তাঁর ডান হাতখানা বের করলেন। ঘরে হ্যারিকেনের আলো, তা সে আলোতেও হীরের আংটি ঝিকিয়ে উঠল। আর কী ফর্সা হাত। সেই হাতে নিজের থুতনিটা খামোখা একটু চুলকোলেন যতীনবাবু। তারপর বললেন, ও। তারপর চারদিকটায় ঘুম-ঘুম চোখে একটু তাকিয়ে নিয়ে সত্যরামের দিকে চেয়ে বললেন, এ ঘরটায় একটা বিশ্রী গন্ধ, তাই না?

সত্যরাম বিনয়ের গলায় বলল, আজ্ঞে। ছোটলোকদের ঘর তো—

যতীনবাবু তাঁর হীরের ঝলকানি তুলে এবার গলা চুলকোলেন। তারপর বললেন, আজ বড় ঠাণ্ডা, তাই না সত্যরাম?

আজ্ঞে, বেজায়।

যতীনবাবু যেন কথা খুঁজে পাচ্ছেন না এমনভাবে চারদিকে

চাইতে লাগলেন। ঘরখানাই যেন দেখছেন। সামনে ছজন বশংবদ চাকর বাক্যহারা হয়ে দাঁড়িয়ে।

যতীনবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, সত্যরাম, ওর নাম কী?

আজ্ঞে পানু। এমনিতে খারাপ নয়। কাজ ভালই করে। বিশ্বাসী।

কতদিন আমার কাজ করছে?

আজ্ঞে তা বছর পাঁচেক হবে বোধহয়?

যতীনবাবু একটু কাশলেন। এই সব হীন চাকরদের সঙ্গে তিনি কখনও কথা বলেননি। কিভাবে বলবেন তা বোধহয় ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাই অসহায়ের মতো সত্যরামের দিকে চেয়ে বললেন, ওর কি আমাকে কিছু বলার আছে সত্যরাম? ও কথা বলছে না কেন?

সত্যরাম শশব্যস্তে বলল, বলবে আবার কী আজ্ঞে? কথাটথা তো বিশেষ বলতে শেখেনি। ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় খায়। ওরে ও পানু, বাবুকে কিছু বলবি?

পানু মাথা নাড়ল। তার কিছু বলার নেই।

ও কত মাইনে পায় সত্যরাম?

আজ্ঞে, আশি টাকা। এ বাজারে কম নয়। খাসও মেলা। হরে-দরে পাঁচ সাত শোই পড়ে যায় আজ্ঞে।

যতীনবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরের চালের দিকে চেয়ে বললেন, পুলিস অবশ্য আসবে। ও পুলিসকে কী বলবে সত্যরাম?

সত্যরাম শশব্যস্তে পানুর দিকে চেয়ে বলল, ওরে ও ডাকাত, বাবুর কথাটা কানে গেছে না কি?

পানু মাথা নাড়ল। গেছে।

একটা কিছু বলবি তো!

পানু মেঝের দিকে চেয়ে রইল। কথা বলল না।

যতীনবাবু একটা হাই তুলবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। বাতাসটা কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। তিনি কানের ফুটোয় আঙুল দিয়ে একটু নাড়া দিলেন। তারপর পানুর দিকে চেয়ে বললেন, আমার বড় বিপদ হে।

পানুর সঙ্গে মনিবের এই প্রথম চোখাচোখি। পানুর অবশ্য ভয়-ডর কেটে গেছে। ভক্তিমান্যির ভাবটাও আর নেই। তবে যতীন-বাবুর ভয়টা কিসের তা সে ভাল বুঝতে পারল না।

যতীনবাবু তাঁর নাকের ডগাটা চেপে ধরলেন একটু। তারপর

বললেন, পুলিস অনেক কথা জানতে চাইবে বাপু। দীনু যে আমার চাকর ছিল সে কথাটা ওদের বলা ঠিক হবে না। ওর নামে হুলিয়া আছে। তা, ইয়ে. আমি বলছিলুম কি তোমাকে আমি আমার পাইক করে নিচ্ছি। তিনশো টাকা—কী বলিস রে সত্যরাম, তিনশো কি কম হচ্ছে?

আজ্ঞে না।

আর অন্য সবাইকেও বিশ টাকা করে বাড়িয়ে দিস।

যে আজ্ঞে।

যতীনবাবু পানুর দিকে চেয়ে বললেন, তোমাকে আমি দেখব। তুমিও একটু আমাকে দেখো। পুলিশ জিজ্ঞেস করলে বোলো দীনুকে এ বাড়িতে কখনও দেখনি। ও ডাকাতি করতে ঢুকেছিল, তুমি রুখেছো। মনে থাকবে কথাটা।

পানু জবাব দিল না। চেয়ে রইল।

যতীনবাবু আঙুলের হীরের ঝলমলানি তুলে কপাল থেকে একটা মশা তাড়ালেন। কাহিল গলায় বললেন, বটকেষ্ট বলেছিল, দীনুর হাতে কবচ আছে, যমেও নাকি ওর সঙ্গে এঁটে ওঠে না। তা দেখছি তুমি যমের ওপর দিয়ে যাও। আমিও একটু শক্তপোক্ত লোক খুঁজছি। সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। টাকাপয়সা নিয়ে চলাফেরার বড় বিপদ আজকাল।

জীবনে প্রথম মনিবের সঙ্গে বলল কথা পানু। কিন্তু যেমনটি বলার কথা তেমনটি তার মুখ দিয়ে বেরোলো না। পেট থেকে যেন আপনা আপনিই বেরিয়ে এল, আজ্ঞে, বাবুমশাই,চাকর হয়ে আর থাকা চলে না।

যতীনবাবু ভারী অবাক। কেন?

আজ্ঞে, চাকর হয়ে থাকলে নিজেকে ঠিকমতো চেনা যায় না কিনা।

যতীনবাবু একটু অপ্রস্তুত। হীরেসুদ্ধ হাতটা শালে চাপা দিয়ে বললেন, তোমার বোধহয় খুব অযত্ন হয়েছে এ বাড়িতে?

আজ্ঞে তাতে ভালই হয়েছে। ভগবান ভালই করেন। তবে আমার আর চাকর হয়ে থাকতে ইচ্ছে যাচ্ছে না। আমি বাড়ি যাবো।

যতীনবাবুর ফর্সা মুখটা একটু লাল হল। সত্যরামের দিকে চেয়ে বললেন; ওকে পাঁচশো করেই দিস রে সত্যরাম। আর চাকরের মতো নয়, বাড়ির ছেলের মতোই থাকবে।

যে আজ্ঞে।

পানু একটু হাসল, তারপর চাকরের পক্ষে বেমানান গলায় বলল, আজ্ঞে না বাবুমশাই। আপনার অনেক নুন খেয়েছি। পুলিসকে যা বলার বলবখন। ও নিয়ে ভাববেন না। আমার কিছু টাকা জমেছে। দেশে গিয়ে ঘর তুলব। দু ভাইয়ে থাকব।

যতীনবাবুর হীরে আবার চমকাল। উনি হাঁটু চুলকোলেন।

পানু বলল, টাকাপয়সা নয় বাবুমশাই, তবে একটা জিনিস চাই। দাক্ষী যদি রাজি থাকে তবে ওকে নিয়ে যাবো। বে করব।

যতীনবাবু অবাক হয়ে সত্যরামের দিকে তাকালেন, দাক্ষী কে?

নতুন একটা ঝি আজ্ঞে। ভারী কাঁদুনে। সারাদিন কাঁদে।

যতীনবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, একে বিয়ে করতে রাজি হবে?

খুব হবে আজ্ঞে। ওর বাপ রাজি হবে।

ভোরবেলা কুয়াশায় মাখা ক্ষেতের ভিতর দিয়ে আগুপিছু দুটি প্রাণী এগিয়ে চলেছে। দুজনেরই বগলে পুঁটুলি।

মাঝে মাঝে ফিরে চাইছিল পানু। ছুঁড়িটা পিছিয়ে পড়ছে বারবার।

দাক্ষী চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল লজ্জায়। মরণ! গুণ্ডাটা তাকাচ্ছে দেখ, যেন গিলে খাবে।

দুজনেরই আজ মনে হচ্ছে, আকাশটা কত বড়। পৃথিবীটা কী বিশাল! আর বেঁচে থাকাটা কত ভাল!

মুনিয়ার চারদিক

এক

লেবুগাছের গোড়া থেকে মুখ তুলল কালো একটা সাপ। মুখ তুলে সে একটা অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য দেখল। শীতের কুয়াশায় আবছা সকাল, রোদ এখনো নিস্তেজ সোনালি। সেই সুন্দর আলোয় ডালিম গাছের ডগায় একটি ছোট্ট ফলের দিকে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুনিয়া। দু পায়ের আঙুলের ওপর ভর, দেহটি টান, উৎকণ্ঠ মুখটি ওপরে তোলা, দু কাঁধে এলো চুল ভেঙে পড়েছে। তার সোনালি ফ্রক, নীল একটি সালোয়ার, পায়ে চপ্পল, মাথায় ডালিমপাতা খসে পড়েছে, পায়ে শিশির আর কুটোকাটা। বড় সুন্দর সকালটি, মেয়েটি সুন্দর, যেমন সুন্দর আলো—সাপটা দেখল। কিন্তু শীত-বাতাসে তার শরীর অসাড় হয়ে আসে, কেঁপে উঠে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। লেবুগাছের গোড়ায় তার গর্তের দিকে এগোয়। তার শরীর পাকে খুলে দীর্ঘ হয়ে যেতে থাকে। এত দীর্ঘ হয় যে তা প্রায় ডালিম গাছের গোড়া পর্যন্ত চলে যায়, যেখানে মুনিয়ার গোড়ালি।

বাঁ হাতে একটি ডাল টেনে নামায় মুনিয়া। সে ডালটার টানে গাছটা ঝুঁকে আসে। ডান হাতে বড় ডালটা ধরে মুনিয়া। ক্রমে ছোট্ট ডালিমটা নাগালে আসে। মুনিয়া ছিঁড়ে নেয় ফলটা! দাঁতে ঠোঁট টিপে সুন্দর হাসে। শ্বাস ফেলে। তারপর গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। হাতে ডালিম ফল, তাতে কয়েকটা লাগচে সবুজ পাতা।

তীব্র ব্যথায় কালো সাপ তার মুখখানা ফিরিয়ে দেখে। সেই সুন্দর আলো, সুন্দর মেয়েটি। কালো সাপ মুখ ফিরিয়ে নেয়। শ্বাস ফেলে। শরীর টেনে নিয়ে চলে যেতে চায় উষ্ণ গর্তটিতে। সে ব্যথা ভুলবার চেষ্টা করে, সুন্দর শীতের বেলাটিকে দেখে।

মুনিয়া কিছুই টের পায় না। সুন্দর শিশিরে ভেজা ডালিমটা তার হাতে। সে বড় অন্যমনস্ক। ফুটফুটে চপ্পল-পরা পা বাড়িয়ে সে এক পা এগোয়।

ব্যথায় নীল হয়ে যায় কালো সাপ। তার দীর্ঘ দেহের কোন উৎস থেকে অন্ধকারের স্রোতের মত তীব্র রাগ ছুটে আসে, আসে হিংসা,

ভয়। শীত ভুলে সে তার শরীর তুলে দোল খায়। তারপর সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চলে যাওয়ার সময় সে ভিক্ষুকের মতো রিক্ত বোধ করে। মুনিয়ার কাছে, সুন্দর শীতের বেলাটির কাছে।

মুনিয়া প্রথমে ভারী অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখে। এত অপ্রত্যাশিত, এত অদ্ভুত। কালো সাপটা তার পায়ের ওপর দিয়ে ছলকে সরে যায় এক ঝলক ছোট ঢেউয়ের জল যেন। তার ফুটফুটে সাদা পায়ের পাতায় দুটি ছুঁচের মুখের মতো লাল ফোঁটা ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। সমস্ত শরীর ঝিন্‌ঝিন্‌ করে, শরীরের ভিতরে বিদ্যুতের মতো চমকায়।

একটু সময় লাগে বুঝতে। তারপর বোঝে মুনিয়া।

—মা—গো—ও—

খুব ভোরবেলায় উঠে পরাগ অনেকটা দৌড়ায়। পায়ে কেড্‌স্‌, গায়ে গরম জামা, পরনে খাটো প্যান্ট। দৌড়ে এসে সে খানিকটা জিরোয়। তারপর খোলা ছাদে উঠে আসে। অনেকগুলো বেন্ডিং করে, পা তুলে লাফায়, হাজার স্কিপিং করে। করতে করতে ন'টা বেজে যায়। শীতের বেলা, তাই বেলা বোঝা যায় না। কুয়াশায় জড়ানো রোদে সোনালি রঙ লেগে থাকে, ভোরের মতো। এ বছর সে একটা বড় টিমে ফুটবল খেলবে—এই কথা ভাবতে ভাবতে পরাগ তার শরীরে আর মনে এক রকমের উষ্ণ আনন্দ বোধ করে। তার পোষা চন্দনা পাখিটিকে কাঁধে নিয়ে সে ব্যায়ামের শেষে সারা ছাদে ঘুরে বেড়ায়। হাতে মুঠো ভর্তি ভেজা ছোলা, আর আদার কুচি। সে খায়, খায় তার পাখিটা একই মুঠো থেকে। পাখিটা তার আঙুল কামড়ে ধরে। পা দিয়ে তার মুঠো খুলবার চেষ্টা করে। পরাগ হাসে, পাখির মোলায়েম গায়ে তার কিশোর গাল ঘষে দেয়। পাখি তার পায়ের থাবায় পরাগের হাতের আঙুল জড়িয়ে দোল খায়।

এ সময়ে প্রতিদিনই ছাদের দক্ষিণের রেলিঙ দিয়ে ঝুঁকলে সে মুনিয়াদের বাগান দেখতে পায়। মুনিয়াদের বাগানে গাছপালা ঘন, সবুজ। মুনিয়া বাগানে ঘোরে। ফুল তোলে, পেয়ারা পাড়ে, কখনো সখনো পরাগদের ছাদের দিকে তাকায়। পরাগ তার পাখিকে আদর করতে করতে মুনিয়াদের বাগানে রোজ সকালে মুনিয়াকে দেখতে ভালবাসে।

আজও দেখছিল। সোনালি ফ্রক পরনে, আর নীল সালোয়ার,

গলায় নরম সাদা একটা মাফলার—মুনিয়া এই বেশে ডালিমের উঁচু ডাল থেকে ডালিম পাড়ছে।

পাখিটা তার মুঠো খুলবার চেষ্টা করছে, হাতের আঙুল দিয়ে একটা ছোলা ফেলে দিল পরাগ। পাখিটা লাফিয়ে নামল। মুনিয়ার টান শরীরখান। ধীরে ধীরে ডালিমের নাগাল পাচ্ছে—এই দৃশ্য কুয়াশা ভেদ করে আগ্রহভরে দেখছিল পরাগ। দেখছিল, কেমন সুন্দর সাদা হাতে পাতাসুদ্ধু ডালিমটা ছিঁড়ে আনল মুনিয়া। সে ঝুঁকে বলতে যাচ্ছিল—মুনিয়া, কী রে?

ঠিক সে সময়ে কালো বিদ্যুৎ স্পর্শ করল মুনিয়াকে। পরাগ কুয়াশায় কিছু দেখেনি। শুধু দেখল, মুনিয়া উবু হয়ে বসে পা চেপে ধরেছে, ডাকছে—মা গো—

পরাগ তার মুঠো খুলে ভেজা ছোলা ছড়িয়ে দিল, ভুলে গেল তার প্রিয় পাখিটিকে। সে দৌড়ে ছাদের দরজা দিয়ে সিঁড়িতে নামল। পাখিটিও শুনেছিল মুনিয়ার সর্বনাশের ডাক। তবু নির্বিকার লাফিয়ে ঘুরতে লাগল গড়ানো ছোলার ওপর। ঘুরতে লাগল, আর আনন্দে পাখা ঝাপ্টে চিৎকার করতে লাগল।

দীর্ঘদিন লক-আউটের পর কারখানা খুলেছে। খুলবার আশা ছিলই না প্রায়। একবার শোনা গিয়েছিল, মালিক কারখানা তুলে নিয়ে যাচ্ছে গুজরাটে। আর একবার শোনা গেল, কারখানা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিনই সুবিনয় ভোরবেলা এসেছে কারখানায়। দূর থেকে দেখতে পেত কারখানার গেট-এর সামনে নীরব মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে পতাকা, ফেস্টুন, বুকে ব্যাজ, কিন্তু মুখে নিরাশা। কারখানার দেয়াল জুড়ে দাবিপত্র। প্রতিদিন একই দৃশ্য। নীরবে প্রতিটি ভোরে কারখানার সামনে সেই নিরাশ্যপীড়িত জমায়েতের মুখোমুখি দাঁড়াত সুবিনয়। মাঝে মাঝে তারও মন কেমন ডুবজলে নেমে যেত। বুকটা গ্রীষ্মের প্রান্তরের মতো শূন্য লাগত, তবু তারই মুখ চেয়ে এতজন শ্রমিক—সে এদের নেতা—এই বোধ সর্বক্ষণ তাকে উস্কে রেখেছে। পূর্ব এশিয়ার মুক্তি আনছেন কার্ল মার্কস। আরো কত লড়াই পড়ে আছে। এ তো সামান্য একটা কারখানার কয়েকজন শ্রমিক, আর লড়াইটাও ছোটো—যার কথা খবরের কাগজে খুব ছোটো হরফে বেরোয়। এই সব ভেবে সুবিনয় মনের জোর ফিরিয়ে আনত।

যদি সত্যিই কারখানা গুজরাটে চলে যেত, কিংবা হত হাতবদল? সে অবস্থার কথাও ভেবে রেখেছিল সুবিনয়। রমলার সেলাই-ফোঁড়াই-য়ের হাত ভাল, তাকে একটা সেলাই-মেশিন কিনে দিত সে। মুনিয়াকে ইস্কুল ছাড়িয়ে আনত। আর তার অবশ্য একটু পুরোনো এল-এম-ই ডিপ্লোমা আছে—কিন্তু সে মার্কামারা লোক বলে এবং কারখানাগুলির অবস্থা ভাল না বলে কিছুতেই চাকরি পেত না—ফলে সে হয়ে যেত পার্টির হোলটাইমার। বাড়িটা তার নিজের। পাকিস্তান হওয়ার পর বাবা সেখানকার সম্পত্তির সঙ্গে বদল করে বাড়িটা পেয়েছিলেন। অনেকটা জমি, বাগান। বাড়িটা বরাবরই তাকে পার্টির হোলটাইমার হতে এক ধরনের জোর দিয়েছে।

কিন্তু অতটা কিছু হয়নি। কারখানা খুলেছে। সুবিনয় লড়াইটা জেতেনি। শ্রমিকেরা দু'দলে ভাগ হয়ে মারামারি শুরু করে। অবস্থাটা সামলে দেওয়া যায়নি। মালিক সুযোগ বুঝে তাদের ডেকে কয়েকটা এলোমেলো শর্ত মেনে নিল, 'আপনারাই তো জিতলেন' এরকম একখানা ভাব করল। সেই ভাবটা বজায় রাখতে হল সুবিনয়দেরও।

অবশেষে কারখানা খুলেছে।

ইন্সপেক্শন ডিপার্টমেন্টের ঘরটির দুই দিক কেবল কাচের আবরণ। আলোয় টৈ-টুম্বুর ঘর। বাইরে এখনো সকালের কুয়াশার আবছায়া, রোদ রাঙা। সেই রাঙা রোদে ঘরে একটা আনন্দিত উৎসবের আভা। সুবিনয় খুব মন দিয়ে একটা যন্ত্রাংশের মাপ নিচ্ছিল। টেবিলে এক পাশে একটা গরম চায়ের কাপ। হাতের কাজটি নামিয়ে রেখে সে চায়ে চুমুক দেয়। অসম্ভব সুন্দর সকালবেলাটিকে দেখে। এই সব সুন্দর দৃশ্য দেখলে তার কেবলই মুক্তি পেতে ইচ্ছে করে। মানুষের জন্য মস্ত লড়াই পড়ে আছে এশিয়া জুড়ে, আর সে পড়ে আছে কোন কোণে। তার শোয়ার ঘরে মাথার কাছে আছে কার্ল মার্কসের একখানা ছবি। স্মিত মুখ; তৃপ্ত, আত্মবিশ্বাসী। যতবার সেই মুখ মনে পড়ে ততবার সুবিনয় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মনে হয়, এ ঠিক জীবন নয়, অন্যতর এক জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্য। পূর্ব এশিয়ার যোজন জুড়ে শকুনের ডানার ছায়া। মুক্তি আনবেন কার্ল-মার্কস। কাচের স্বচ্ছ আবরণের ওপাশে কুয়াশায় জড়ানো রোদ, সুন্দর সকাল, সুবিনয় অন্য মনে চেয়ে থাকে, চায়ে চুমুক দেয়।

—সুবিনয় চৌধুরী—ইন্সপেক্শনের সুবিনয় চৌধুরী—আপনার

ফোন—ওয়ার্কস ম্যানেজারের ঘরে—শিগগির যান—

ডিপার্টমেণ্টের ফোনটা খারাপ হয়ে আছে কাল থেকে। ঝামেলা। কথায় কথায় ওয়ার্কস ম্যানেজারের ঘরে যাওয়া সুবিনয় পছন্দ করে না। লোকটা শত্রুপক্ষের। যদিও সুবিনয়ের এই চাকরি পাওয়ার পিছনে লাকটার হাত ছিল এক সময়ে। কিন্তু এখন দেখা হলেই ভ্রূ কোঁচকায়, মুখ ফিরিয়ে নেয়। আগে 'সুবিনয়' বলে ডাকত, এখন ডাকবার নিতান্ত দরকার পড়লে 'মিস্টার চৌধুরী' বলে ডাকে।

ওয়ার্কস ম্যানেজারের মুখে আজ একটু ভাবান্তর ছিল। ভ্রূ কোঁচকানোই ছিল, তবে সেটা বিরক্তিতে নয় দুশ্চিন্তায়। সুবিনয়কে ফোনটা এগিয়ে দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বলল—দেখুন।

একটা অনিশ্চিত উৎকণ্ঠ গলা আক্রমণ করে তাকে—কে! সুবিনয় চৌধুরী? আমি—আমি পরাগ বলছি কাকাবাবু—

—পরাগ! ভারী অবাক হয় সুবিনয়—কে পরাগ?

—আমি সান্যালদের বাড়ির পরাগ—আপনাদের পাশের বাড়ি—

—ওঃ। কী ব্যাপার?

—একবার শিগগির আসুন—

কেমন একটু অনিশ্চয় লাগে সুবিনয়ের, পা দুটো কাঁপে, বুক কাঁপে, গলাটা ঠিক নিজের গলার মতো শোনায় না,—ওঃ কী হয়েছে!—অ্যাঁ, কী ব্যাপার?

—তেমন সিরিয়াস কিছু না, ছোটখাটো একটা অ্যাকসিডেণ্ট—

—কার?

—মুনিয়ার।

ফোনটা অন্যমনস্ক সুবিনয় ক্র্যাডলে না রেখে টেবিলের ওপর রাখতে যাচ্ছিল, ওয়ার্কস ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে নিলেন, বললেন—চলে যান। আমি ছুটির ব্যবস্থা করছি।

বড় অসহায় বোধ করে সুবিনয়, কয়েক পলকের জন্য ওয়ার্কস ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু লোকটিকে ঠিক চিনতে পারে না।

শীতের বেলা পড়ে এল। বড় ঝিলের ওপরে সূর্য ডুবছে। সি-সি-আর-এর রেল-লাইনের পাথরে গাঁইতি চালিয়ে ক্লান্ত দুটি লোক উঁচু

রেলপথের ধারে ঘাসের ঢালু জমিতে একটু জিরোতে বসে। বিড়ি ধরায়। আকাশে কাচ কোদালে মেঘের রক্তিম খণ্ডগুলির দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে। পশ্চিমের দিগন্ত জুড়ে এক নিস্তব্দ বিশাল রক্তারক্তি কাণ্ড। তারা দুজন খোলা প্রকৃতির রোদ কিংবা বর্ষার বিস্তর দৃশ্য দেখেছে। তাই অবাক হয় না, মুগ্ধও না। কেবল কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নেয়। সি-সি-আর-এর উঁচু রেল-বাঁধের তলায় নিশ্চিন্দার রাস্তা বেয়ে একটা রিকশা ধীর গতিতে চলে যাচ্ছে। লোক দুটির একজন থুথু ফেলে বলে—ঐ দেখ, হামিদ ডাক্তার চলেছে।

—আঁ। অন্যজন বলে।

—গত বছর খুব বাঁচিয়েছিল মোকে, বুইলে ?

যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তারা নীরবে রিকশাটাকে লক্ষ করে। ধীরে ধীরে রিকশাটা দৃষ্টির বাইরে যায়।

তখন একজন অন্যজনকে বলে—বুইলে, গত বছর বোশেখের ঝড়ে মোদের দক্ষিণের আমবাগানে আম পড়েছিল মেলাই। মাঝরাতে উঠে দৌড়ে গেনু। অন্ধকারে তাল ঠাহর হয় না, হাতড়ে হাতড়ে তুলছি কোঁচড়ে, একটা কামড় বসাইতেই জিবটা একটু চিন্‌চিন্‌ করলো। তেমন কিছু বুইতে পারিনি তখনো। দু চার কামড় খেতেই পেটে গোতলান, মুখে লোল, সারা শরীরে জ্বালা-জ্বালা। ঘণ্টাটেকের মধ্যেই মুখে গাঁজলা উঠে এল। রাত না পোয়াতে জি-টি রোডের এক লরি ধরে মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল. তা সেখানেও জবাব দিয়ে দিলে, বললে—এ তো বিষক্রিয়া, চিকিচ্ছের বাইরে গেছে। হাসপাতালেই মরি আর কী। এ সময়ে তো আর চৈতন্য ছিল না, পরে শুনেছি। আমার বাপ-ভাই বাইরের ফুটপাতে বসে কাঁদছে, একজন পথ-চলতি লোক দাঁড়িয়ে সব শুনে-টুনে বলল, মরবেই যখন তখন একবার হামিদকে দেখিয়ে মরুক। দূর তো নয়। তাই হল। আধমরা আমাকে টেনে নিয়ে এল ও হামিদ ডাক্তারের কাছে। সে বেশি কথা-টথা বলেনি, আমার পা দু'খানা কেবল নেড়েচেড়ে দেখে ঠিক দু'পুরিয়া অষধ দিলে। বললে, এক পুরিয়া কসে ঢেলে দাও, ভিতরে যাবে না—না যাক্, ওতে যদি কাজ হয়, যদি চোখের পাতা ফেলে কি পা নাড়ে তো কাল সকালে এক পুরিয়া...সাত দিন বাদে আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠলুম।

—ধন্বন্তরী। অন্যজন বলে।

—আই। আর একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

পরনে চেক লুঙি, সাদা তোলা-হাতা পাঞ্জাবি, মাথায় ফেজ টুপি, শীতকালে কাঁধে একটা তুষের চাদর খালি পা গালে রুক্ষু দাড়ি। তীক্ষ্ণ নাকখানা, আর একজোড়া চোখ। এই হচ্ছে ডাক্তার হামিদ, জি-টি রোডের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ, যার সম্বন্ধে বিস্তর কিংবদন্তী ছড়ানো রয়েছে গ্রামে গঞ্জে, সমবায় পল্লী ঘোষপাড়ায়। লোকে পথ চলতে চলতে কিংবা চায়ের দোকানে বসে, সেলুনে চুল ছাঁটতে ছাঁটতে সেই সব কিংবদন্তীর কথা বলে, শোনে। আবার যে যার পথে চলে যায়। গ্রামে, গঞ্জে, পল্লীতে পাড়ায় পাড়ায় লোকে রোগ-ভোগের ভয় থেকে আত্মরক্ষা করে ডাক্তার হামিদের কথা ভেবে। হামিদ মরা মানুষ বাঁচায়।

হাসপাতাল থেকে মুনিয়াকে ছেড়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ আগে। এখন তাদের বাসার বারান্দায় তাকে শোয়ানো হয়েছে। ঠোঁট দুটি নীল। বেলাশেষের আলোয় সেই ডালিম গাছটার ছায়া এসে একটুখানি স্পর্শ করেছে মুনিয়ার পা।

বহু লোকের ভিড়ের মধ্যে সুবিনয় কিছুই লক্ষ করতে পারছিল না। বহু চেষ্টার পর হাসপাতালের ডাক্তার একবার দাঁতে ঠোঁট চেপে হতাশায় আক্ষেপ করে বলেছিল— ডেড্! কিন্তু সে কথা সুবিনয়ের বিশ্বাস হয়নি। ডেড্। কথাটা কেমন যেন! একটা ভারী পাথর খুব গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল।

একটু পরেই মুনিয়াকে নিয়ে যাবে সবাই। তবু সবাই অপেক্ষা করছে হামিদ ডাক্তারের জন্য। যদি হামিদ পারে। যদি হামিদ পারে!

সুবিনয় এক কোষ জল-বমি করেছে বারান্দার ধারে বসে। এ শরীর যেন আর তার শরীর নয়, এমনই আলগা শিথিল তার হাত পা। কেউ একজন তার কাঁধে হাত রেখে বলছে—ভরসা রাখো। এখনো হামিদ আছে। সে এল বলে।

হামিদ। সুবিনয় যেন বা এ নাম আগে শোনেনি। কে হামিদ? কোথা থেকে সে আসবে! সুবিনয় মুখ তুলে পশ্চিমের আকাশে রক্তিম মেঘখণ্ডগুলি দেখে। মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে, আলোর তীব্র ছটা বহুদূর নীলিমায় ব্যাপ্ত। ঐ কি হামিদের পথ! সে কি রথে আসবে!

মাথাটা কেমন টলমল করে সুবিনয়ের। রমলাকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে—কেঁদো না। হামিদ আসছে। হামিদ আসছে ঐ দেখ,

চরাচর জুড়ে হামিদের জন্য পাতা হয়েছে পথ। আসছে হামিদ। মুনিয়া অনেক বড় হবে—দেখো।

বুড়ো রিকশাওয়ালা খলিল ঝুঁকে প্যাডল মারে, শরীর কাত করে শরীরের ভর দেয় প্যাডলের ওপর। রিকশা ধীরে ধীরে চলে। বুড়ো খলিল কেবল কাশে আর কাশে। রিকশা ধীরে চলে।

রিকশা এসে দাঁড়ায় মুনিয়াদের বারান্দার ধারে, গোলাপী বোগেনভেলিয়ার ঝাড়ের তলায়। রঙিন পাপড়িগুলি শীতের বাতাসে খসে পড়ছে। পাপড়ি খসে পড়ে হামিদের গায়ে, তুষের চাদরে, রিকশার হুডের ওপর। চাপা গুঞ্জন ওঠে—হামিদ! ঐ তো হামিদ।

সুবিনয় মুখ তোলে। শ্যামবর্ণ ছিপ্‌ছিপে হামিদকে দেখে, দেখে তার বুড়ো রিকশাওয়ালাকে। ডেড্—এই কথাটা আবার হঠাৎ ভারী পাথরের মতো গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়।

ডালিম গাছের ছায়া কখন এগিয়ে গেছে অনেকটা। তার রঙ গাঢ়। সিঁদুরে মেঘের আভার আলোর ভিতর দিয়ে গাঢ় কালো ত্রিশূলের মতো ছায়া বিদ্ধ করেছে মুনিয়ার বুক।

খলিল দেখেছে অনেক। সে জানে, সময়মতো হামিদের হাতে পড়লে মানুষ মরে না। তবু মানুষ যে মরে সে তাদের নিজেদের দোষে। নিজেদের শরীরে রোগের লক্ষণ তারা দীর্ঘকাল বুঝতেই পারে না। বুঝতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায়। তারপর অ্যালোপ্যাথির বিষ জমায় শরীরে। রোগের লক্ষণ চাপা পড়লে ভাবে—সেরে গেল। অ্যালপ্যাথ জবাব দিলে তখন অনতিক্রমণীয় মৃত্যুকে ভোজবিদ্যায় ফাঁকি দেওয়ার জন্য তারা ঈশ্বরের মতো হামিদকে খোঁজে। তাই, মানুষ যে মরে সে তাদের নিজেদের দোষে। মাঝে মাঝে খলিল তার ছানির গ্রহণ-লাগা চোখে হামিদের মুখখানা বড় মমতাভরে দেখে। দেখে, হামিদের মুখে নানা চিন্তার দৃশ্য। বাচ্চা লড়ছে রোগের সঙ্গে। মানুষের জটিল দেহযন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে হামিদ। লড়াই জমেছে খুব। খলিল তার বুড়ো শরীর হেলিয়ে প্যাডল্ মারে আর আপনমনে হাসে। মনে মনে সে আল্লার দোয়া ভিক্ষা করে। প্রতিটি লড়াই জিতে আসুক হামিদ। মানুষের ঘরে ঘরে তার নামগান হোক।

ফেরার পথে রিকশা আরও ধীরে চলে। খোয়া-ওঠা রাস্তায় কাঁচা-পথে রিকশা টাল খায়। শীতের বেলা ফুরিয়ে আসে হঠাৎ। উঁচু

রেলবাঁধের ছায়ায় ঝুম্‌কো আঁধার নামে পথে। গ্রহণলাগা চোখে সমুখের দিকটা ঠিক ঠাহর হয় না। খলিল রিকশা থামিয়ে নামে, কাঁপা হাতে কেরো'সিনের ছোট বাতিটা জ্বেলে নেয়। একপলক হামিদকে দেখে। মুখটা হুডের তলাকার অন্ধকারে, ঋজু রোগা দেহটি স্থির, কোলের ওপর সেই চামড়ার পুরোনো ওষুধের বাক্সটি। ঐ স্থির মূর্তি দেখলে খলিলের বুকটা ভয়ে আর সম্ভ্রমে ভরে ওঠে। আল্লার প্রেরিত পুরুষ ঐ বসে আছে তার রিকশায়। এই ধন্বন্তরীকে সে-ই নিয়ে যায় গ্রামে, গঞ্জে, পাড়ায় পল্লীতে। মির্জা হামিদ—এই নামে কত অন্ধকার বুকে আলো জ্বলে ওঠে। তবু যে মানুষ মরে সে তাদের নিজেদের দোষে। খলিল তার বুড়ো শরীর নিয়ে আবার রিকশায় ওঠে। প্যাড্‌ল ঠেলতে ঠেলতে বিড়বিড় করে—আল্লা, হামিদকে আরো শক্তি দাও। তার দুই হাত আলোর তলোয়ার হয়ে উঠুক।

যেদিন হামিদের রুগী মরে সেই রাতে খলিল তার আবেগে, গভীর তৃষ্ণায় মদ খায়। জ্বালাময় অন্ধকারে তার শরীর ভেসে যায়। তারপর ক্রমে তার মাথার ভিতরে একটি আলোর ফুলঝুরি ফেটে পড়ে। সে হয়ে যায় চুর-চুর এক আনন্দিত মাতাল।

ফেরার পথটা দীর্ঘ চড়াইয়ের মতো কষ্টকর। ফুটফুটে মেয়েটা মারা গেল। বাঁচল না। খলিল বিড়বিড় করে—হামিদ কী করবে! হামিদের কোনো দোষ নিও না তোমরা—

মুনিয়ার শ্মশানবন্ধুরা তৈরি হয়েছে। মুনিয়ার মা কুরা সাজিয়ে দিচ্ছে তাকে। কপালে টিপ, চন্দনের ফোঁটা। এলোচুল আঁচড়ে দুটি বেণী ছড়িয়ে দিয়েছে দু ধারে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে মুনিয়াকে। বোগেন-ভেলিয়ার পাপড়ি ঝরে পড়ছে শীত বাতাসে, উড়ে এসে রঙিন প্রজাপতির মতো বসছে মুনিয়ার খাটে, শরীরে, চুলে।

খাটের পায়া ধরে পড়ে আছে রমলা। যেতে দেবে না। পাড়ার বউ-ঝিরা ছাড়িয়ে নিচ্ছে তাকে। সুবিনয় এ সব কিছু দেখছে না। হামিদ নামে একজন অলৌকিক পুরুষের আসার কথা ছিল। আকাশে তৈরি হয়েছিল তার আলোকিত পথ। সেই পথে কেউ আসেনি। এক বিশাল শকুন তার ডানা বিস্তার করেছে, চরাচর জুড়ে তারই ছায়া।

নিহত মুনিয়ার শেষ ভেলা চারজন বাহকের কাঁধে দুলে দুলে ভেসে যায়।

অনেক রাতে মুনিয়ার শ্মশানবন্ধুরা ফিরছিল। তারা শুনল, চৈতল-পাড়ার পথে পথে ক্ষুব্ধ এক বুড়ো মাতালের চিৎকার। চুর-চুর মাতাল খলিল চেঁচিয়ে বলছে—তোমরা সাক্ষী আছো। আমি হামিদের এক ফোঁটা ওষুধও কখনো খাইনি। আমি যদি মরি তবে তার দোষ যেন হামিদকে না অর্সায়। হামিদ ধন্বন্তরী—হামিদ মরা মানুষ বাঁচায়—বিশ্বাস করো—

অনেক রাতে, ঘুমোবার আগে হামিদ তার সাদা, ছোট, সহজ সরল বিছানাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে, নমাজ পড়ার মতো পবিত্র ভঙ্গিতে। প্রতি-দিন ঘুমোবার আগে সে এই কথা বলে—আল্লা, আমি তোমার সমকক্ষ নই। মানুষকে তুমি এই বিশ্বাস দিও যে, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ তার সমকক্ষ নয়।

দুই

মাঘের শেষে এক মাঝরাতে পরাগের ঘুম ভাঙে। ঘুম ভেঙে দেখতে পায় বুকের ওপরে আকাশ। গভীর সমুদ্রের মতো অথৈ। নক্ষত্রের আলো কাঁপছে।

ত্রিপলের একটা কোণ উত্তরের বাতাসে উড়ে গেছে। শীত করছে খুব। কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে উঠে বসে পরাগ। এক প্যাকেট সিগারেট চুরি করে রেখেছিল। বালিশের পাশ থেকে সেই প্যাকেট তুলে অনভ্যাসের একটা সিগারেট ধরায় সে। তারপর মৃদু শব্দে একটু কাশে।

সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সানাই বেজেছে, বেজেছে উলুধ্বনি, হাসি, নানা শব্দ। সন্ধ্যারাতে ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেল। এখন রাত গভীর। ছাদের ওপর ঘুম ভেঙে বসে আছে পরাগ। মাথার ওপর ছাদের ত্রিপলের একটা কোণ উড়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। নিচে এঁটো পাতা নিয়ে খেয়ো কুকুরদের গম্ভীর ঝগড়ার আওয়াজ।

পরাগ অপলক চোখে অথৈ আকাশটুকু দেখে। এ রকম মধ্য-রাত্রির আকাশ এমন বিরলে সে আর কখনো দেখেনি। আজকাল আর হইচই ভাল লাগে না তার, তাই শোওয়ার সময়ে সে একটা চেয়ারের গদি আর কম্বল টেনে নিয়ে এসে ছাদে শুয়েছিল। এখন বুঝতে পারে, এই ভয়ঙ্কর শীতে আর ঘুম আসবে না। সে বসে থেকে সিগারেট খায়, আর অপলক শূন্য চোখে আকাশ দেখতে থাকে।

কোথায় যেন একটা কাশির আওয়াজ হয়, নাল-পরানো জুতোর আওয়াজ, মাটিতে লাঠি ঠুকবার শব্দ। পরাগ উঠে ছাদের আলসের ধারে আসে। অন্ধকারে ঝুঁকে দেখে. মুনিয়াদের বাইরের বারান্দার অন্ধকারে কে যেন বসে আছে। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠে। লোকটা সিগারেট ধরায়।

পরাগ ডাকে—কাকাবাবু।

—উঁ। সুবিনয় উত্তর দেয়।

—এখনো শোননি! রাত দুটো বেজে গেছে।

সুবিনয় গলার মাফলারটা ভালো করে জড়ায়, পায়ের মোজাটা একটু টেনে তোলে। তারপর বলে—ঘুম আসে না।

হাতের টর্চটা জ্বেলে চারদিক একবার দেখে নেয় সুবিনয়, তারপর বলে—তুমি ঘুমোওনি?

—আমি ছাদে শুয়েছিলাম, কিন্তু এখানে বড় শীত। ঘুম আসছে না।

—হুঁ। এবারে শীতটা খুব পড়ল।

বাতাসে ত্রিপলের কোণটা উড়ে ফটাস শব্দ করে। তারা কেউ চমকায় না।

পরাগ চাপা গলায় বলে—এই অন্ধকারে কি আর খুঁজে পাবেন? এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

—যাই। উত্তর দেয় সুবিনয়, কিন্তু ওঠে না। বসে থাকে।

মুনিয়া মারা গেছে এক মাস। প্রায় এক মাস ধরে সারা দিন সুবিনয় শাবল আর লাঠি হাতে বাগানে ঘুরেছে। খুঁড়েছে গাছের তলা, মাটির ঢিপি, ইঁদুর আর ছুঁচোর গর্ত। প্রথম প্রথম সঙ্গে পরাগ থাকত, থাকত পাড়ার উৎসাহী ছেলেমেয়েরা, যারা ভালবাসত মুনিয়াকে। ক্রমে ক্রমে সবাই যে যার কাজে ফিরে গেছে। এখন একা সুবিনয় সারা দিন সাপটাকে খোঁজে। গভীর রাত পর্যন্ত। আজকাল বড় একটা ঘুম আসে না।

পরাগ তার কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে নেমে আসে। বারান্দা থেকে পাখিটা তীব্রস্বরে ডাকে—'পরাগ।' পরাগ নেমে আসে, সদর খুলে বেরোয়।

—কাকাবাবু, এই নিন এক প্যাকেট সিগারেট! আপনার জন্য রেখেছিলাম।

খুশি হয় সুবিনয়। হাত বাড়িয়ে নেয়। তারপর হঠাৎ অপ্রত্যাশিত বলে—মুনিয়া বেঁচে থাকলে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতাম, বুঝলে পরাগ! মনে মনে আমি ঠিক করে রেখেছিলাম।

শীত-বাতাস বয়ে যায়।

—এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুন কাকাবাবু। শীতকাল—এখন সাপেরা বড় একটা বেরোয় না।

—তাই হবে। সুবিনয় বলে বসে থাকে। তারপর বলে—তুমি যাও। আমি আর একটু দেখে গিয়ে শুয়ে পড়বো। যতক্ষণ ওটা আছে ততক্ষণ কিছুতেই শান্তি পাই না।

পরাগ ওঠে। খুব শীত বলেই কিনা কে জানে তার চোখে জল আসতে থাকে।

একা আরো কিছুক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকে সুবিনয়। তারপর টর্চ বাতিটা জ্বালে। ব্যাটারির জোর কমে গেছে, আলোটা লালচে। টর্চটা ঘুরিয়ে সামনের মাঠটা একটু দেখে, বাগানের বেড়ার ধারে যায়। লেবুগাছ আর ডালিমগাছের গোড়া থেকে আলো সরিয়ে নেয়। দত্তদের বাড়ি উঠছে, তাদের ইঁটের পাঁজাটা দেখে সুবিনয় পথে নামে। পরাগ-দের বাড়ির সামনে ঘেয়ো কুকুরদের ভিড়কে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। বন্ধ ডাক্তারখানার চাতালে একজন মাতাল বসে আছে। সুবিনয় এগোয়। পুলিশ-ব্যারাকের পিছনের দেয়ালের সামনে কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে মোমবাতি, আলকাতরার টিন, তুলি। কী লিখছে।

টর্চের আলো ফেলে সুবিনয় দাঁড়াতেই ছেলেগুলো রুখে মুখ ফেরায়।

—কে?

এ পাড়ারই ছেলে। তাকে চিনতে পারে। একজন এগিয়ে এসে বলে—আমরা কাকাবাবু। আপনি কী খুঁজছেন—সেই সাপটাকে? ওটাকে কি আর পাবেন! বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

সুবিনয় টর্চের আলো ফেলে দেয়ালে, বলে—এসব কী লিখছো?

—তেমন কিছু না। আপনি বাড়ি যান কাকাবাবু। আমরা লিখি।

সুবিনয় লেখাগুলো পড়ে। ঠিকঠাক কিছু বুঝতে পারে না।

—লিখছো। আচ্ছা লেখো। বলে সুবিনয় আবার এগোয়। রেলরাস্তা পর্যন্ত চলে যায়। আবার ফিরে আসে। চারদিকেই অন্ধকার, নির্জনতা।

দিন কেটে যায়।

তখনো অন্ধকার ঝুলে আছে চারদিকে, ভোর রাত্রে পরাগের চন্দনা পাখিটা ডাক দেয়—পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো।

পরাগের আলস্যজড়িত ঘুম ভাঙে। উঠতে ইচ্ছে করে না। পাখিটা ডাকে, ডাকতেই থাকে। বিরক্ত পরাগ পাশ ফিরে ধমক দেয়—এই, চুপ্।

পাখিটা ডানা ঝাপটায়, কিন্তু আবার ডাকে পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো।

উঠতে ইচ্ছে করে না। সকালের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যটি তার দেখা যায় না। মুনিয়াদের বাগানে মুনিয়া। কী হবে বড় হয়ে তার? পরাগের আর বড় হতে ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে তার বুকের ভিতরে এক গ্রীষ্মের প্রান্তরে হু-হু করে হাওয়া বয়ে যায়।

পরাগ পাশ ফিরে শোয়। সিগারেটে এখন তার অভ্যাস হয়ে গেছে। বালিশের পাশেই থাকে প্যাকেট। সে শুয়ে শুয়ে সিগারেট খায়। কিন্তু পাখিটা ডাকতেই থাকে—পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো।

পরাগ চুপ করে থাকে। একবার ভাবে, উঠবো না—খেলোয়াড় হয়ে আমার কী হবে। আর একবার ভাবে উঠি। ভাবতে ভাবতে তার শীত করে। লেপটা মুড়িসুড়ি দিয়ে শোয়। মুনিয়াদের বাগানে আর মুনিয়াকে দেখা যাবে না। তাই শুয়ে সিগারেট টানে পরাগ। এই অনিয়ম দেখে তার চন্দনা পাখি রেগে গিয়ে ডানা ঝাপটায় আর ডাকে। ডানা ঝাপটায় আর ডাকে।

হঠাৎ মাথার ভিতরে একটি ঘন সবুজ মাঠের দৃশ্য ফুটে ওঠে। উঁচুতে একটা সাদা বল। সেই বলের দিকে লাফিয়ে উঠছে কয়েকজন লাল-সোনালি-নীল-লাল জার্সি পরা খেলোয়াড়। হঠাৎ উষ্ণ একটা রক্তস্রোতে পরাগের শরীর ভেসে যায়। এ বছর পরাগকে ডেকেছে কলকাতার বড় একটা ফুটবল ক্লাব।

ভাবতে ভাবতে পরাগের শরীর চনমন করে। সেই উষ্ণস্রোত তার শরীরের শীতভাব দূর করে দেয়। সে উঠে তার শর্টস পরে, পরে নেয় কেডস, তার পাখিটি চুপ করে দেখে। খুশি হয়।

মুনিয়াদের বাগানে আর মুনিয়াকে দেখা যাবে না।

পরাগ এ বছর কলকাতার বড় একটা ক্লাবে খেলবে।

ভোরবেলা বহু দূরে এক কারখানার ভোঁ বাজতে থাকে।

সুবিনয় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। রমলা একটা সেলাই মেশিন কিনবে। দুজনের চলে যাবে কোনক্রমে। সারাদিন এবং রাত পর্যন্ত সাপটাকে খোঁজে সুবিনয়। ঘুম আসে ভোর রাত্রে।

দাড়িওয়ালা, স্মিতমুখ কার্ল মার্কসের ছবিখানা এখনো তার শিয়রে টাঙানো, মাঝে মাঝে সে ঘুম-জড়ানো চোখে ছবিখানার দিকে চায়। অস্ফুট গলায় বলে—আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতুম আমার মুনিয়াকে। আর কিছুকে নয়, আর কাউকে নয়। আমার এ অপরাধ ক্ষমা কোরো।

ক্রমে কার্ল মার্কসের ছবিখানায় ধুলো পড়ে। এক দুঃসাহসী মাকড়সা লাফ দিয়ে উঠে আসে, তারপর স্মিতহাস্যময় সেই মুখের ওপর তার অমোঘ জালখানা বুনতে শুরু করে।

বন্দুকবাজ

পল্টনের একটাই গুণ ছিল। সে খুব ভাল বন্দুকবাজ। বন্দুক বলতে আসল জিনিস নয়, হাওয়া-বন্দুক। চিড়িয়া, বাঘ এমন কি ইঁদুর মারার যন্ত্রও সেটা নয়। তবে অল্প পাল্লায় চাঁদমারি করা যায় বেশ, আর পল্টনের হাওয়া-বন্দুকটা ছিল ভাল। তার জমিদার দাদু জার্মানি থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন।

জীবনটাকে প্রথম খাট্টা বানিয়ে ছাড়ল ইস্কুলের মাস্টাররা, আর বাবা। দিনরাত কেবল পড় পড়। শেষমেশ 'পড় পড়' শব্দটা তার কানে আরশোলার মত ফড়্‌ফড় করে বেড়াত, মাথার মধ্যে ফরর, ফরর করত।

বন্দুকবাজ ছিল তখন থেকেই।

দাদুর জমিদারি বাবা বিফলে দিল। তারপর থেকে শুখা ভদ্রলোক তারা। নিমপাতা দিয়ে ভাত খায়।

বাবা কেবল হুড়ো দেয় তখন—-মানুষ হ। দাঁড়া। নইলে মরবি।

পল্টন জানে, বাবা এখন ছেলের মধ্যে তাগদ চায়। বাপ নিজে সুপুত্র ছিল না। তবে খারাপ দোষও কিছু নেই। চটপট বড়লোক হতে গিয়ে ফটাফট টাকা বেরিয়ে গেল। জমি গেল। বাড়িটা রইল শুধু। তা সে বাড়িরও ছুরত কিছু নেই। রঙচটা দাদের দাগ সর্বাঙ্গে।

পল্টনের মাথায় পড়া ঢোকে না! বাপের হুড়ো খেয়ে বই মুখে হরবখত ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করত বটে, কিন্তু মা সরস্বতীর পায়ের ছাপ পড়ত না মাথার ঘিলুতে। তার বন্দুকের নিশানা ছিল ওয়া ওয়া। বিশ হাত দূর থেকে উল্টো করে ধরা পেনসিলের শিস উড়িয়ে দিত একবারে। টান করে সুতো বাঁধো, পল্টন বিশ হাত দূর থেকে ছর্‌রা মেরে ছিঁড়ে দেবে। কোন কাজে লাগে না গুণটা। কিন্তু আছে। অচল সিকি যেমন পকেটে পড়ে থাকে।

তার পথে বরাবরই নানান্ মাপের গাড্ডা। কখনো ছোট, কখনো বড়। ক্লাস নাইনে সে প্রেমে পড়ল গার্লস স্কুলের পপির সঙ্গে। পপি পড়েনি; পড়াটা পল্টনের একতরফা। না পড়ে উপায়ই বা কী? হুবহু মেমসাহেবের মত দেখতে পপি, তেমনি সাজগোজ তার, আর

রাজহাঁসের মত অহঙ্কারী সে। পুরো গঞ্জের যুবজন ঢেউ খেয়ে গেল।

পপি কখনো বিনা ঘটনায় রাস্তায় হাঁটতে পারত না। রোজ কিছু না কিছু ঘটবেই। এই ছোকরা স্রেফ হিরো বনতে গিয়ে বাঘী সিপাহীর মত দোতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পপির চোখ টানতে গিয়েছিল। দুটো ঠ্যাং বরবাদ।

আর একজন স্রেফ পপির জন্য গার্লস স্কুলের পুকুরে তেত্রিশ ঘণ্টা সাঁতরাল। নিউমোনিয়া হয়ে সে যায় যায়।

আর একজন কেবল পপির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর পেটে ছুরি চালিয়ে দিল। একজন জেলে, অন্যজন হাসপাতালে গেল।

অনেকে গান শিখতে লাগল, ফুটবল খেলতে লাগল, ছবি আঁকতে লাগল, গল্প বা কবিতা লিখতে লাগল সব পপির জন্য।

পপি কী ভালবাসে? কী পছন্দ করে তা তো কারো জানা ছিল না!

পল্টনের আর কিছু নেই, বন্দুক আছে। এক বাজিকর বাজি দেখিয়ে মাতা মেরির আশীর্বাদ পেয়েছিল। গল্পটা জানত পল্টন। বাজিতে যদি হয় তো বন্দুকে হবে না কেন? পল্টন গিয়ে ডালিমের সেলুনে চুল ছাঁটল সেদিন, সবচেয়ে ভাল হাফ প্যান্ট আর শার্টটা পরল। আর জুতোও পরল, যা সে কদাচিৎ পরে।

আমতলার রাস্তা দিয়ে পপি ইস্কুলে যাচ্ছে। সঙ্গে হরেক কিসিমের ফুরফুরে মেয়ে। সব ডগমগ। আর আড়াল আবডালে, আগে পিছে ছোকরারা নানা কায়দা করে চোখ টানার চেষ্টা করছে।

পল্টন ঠিক করল, দেখাবে। পপির বাঁ বুকের ওপরে সাঁটা ইস্কুলের মেটাল ব্যাজ। বেশ ছোট ব্যাজ। পল্টন আমগাছের আড়াল থেকে বন্দুক তাক করল। বেশ শক্ত কাজ। প্রথম, পপি চলছে। দ্বিতীয়, তার চারদিকে বিস্তর চেলি চামুণ্ডি। কিন্তু বন্দুকবাজ পল্টন তো আর কাঁচা হাতের লোক নয়। সে ব্যাজটাকে ভাল মত নিরিখ করে ঘোড়া টিপে দিল। ব্যাজটাকে টিপে দিয়ে লোহার গুলি লাফিয়ে উঠে পপির পা ছুঁল ভয়ে। কিন্তু ফসকায়নি।

কিন্তু পপির চোখের সামনে রুস্তম বনবার সাধ যারা এতকাল ধরে পুষছে তারা ছাড়বে কেন?

পপির লাগেনি, অলৌকিক হাতের টিপ পল্টনের। টিনের ব্যাজটা টোল খেয়ে গেছে। কিন্তু তখন কে শোনে তার কথা।

ভুলটা কোথায় হয়েছে বুঝবার আগেই তার মাথা থেকে সিকি চুল খামচে তুলে নিল ছোকরারা, পেট ফাটানো লাথি চালাল, নাক থ্যাবড়া করে দিল ঘুসিতে। তিনটে দাঁত নড়বড়।

প্রথমে ভয় খেলেও মার দেখে খুব হেসেছিল পপি আর তার বান্ধবীরা।

বন্দুকটা সেই গোলমালেও বেঁচে গিয়েছিল। সেটার ওপর কেউ কেন কে জানে আক্রোশ দেখায়নি।

মারে শেষ হল না। ইস্কুলে খবর হল। পরদিনই তার বাবার কাছে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট গেল ইস্কুল থেকে। ব্যথা-বেদনার শরীরের ওপর বাবা আর এক দফা চালাল। সেই রাতেই বন্দুক ঘাড়ে রাস্তা মাপল পল্টন। একটু খুঁড়িয়ে, ককিয়ে, মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলে।

ভোর হল শহরতলিতে। লেভেল ক্রসিং-এ একটা ফাঁকা গুমটি ঘর পেয়ে শুয়ে গিয়েছিল পল্টন। ভোর হল প্রচণ্ড খিদেয়, পিপাসায়। ভোর হল ভয়ে।

কিন্তু ভোর তো হল!

পল্টন ভারী শহরে ঢুকে চারদিক দেখে। বাবার সঙ্গে বহুবার এসেছে, তখন খারাপ লাগেনি। এখন মনে হল, ই বাবা, এখন আবার না জানি কী হবে! কিন্তু ডরফোকের ইজ্জত নেই। সঙ্গে বন্দুক তো আছে এখনো। প্রথমে পল্টন তার আংটি বেচল। তারপর খেল পেট ভরে।

বাজারের কাছে বন্দুক হাতে ঘোরাঘুরি করার সময় বহু লোক তাকে ফিরে ফিরে দেখতে থাকে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে পিছুও নেয়। একটা ছেলের হাতে আধ খাওয়া জিলিপি। পল্টন তাকে বলল, জিলিপিটা ধরে দাঁড়া।

ছেলেটা দাঁড়ায়। বিশ হাত দূর থেকে পল্টন বন্দুক মারে, জিলিপি পড়ে যায়।

ছেলেটা কেঁদে ওঠে বটে, কিন্তু বহু লোক তাকে সাবাস দিতে থাকে।

তো পল্টনের পয়লা কাম সাফা, এ কাজটা হল সবচেয়ে বড় কাজ। ঢোকা; ঢুকে পড়া। পল্টন পয়লা গুলিতেই শহরে ঢোকার রাস্তা করে নিল।

সে জোগাড় করল আলপিন, ছুরি, টমেটো, আলু, সুতো আর যত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস আছে। ছুরির মাথায় টমেটো গেঁথে, সুতো ঝুলিয়ে, আলপিনের ডগা লক্ষ্য করে সে দমাদম বন্দুক মারে। একটা তাস দাঁড় করিয়ে যে কোন ফোঁটায় গুলি লাগায় দশ বিশ হাত দূর থেকে। গুলি ফসকায় না। মোমবাতির শিখা নিভিয়ে দেয়, উড়ন্ত মার্বেল ফাটিয়ে দেয়।

দিনে দেড় দু'টাকা রোজগার দাঁড়াল। কোনও পরোয়া নেই। একটা চালের আড়তে পাহারা দেওয়ার কাজ পেল, সেইখানেই মাথা গোঁজার জায়গা আর দু'বেলা খাওয়া। সারাদিন শহরের এখানে সেখানে বন্দুক-বাজি। তবে ভুলেও সে আর মেয়েদের দিকে তাকায় না। ওপড়ানো জায়গায় ফের চুল গজাতে অনেক সময় লেগেছে।

তো বন্দুক আর পল্টন আছে। আর কী চাই?

আড়তের মালিক চেন্টুবাবুর আসলি বন্দুক আছে। দুটো নল দিয়ে আগুনে সিসে ছুটকায়। চেন্টু বলে—চালাবি?

উদাস স্বরে পল্টন বলে—ও বড় ভারী জিনিস।

দূর ব্যাটা! অভ্যাস কর।

পল্টন আসল বন্দুকের খদ্দের নয়। সে কোনোদিন পাখি মারেনি, বাঘ মারেনি, বেড়াল পর্যন্ত নয়। জীবজন্তু মারতে বড় কষ্ট হয়। আসল বন্দুকে তার তবে কাজ কী?

কিছুদিন যায়। হাওয়া-বন্দুকের খেল্ শহরে পুরোনো হয়ে গেছে। নতুন আর কিছু না দেখালে লোকে তাকাবে কেন?

খুব ভাবে পল্টন। সে চিত হয়ে উপুড় হয়ে, হেঁটমুণ্ড হয়ে বহু লক্ষ্যভেদ দেখিয়েছে। কিন্তু তাও তো সব দেখা হয়ে গেছে মানুষের। আর কী বাকি আছে? রাতের বেলা হাওয়া-বন্দুক কোলে নিয়ে পল্টন জেগে বসে আড়ত পাহারা দেয় আর ভাবে। ভাবতে ভাবতে একদিন চেন্টুবাবুকে বলল—বন্দুক ছাড়া আর তো কিছু জানি না। তা বললেন যখন তো দিন আপনার মারণ কল। চালাই।

পারবি তো.

প্র্যাকটিস তো করি!

চেন্টুবাবু বন্দুক দিলেন। বললেন—গুলির বড়ো দাম। সাবধান, বেশি খরচ করিসনি।

খুবই ভারী বন্দুক, হাওয়া বন্দুকের পাঁচ গুণ। চেন্টুবাবু তাকে নিয়ে এক ছুটির দিনে শহরের বাইরে গেলেন বন্দুক শেখাতে।

সারাদিন দমাদম চাঁদমারি হল। দিনের শেষে চেন্টুবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—তুই শালা একলব্যের বংশ।

মিথ্যেও নয়। আস্‌লি চিজ পয়লা দিন ধরেই পল্টন খেল্‌ দেখিয়েছে। পিসবোর্ডে আঁকা গোল টার্গেটের ঠিক মাঝখানে একটার পর একটা গুলি পাম্প করে দিয়েছে; এদিক ওদিক হয়নি, চেন্টুবাবু শূন্যে ঢিল ছুঁড়েছেন। আর পল্টন সেই ঢিল ছাতু করেছে। তারপর নারকেল পেড়েছে বন্দুকে, বটের ফল পড়েছে, সর্বশেষে একটা ওল্টানো কাচের গ্লাসের ওপর রাখা একটা কমলালেবু ছ্যাঁদা করেছে, গ্লাসটার চোট হয়নি।

শহরে শখের শিকারী কিছু কম নেই। পল্টনের বন্দুকের হাত সবাই জেনে গেল। সেই থেকে সে শিকারী-পার্টির সঙ্গী। ছুটির দিনে কেউ না কেউ এসে বলবেই, চল রে পল্টন।

পল্টন যায়। নিজের হাতে জীবজন্তু সে মারে না। তবে বন্দুক বয়। গুলি ভরে দেয়। সঙ্গে থাকে। কথা কম বলে সে। কেউ চাইলে বন্দুকের নানা ভেল্‌কি দেখায়। চলন্ত জিপগাড়ি থেকে টার্গেট মারে, ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছন ফিরে লক্ষ্যভেদ করে, হেঁটমুণ্ডু হয়ে নিশানায় গুলি লাগায়।

বিশ্বাসবাবু বললেন—তা পাখি মারিস না কেন?

কষ্ট হয় বাবু। পাখির তো বন্দুক নেই। সে উঠে কী চালাবে?

ব্যাটা ফিলজফার।

পল্টন জানে মারটা উভয় পক্ষেই হওয়াটা হক্‌কের। এক তরফা ভাল নয়। পাখি বন্দুক চালালে সেও উল্টে চালাতে পারত।

চৌধুরী সাহেব বললেন—কিন্তু বাঘ?

—বাঘেরও বন্দুক নেই। তাছাড়া সে তো আমার ঘরে গিয়ে হামলা করেনি। বরং তার জায়গায় এসে আমিই ঝামেলা চালাচ্ছি।

—তোর কপালে কষ্ট আছে।

সে জানে পল্টন। কপালে কষ্ট তার নেই তো কার আছে!

অফিসারদের ক্লাবে পল্টন চাকরি পেয়েছে। টেনিস বল কুড়িয়ে দেয়, ঘাস ছাঁটে, গলফের ব্যাগ বয়ে নিয়ে যায়, মদ ঢেলে দেয়।

একদিন খেয়ালবশে গল্‌ফ স্টিক চালিয়ে বহু দূরের গর্তে বল ফেলল।

মিত্র সাহেব বিয়ারের জাগ হাতে রঙিন ছাতার তলায় বসেছিলেন। দেখে বললেন—হোল ইন ওয়ান। আবার মারো তো।

আবার মারে পল্টন এবং এবারও গর্তে বল ফেলে।

সেই থেকে পল্টন একনম্বর গল্‌ফ খেলোয়াড়। সেই থেকে সে বিলিয়ার্ডেও সবচেয়ে চৌখস। পল্টন ছাড়া সাহেবদের চলে না। পল্টন ছাড়া ক্লাব অচল।

কাছাকাছি বউ বা প্রেমিকা থাকলে কোন সাহেবই পল্টনের সঙ্গে বড় একটা বিলিয়ার্ড বা গল্‌ফ খেলে না।

গুহ সাহেব নতুন এসেছেন। সুন্দরী স্ত্রী।

[গল্পের নিয়মে গুহ সাহেবের স্ত্রী হতে পারত সেই পপি। জীবন তো অনেক সময়ে গল্পের মতই হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গুহ সাহেবের স্ত্রী পপি নয়। অন্য একজন।]

পল্টন বিলিয়ার্ড টেবিলে একা একা বল চালাচালি করছিল। সাহেবরা কেউ আসেনি তখনো।

গুহ সাহেব হাত গুটিয়ে বললেন, হয়ে যাক এক হাত।

হল। হেরে ভূত হয়ে গেলেন গুহ। পল্টন গা লাগিয়েও খেলল না।

পরদিন গলফে সে গুহ সাহেবকে একদম বুরবক বানিয়ে ছাড়ল।

কিন্তু গুহ সাহেব বুরবক হতে পছন্দ করেন না। তিনি বিদেশে বিস্তর গল্‌ফ আর বিলিয়ার্ড খেলেছেন। কম্পিটিশানে শুটিং করেছেন। তাই ক্রমে ক্রমে তাঁর পল্টনের সঙ্গে একটা অদেখা শত্রুতা গড়ে উঠতে থাকে।

শীতকালে জলায় বাঘ আসে। সেবারও এলো। সাহেবরা বন্দুক কাঁধে বাঘ মারতে চললেন। সঙ্গে পল্টন।

জঙ্গলে বিটিং হচ্ছে। জঙ্গলের বাইরে দু'সার বন্দুক তৈরি।

পল্টন দূরে একটা গাছতলা বেছে ছায়ায় বসে আছে। বসতে বসতে ঢুলুনি এলো। শুয়ে গেল সেইখানেই।

বাঘটা বেরোল বিদ্যুৎশিখার মত। তারপর ঢেউ ঢেউ হয়ে ছুটতে লাগল খোলা মাঠ দিয়ে, আগুনের মত উজ্জ্বল শরীরে।

মোট দশখানা বন্দুক গর্জে উঠল দুই সারি থেকে। তারপরেও গর্জাতে লাগল। ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার, বারুদের গন্ধে বুক ছিঁড়ে যায়।

বাঘটা ঝাঁপরা হয়ে পড়ে গেল ধানের ক্ষেতে। তার রক্তে মাটি উর্বর হতে লাগল। পল্টন শুয়ে ছিল টিলার মত উঁচু জায়গায়।

গাছতলায়। সবই ঠিক আছে তার, শুধু তোলা হাঁটুটার মাঝখানে একটা ছ্যাঁদা। তীরবেগে রক্ত বেরোচ্ছে।

যখন সবাই ঘিরে ধরল তাকে, সে কাতর স্বরে বলল, সাবাস। লেগেছে ঠিক। ঠিক লেগেছে। সাবাস সাহেব।

কাকে বলল কেউ বুঝতে পারল না। তবে মাস খানেক বাদে গুহ সাহেবের স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা আনলেন আদালতে।

বৃষ্টিতে নিশিকান্ত

কেচ্ছাকেলেঙ্কারির মতো বৃষ্টি হচ্ছে কদিন। জলের ফোঁটা লক্ষ অর্বুদ গুড়ুলের মতো ছুটে আসে আকাশ থেকে, মাটি ফুঁড়ে বসে যায় ভিতরে। গায়ে লাগলে ফটাস করে ফাটে। ব্যথা পায় নিশিকান্ত। আদিগন্ত সাদা হয়ে আছে, শীতের কুয়াশার মতো, কিছু নজর চলে না। আর সেই সাদাটে ভাবের আবডালে কী যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হচ্ছে কে জানে! উল্টে পাল্টে যাচ্ছে জগৎসংসার। সেই কেচ্ছাকেলেঙ্কারির কথাই বৃষ্টির শব্দে ছড়িয়ে যাচেছ, ফিস-ফাস, গুজুর-গুজুর। ঐ বৃষ্টির আবডালে আবার জগৎসংসার যে থেমে আছে এমনও নয়। বেলপুকুরের বাজারে মহেন্দ্রর দর্জির দোকানে মেশিন চলছে খর্ খর্ শব্দে। মুদির দোকানে দু' চারজন কাকভেজা লোক সওদা করছে। আলু পেঁয়াজ নিয়ে ভূপেন বসেছে ভুশিঅলার বারান্দায়। দোকান সব একটু-আধটু ফাঁক করে কাজকর্ম চলছে ঠিকই। কিন্তু সেটা হঠাৎ বোঝা যায় না। বৃষ্টির রকম দেখে মনে হয় মানুষজন বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সব। দুনিয়ায় আর মানুষ—মাটির চিহ্ন রাখবে না।

বাগনানের বাস কখন বন্ধ হয়ে যায় কে জানে। এখনো চলছে। নিশিকান্ত অন্ধকার বিকেলবেলায় বেলপুকুরে নেমে পড়ে বাস থেকে। গায়ে ফতুয়া, পরনের ধুতিখানা উরুত পর্যন্ত তোলা। ছাতাখানা বগলদাবা করেই নামে। এই বাতাস-বৃষ্টিতে ছাতা খুলতে ভয় করে তার। ফটাস করে উল্টে গিয়ে পুরানো ছাতার শিকটা ছরকুটে যাবে। অবশ্য ছাতা খুলতে তাকে কখনো দেখেওনি কেউ।

রাস্তাঘাট কিছু দেখা যায় না। ঝুপুস করে জলে পা দেয় নিশিকান্ত। দোলের দিন যেমন ছোঁড়ারা রঙের বেলুন ছুঁড়ে মারে আর সেটা ফটাস্ করে ফাটে, তেমনি আকাশঠাকুর ছুঁড়ছে তার বিদঘুটে বেলুন সব। নিশিকান্তর শরীরে অ্যাই বড় বড় ফোঁটা ফাটছে। নামতে না নামতেই ভিজিয়ে একশা করে দিল। দৌড়ে গিয়ে সামনের দোকানটায় উঠে দাঁড়ায় সে। বৃষ্টির রকমটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। বাসটা তাকে ফেলে ইস্টিমারের মত চলে গেল।

কোমরের কাপড়ের মধ্যে শতপাল্লার ভাঁজে সাবধানে বিড়ি আর

দেশলাই মুড়ে রেখেছে। দোকান-ঘরের বেঞ্চটায় বসে কোমরের কাপড় আলগা দিয়ে নিশিকান্ত বিড়ি দেশলাই বের করে আনে। চায়ের দোকানদার তার দিকে বিরক্তির চোখে চায়। তার গা বেয়ে জল নেমে বেঞ্চ ভিজছে। নিশিকান্ত যে খদ্দের নয় একথা দোকানি জানে।

বিড়িটা জখম হয়ে গেছে। নিশিকান্ত দুধারে ফুঁ দিয়ে টিপেটুপে দেখে তারপর নিরাসক্ত গলায় বলে—আগুনটা দাও তো!

সামনে উনুন জ্বলছে, খামোখা দেশলাইয়ের একটা কাঠি নষ্ট করে কোন বুরবাক। দোকানদার অবশ্য গা করে না। তাই নিশিকান্ত উঠে বিড়িটা কেটলির পাশ দিয়ে উনুনে গুঁজে দেয়। ধরিয়ে আবার জুত করে বসে। তাড়া নেই। মহেন্দ্র দর্জির দোকানে আধবোতল চুয়া রাখা আছে, গতকাল মহেন্দ্র কলকাতা থেকে এনে রেখেছে, আজ নিয়ে যাওয়ার কথা। এই বৃষ্টি-বাদলায় সে কাজটা নিশিকান্তকে দিয়ে না করালেই চলছিল না বউমণির। নিশিকান্ত বসে থাকে—এটা তার সহ্য হয় না। আজ দুপুরের কথাই ধরা যাক, এমন বাদলায় কার যে ডাব খেতে ইচ্ছে করে তা জন্মে জানে না নিশিকান্ত, কিন্তু বউমণির করল। তিনদিন রাতে খিচুড়ি খেয়ে খেয়ে নাকি ধাত গরম হয়েছে। বৃষ্টি মাথায় সাঁই সাঁই বাতাসের মধ্যে নিশিকান্তকে উঠতে হল গাছে। ভিজে ভিজে পিছল হয়েছিল গাছ। পা হড়কে কয়েক হাত নিচে পড়েছিল সে। ঘসটানিতে বুকের নুনছাল উঠে গেছে খানিক। এখনো জ্বালা করছে। দুটো বোঁটা-আল্‌গা ঝানু ডাব খসে পড়ছিল। লুকিয়ে নিশিকান্ত সে দুটোর মুখ কেটে ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে শাঁসটাকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। সেই মেশানো ডাবের জল মিষ্টি ঘোলাটে একটা শরবতের মতো হয়ে যায়, তার ভারী স্বাদ। সেই শরবত খেয়ে খোলা দুটো ছুঁড়ে পুকুরে ফেলেছিল সে। তারপর বাবলা তলায় দাঁড়িয়ে দেখে পুকুরের ছাপানো জলে ভেসে ভেসে ডুবন্ত মানুষের দুটো মাথার মতো কোন দেশান্তরে চলে গেল। এই ঝাপসা বৃষ্টির বেলায় পৃথিবীটা কত ছোট্টটি হয়ে এসেছে, তবু কালো মেঘের ছায়ায় এখনো কত নিরুদ্দেশ হওয়ার মতো জায়গা আছে। জল থেকে ক্ষুদে মাছ উঠে আসছিল, বাবলা তলায় কই মাছ বেয়ে উঠে এসেছে, ভেজা গাছের ডালে বসে কাক খা খা করে। নিশিকান্তর তখন কত কী মনে পড়ি-পড়ি করে। কিন্তু আদতে কিছু তেমন মনে পড়ে না তার। নিশিকান্তর ঐ হচ্ছে রোগ।

অন্ধকারে টর্চবাতি জ্বেলে চলার মতো নিশিকান্তর অবস্থা। টর্চ-বাতির যেটুকু আলো হয় সেটুকু গোলপানা আলোয় একটুখানি দেখা যায় মাত্র। সামনেও হাঁ করা অন্ধকার, পিছনেও হাঁ করা অন্ধকার। অর্থাৎ নজর চলে না। নিশিকান্তর হাতেও তেমনি এক টর্চবাতি ধরিয়ে অন্ধকার দুনিয়ার দিগদারিতে পাঠিয়ে দিয়েছে কে। যেমন তার বিস্মরণ তেমনি তার ভবিষ্যৎ-চিন্তা। ভাবতে বসলেই নিশিকান্তর কাছে তার জীবনটা এক ঝাপসা বাদল দিনের মতো লাগে, পৃথিবীটা ছোট্টটি হয়ে যায়। নজর চলে না বহুদূর পর্যন্ত। কে তার বাপঠাকুর্দা, কোথায় তার বাড়িঘর, কী তার জাত-গোত্র এ নিশিকান্তর জানা নেই। লোকে বলে সে হল হাবাগোবা মানুষ। তাই হবে। তবু নিশিকান্ত খুব ভাবতে ভালবাসে। যেমন সেই ডাবের খোলা দুটো কোথায় হারিয়ে গেল, কোন বিশাল বিশ্বসংসারে চলে গেল ডুবন্ত মানুষের মাথার মতো ডাব দুটো, তা নিশিকান্ত ভাবতে বসে।

ট্যাঁকে চুরি করা দু' চার পয়সা তার থাকেই। হঠাৎ চায়ের একটা দমকা গন্ধ আর সেই সঙ্গে হাওয়ায় উনুনের একটু তাপ উড়ে এসে গায়ে লাগতেই নিশিকান্ত নড়েচড়ে বসে। তারপর তাচ্ছিল্যের গলায় বলে—দাও তো এক ভাঁড় তোমার চা। খেয়ে দেখি।

দোকানদার উনুনটা খুঁচিয়ে একটু আঁচ তুলছিল। একটা ডেক-চিতে আলু পেঁয়াজ কুচিয়ে রেখেছে, বোধহয় এক্ষুনি কেটলি নামিয়ে রাতের রান্নাটা সেরে রাখত। নিশিকান্তর কথা শুনে ফিরে তাকাল, তারপর চায়ের গুঁড়ো ঢালতে লাগল খয়েরি ন্যাকড়া-দেওয়া ছাঁকনিতে।

নিশিকান্ত বেঞ্চ থেকে উনুনের ধারটিতে আগুনের তাপে তেতে-ওঠা চৌহদ্দির মধ্যে এসে উবু হয়ে বসে। অল্প অল্প করে চায়ে চুমুক মারে, গরম ভাঁড়টা মাঝে মাঝে চেপে ধরে ঠাণ্ডা গালে। কিছুই মনে পড়ে না, তবু কত কী যে মনে পড়ি-পড়ি করে তার। আধবোতল চুয়ার জন্য পলতাখেড়ে থেকে মাইল দেড় হেঁটে শিবগঞ্জ-বাগনানের বাস ধরে সে যে এতটা পথ এসেছে এই বাদলায়, তাতে তার ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। এ সময়টায় ঘরে থাকলে তাকে বউমণি টোকার সঙ্গে হয় মাছ ধরতে পাঠাত, নয়ত সাঁজাল দিতে। কিছু একটা করাতই! কিন্তু বাদলায় দোক্তা ফুরিয়েছে। বিকেলের আগে তামাক পাতা সেঁকা হয়েছে, ভাজা হয়েছে ধনে আর মৌরি। বিপিনবিহারী হামান-

দিস্তা নিয়ে বসেছে, দুমদাম শব্দে গুঁড়ো করছে সব। চুয়া মিশিয়ে বউমণি খাবে। ভাজা মশলার মাতলা মিঠে গন্ধে বর্ষার ছাতকুড়ো-পড়া গন্ধটা চাপা পড়েছে। কিছু গন্ধ আছে ভালোবাসার, যেমন গন্ধ গোলাপে, বক-ফুলের ভাজা বড়ায়, সোঁদা-স্যাঁতা মাটিতে। আবার কিছু নেশাড়ু গন্ধ। যেমন গন্ধ কেয়াফুলে, কিশোরীর ঘেমো শরীরে, ভাজা দোক্তাপাতায়। এমন কত গন্ধ যে হঠাৎ উড়ে আসে। তুলসীতে আর চন্দনে এক রকম ভগবানের গন্ধ আছে। পুরোনো পুঁথির পাতায় পাওয়া যায় কতকালের মন কেমন করা গন্ধ। সব গন্ধ ঠিক ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। এই বর্ষার গন্ধটা যেমন। বড্ড মন খারাপ করে দেয়।

এই বর্ষায় ঘরের-বার হওয়া মানুষের বড় তাড়া। একজন ছাতা-মাথায় গেরস্ত লোক ওপাশের দোকানে দৌড়ে এল কোলকুঁজো হয়ে, এক ঠোঙা মুড়ি কিনে আবার কোলকুঁজো হয়ে রাস্তা পেরোয়। ভাব-গতিক দেখে মনে হয় ঘরে ঢুকেই হুড়াস করে দরজা দিয়ে ঘড়াক করে হুড়কো তুলে দেবে। নিশিকান্ত একটুখানি হাসে। জগৎসংসারে মানুষের কত তাড়া থাকে। নিশিকান্তর নেই, তাই বউমণি বকে বকে হয়রান। সারাদিন কোথাও বসে নিশিকান্ত একটু যে ভাববে তার উপায় নেই। কানে পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিলে নিশিকান্তর ভাল সব ভাবনা-চিন্তা আসে। মাদার গাছটার তলায় বসে শুকনো উদাস দিনে নিশিকান্ত নিরিবিলি কানে পালক দিয়ে যখনই ভাবতে বসে তখনই বউমণির হাতে একটা লাটাইয়ে সুতোয় ঠিক টান পড়ে। ডাকে—নিশি··· ই। নিশি অমনি চিন্তার শূন্যে উড়তে উড়তে টান খেয়ে চমকে ওঠে। ভাবনা-চিন্তা সব লাট খেয়ে যায়।

সওদা করতে গিয়ে নিশিকান্ত ঠিকঠাক হিসাব মেলাতে পারে না। বউমণি নিয়ম করেছে অঙ্ক শিখতে হবে। বিপিনবিহারীর তাই আজকাল রাতের দিকে তাকে হিসাব শেখানোর ঝোঁক চাপে। বলে—বল দেখি দু টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা থেকে এক টাকা আশি পয়সা বাদ দিলে কত থাকে? তখন তার দুনিয়াটাই কেমন ঝাগসা হয়ে যায় এই বাদলা দিনের মতো। কত থাকে! তাই তো! কত থাকে! দুটাকা পঁয়তাল্লিশ থেকে এক টাকা আশি বাদ দিলে অনেক থেকে যায় মনে হয়। নাকি কিছুই থাকে না! দশটা বিড়ির দাম যদি

হয় পাঁচ পয়সা, একটা ম্যাচিস দশ....তাহলে....কত যে থাকে। বাদ দিতে গিয়ে জান কাঠকয়লা হয়ে যায়। আর তখন গাঁট্টা মারে বিপিন। বলে—তোর কত বয়স খেয়াল আছে!

—হুঁ-উঁ! নিশিকান্ত বলে—দেড় কুড়ি।

—দূর ভূত, এক কুড়ি তো টোকারই বয়স। তুই তো আমার চেয়েও বড়। পঞ্চাশের কাছাকাছি তো হাবেই।

তাই হবে। বয়সের হদিস জানলে এ দশা হবে কেন তার!

আবার কিছু খারাপও সে নেই। বিস্মরণ হওয়াটা যে মন্দ সে টের পায় না। বেশ আছে। টর্চবাতির আলোয় যেটুকু দেখা যায় সেটুকু দেখে দেখে সে চলেছে ঠিক। আজ যা ঘটে তা বড়জোর এক হপ্তা সে মনে রাখতে পারে, তার ওপারে সাদা বৃষ্টি সব ঢেকে রাখে। বিস্মরণ হচ্ছে ঠিক টর্চবাতির আলোর চৌহদ্দির বাইরের অন্ধকারের মতো, বাদলা দিনের মতো।

চা-টা খেয়ে উঠে পড়ে নিশিকান্ত। সবাই জানে সে হচ্ছে একটু মাঠো লোক—ধীরস্থির, ঢিলাঢালা। কিন্তু তা বলে যে ইচ্ছে মতো কোথাও বসে থাকবে তার উপায় নেই। লাটাই বউমণির হাতে, সে হচ্ছে এক লাতন ঘুড়ি। যত দূরেই যায় নিশিকান্ত হঠাৎ হঠাৎ চমকা টান টের পায় সুতোর। লাট খায়। ঠিক যেন বউমণি ডাকে —নিশি-ই।

ছাতাটা না খুলেই সে বৃষ্টির জলে ছপাত পা ফেলল। যা বাতাস! ছাতা খুললে রক্ষে আছে, উড়িয়ে নিয়ে যাবে হাত থেকে।

এখানকার মাটি বেলে, তাই তেমন পিছল নয়। তবু দু একবার পা হড়কায় নিশিকান্তর। চবাস চবাস করে বৃষ্টি চাবকাচ্ছে, মাথা মুখ ফুটো করে দিয়ে যাচ্ছে রে বাবা। জলে ঝাপসা হয়ে আসে চোখের দৃষ্টি, কান বন্ধ। আবছা আবছা দোকানঘর, মানুষজন দু একটা দেখা যায়। জগৎসংসার যেন বা থেমে গেছে দম ফুরানো ঘড়ির মতো।

মহেন্দ্র তার অবস্থাটা চোখ তুলে দেখে। দর্জিঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নিশিকান্ত কাপড় নিঙড়ে নেয়, পিরানটা খুলে জল চিপে মাথা গা মুছতে থাকে। ছাতাটা আগাগোড়া খোলেনি সারা রাস্তা, তবু ছাতাটা ভিজে গেছে। মহেন্দ্র হেঁকে বলে—ছাতা বাইরে রাখ, তুমিও বাপু ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে গায়ের জল ঝরিয়ে এসো। এ বাদলায় ঘর যদি ভেজে তো শুকোবে না।

তাই করে নিশিকান্ত। দাঁড়িয়ে থাকে।

মহেন্দ্র কল চালাতে চালাতে বলে—ছাতাটা তো সারা জীবন বগলেই দেখলাম। কোনোদিন খুলেছো?

—খুলি মাঝে মাঝে, রোদে শুকোতে যখন দিই।

মহেন্দ্র হাসে। বলে—নিশি, ছাতাটা তো ভোগে লাগালে না। তবে কেন বয়ে বেড়াও হে?

—কাজে লাগে। নিশিকান্তর উদাস উত্তর।

মহেন্দ্রর শাগরেদ গুপে পাটির ওপর বসে একটা জামার কলার ঠিকঠাক করছিল। সে দাঁতে কামড়ানো ছুঁচটা বের করে হাসল, বলল—কাজটা কী?

—সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাতেই কাজে লাগে।

গুপে আর মহেন্দ্র নিজেদের মধ্যে একটু চোখ ঠারাঠারি করে।

নিশিকান্ত দাঁড়িয়েই থাকে। ঐ তার স্বভাব বলা যায়। সময়ের জ্ঞান থাকে না, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা দরকার তা বিচার করতে পারে না। একটা বিড়ি ধরানোর চেষ্টা করে। বর্ষায় ম্যাচিসের কাঠি সব ম্যাদা মেরে গেছে, ঠুকলেই বারুদ খসে যায়। অনেক কষ্টে অবশেষে ধরে ওঠে বিড়িটা। মিয়ানো গলায় বলে—জিনিসটা দিয়ে দাও, বেলাবেলি চলে যাই।

মহেন্দ্র সেলাই করতে করতে বলে—যাবে যাবে। একটু বসে যাও। জলটা ধরে যেতেও তো পারে?

বসতে বলায় নিশিকান্ত বসে। চৌকাঠের কাছে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে বলে—আর ধরেছে।

এইটুকু বলেই তার কথা ফুরোয়। আর কিছু ভেবে পায় না। মানুষে মানুষে যে কত কথা বলাবলি হয়। বাসে আসতে সামনের সিটে দুই হাটুরে বসে তাদের বিকিকিনি, লাভালাভ, বাজার এবং ভগবান নিয়ে কত কথা বলে গেল। মানুষের মাথায় কথাও আসে বাবা, যেন শেষ নেই। নিশিকান্তর মাথায় আসে না। আবার এও ঠিক, যদিই বা দু চারটে কথা তার প্রাণে আসে তো তা শোনারও লোক নেই। কথা বলার জন্য, প্রাণ ঢেলে কথার বাদলা নামিয়ে দেওয়ার জন্য এক-একবার তার বিয়ের বাই চাপে। সুন্দরপানা মেয়ে-ছেলের সঙ্গে ফুলের মালা বদল করে হ্যাজাকের আলোয় বিয়ে—সে ভারী একটা রহস্যময় আমুদে ব্যাপারও বটে। তার ছাতাটার সঙ্গে

এমনি এক বিয়েপাগলামির গল্প জুড়ে আছে। মায়াচরের কাছে সেবার ভীমপুজো দেখতে গিয়ে নিশিকান্তর আলাপ এক জোচ্চোরের সঙ্গে। অনেক কথা বিস্মরণ হয়ে হয়েও যে দুচারটে তার মনে আতরের তুলোর মতো গন্ধমাখা হয়ে থাকে বহুদিন বাদেও, তেমনি কোনো কোনো কথা মনে থেকে যায়। জোচ্চোরটা নিশিকান্তকে প্রথম নজরেই জরিপ করে নিয়েছিল। ভীমের বিশাল মূর্তি জরাসন্ধকে পেড়ে ফেলে ঠ্যাং ফাঁক করে চিরে ফেলে বধ করছে, এ দৃশ্য দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিল সে। জোচ্চোরটা তার ভাবসাব দেখে ধরে নিয়ে গিয়ে চা সিগারেট খাওয়ায়। দুচার কথার পর নিশিকান্তর বিয়ের ইচ্ছেটা জানতে পেরে বলে—পুরুষ মানুষের আবার বিয়ের ভাবনা, চাকর-বাকর মুনিশ-মুটে ভিখিরি যাই হও বউ ঠিক জোটে।

ভীমপুজোর মণ্ডপ থেকে পুরোপাক্কা তিন ক্রোশটাক হাঁটিয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছিল মেয়ে দেখাবে বলে। আর ততক্ষণে নিশিকান্তর চুরি করে জমানো পয়সা ফাঁক করেছিল বিস্তর। বিয়ের আশায় নিশিকান্ত 'না' করেনি। লোকটা ফুলুরির দোকানে দাঁড়িয়ে যায়, সিগারেট কেনে, দুচারটে বাজারহাট সারে, নিশিকান্ত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে হয়রান। তার ওপর ধার বলে পয়সা নিয়ে নিয়ে নিশিকান্তর ট্যাঁক ফাঁক করছিল লোকটা। একটা অচিন গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে একটা কোঠাবাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে বলল—এই হচ্ছে আমার বাড়ি। নিজের বাড়ি বলে মনে করে নাও। যাও ঐ বাইরের ঘরে গিয়ে বোসো, আমি আট্টু বাজার ঘুরে সেরটাক মাংস নিয়ে আসি, মস্ত একটা খাসি কেটেছে শুনলাম। খাসির তেলের বড়া খাও তো?

খুব খায় নিশিকান্ত। তাই ঘাড় নেড়েছিল। তখন বেশ দুপুর হয়ে গেছে। লোকটা বলে—আজ এবেলা থেকেই যেতে হবে তোমাকে, ওবেলা মেয়ে দেখিয়ে দেবো, তারপর পাকা কথা বলে যেও।

নিশিকান্ত খুব রাজি। লোকটা চলে যেতে সে দিব্যি কোঠাবাড়ির বাইরের ঘরে গিয়ে বসল। চেয়ার-টেয়ার পাতা ভাল বন্দোবস্ত। বসে থাকতে কিছু বাদে সেখানে এক খিটকেলে বুড়ো এসে হাজির। কী চাই, কাকে চাই প্রশ্নে বিরক্ত করে তুলল। খ্যাঁচকল আর বলে কাকে। জোচ্চোরটার নামও মনে রাখেনি নিশিকান্ত, কেবল বলে—এ বাড়ির কর্তাই আমাকে বসতে বলে গেছে গো। বুড়োটা খ্যাঁকশিয়ালের মতো হুয়া হুয়া শব্দ করে বলে—বাড়ির কর্তা তো আমি, নিত্যহরি গোঁসাই।

নিশিকান্ত তখন গম্ভীর হয়ে বলে—তাহলে তোমার ছেলেই হবে, আমাকে বসিয়ে রেখে বাজার গেল মাংস আনতে, খাসির তেলের বড়াও খাওয়াবে বলেছে দুপুরে। বুড়ো তখন তেড়ে মারতে আসে—বৈষ্ণবের বাড়িতে খাসির মাংস। বেরোও, বেরিয়ে যাও।

কোথায় একটা ধন্ধ থেকে গিয়েছিল, তাই সবটা না বুঝেই বেরিয়ে এসেছিল নিশিকান্ত। কোঠাবাড়ির বারান্দায় ছাতাখানা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো। কার ছাতা, কোথা থেকে এসেছে এতসব জানার দরকার মনে হয়নি তার। হাতটানের স্বভাবের দরুন অভ্যাসমতোই নিশিকান্ত ছাতা বগলে করে বেরিয়ে এসেছিল।

জগৎসংসারে এই ছাতাখানার বাবুগিরি ছাড়া তার আর বেশি কিছু নেই। যক্ষীর মতো সে ছাতা আগলে থাকে। রোদে জলে খোলবার জন্য নয়, কেবলমাত্র বাবুগিরির জন্যই বয়ে বেড়ায়। ছাতার ইজ্জতই আলাদা।

—শুনতে পাই, তোমার ছাতার সঙ্গে নাকি তোমার কথাবার্তা হয় নিশি! মহেন্দ্র একখানা পায়জামার পা টানা সেলাই করতে করতে বলে।

নিশিকান্ত লজ্জা পেয়ে যায়। মুখে বলে—দূর, বিপিনদার যতো বানানো কথা।

—না গো, বানানো হবে কেন। বিপিন নিজের কানে শুনেছে, নিশুতরাতে উঠে বসে তুমি নাকি ছাতাকে তোমার দুঃখের কথা বলো, আর নাকি ছাতাও তোমার কথার সব জবাব-টবাব দেয়! ছাতার গলার স্বর নাকি একটু খোনা-খোনা, কিন্তু কথা ভারী পরিষ্কার!

গুপে ছুঁচ হাতে চেপে কলারটা পাট করতে করতে বলে—হ্যাঁগো নিশিদা, তোমার ছাতাটা মেয়ে না ছেলে!

—আমি ওসব জানি না বাবু। তোমরা বড় দিক্ কর। জিনিসটা দিয়ে দাও। চলে যাই।

—কথাটা চেপে যাচ্ছো নিশিদা, কিন্তু সেই পলতাবেড়ে থেকে বাগনান তক্ সবাই জানে যে তোমার ছাতাটা মেয়েছেলে।

—যাঃ।

—মাইরি। গুহ্য কথা আমাদের না হয় না বললে, কিন্তু ভাব-ভালবাসার কথা হচ্ছে আতর এসেন্সের মতো, চেপে রাখা যায় না। ছড়াবেই।

মহেন্দ্র পায়জামার পাখানা সরিয়ে রেখে আর একখানা পায়ের পট্টি মারতে লাগে, বলে—কথা আরো আছে। শুনি ঐ ছাতাখানার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।

—যদি হয় তো নেমন্তন্নটা কোরো বাপু। বলে গুপে।

নিশিকান্ত তেতে উঠে বলে—পেছুতে লাগবে তো চললাম বলছি। গিয়ে বিপিনদাকেই পাঠিয়ে দেবখন।

মহেন্দ্র গুপেকে একটা ধমক দেয়—তোর যত ইয়ার্কি কথা। বসো নিশি, রাগ করো না।

নিশিকান্ত বসে। দেরি হচ্ছে। একটা হাই তোলে সে। মহেন্দ্রর কলখানা দেখতে তার বড় ভাল লাগে। কলকব্জা এক আশ্চর্য জিনিস। কোথাও কিছু না, পায়ের নিচে একখানা পাটা নড়ছে আর ওপর খাপে ছুঁচখানা বৃষ্টির ফোঁটার মতো কপাকপ নেমে এসে সেলাই ফেলে যাচ্ছে!

বড় আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা। কলখানা যতবার দেখে ততবারই তার ভিতরে একটা কী যেন মনে পড়ি-পড়ি করে। পড়ে না অবিশ্যি। ওটাই তো তার রোগ। বড় বিস্মরণ। তার মনখানা বাদলা দিনের মতো, টর্চবাতির আলোর মতো। এতকটা দেখা যায়, বাদবাকি সব বিস্মরণের বাদলায়, কালিঢালা অন্ধকারে ঢাকা।

বসে থাকতে থাকতে ঢুলুনি এসে গিয়েছিল তার। গুপে ডেকে তোলে তাকে। চুয়ার বোতলটা হাতে দিয়ে বলে—দিনক্ষণ দেখে বিয়েটা সেরে ফেল বাপু। আইবুড়ো মেয়েছেলে নিয়ে রাত-বিরেতে বসে থাকো, এ ভাল কথা নয়। ছাতারও তো সমাজ আছে।

বোতল নিয়ে নিশিকান্ত উঠে পড়ে। দরজার কোণে ছাতাটার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেখে, নেই।

—ই কী! নিশিকান্ত বলে ওঠে।

মহেন্দ্র গম্ভীর মুখ তুলে বলে—কী হলো!

—ছাতাখানা!

—নেই?

—না। তোমরা লুকিয়েছো।

—আমরা! গুপে হাঁ করে চেয়ে থেকে বলে—পরের মেয়েছেলে লুকোবো আমাদের তেমন ভাবো নাকি!

—ছাতাটা কী হল রে গুপে? মহেন্দ্র নিরীহ মুখে জিজ্ঞেস করে।

—হবে আর কী। একটু আগে কতগুলো লোধা মেয়েছেলে বৃষ্টির মধ্যে হুড়মুড়িয়ে এসে উঠেছিল। এ ঠিক তাদের কাজ। নিশিদা ঢুলছিল তখন খেয়াল করেনি।

নিশিকান্ত ক্ষেপে গিয়ে বলে—দিয়ে দাও বলছি।

গুপে বলে—তোমার ছাতারও স্বভাব বলিহারি। কোন আক্কেলে তোমার মত ভালো মানুষটাকে ছেড়ে না বলে কয়ে চলে গেল!

ভারী রেগে যায় নিশিকান্ত। ডাক হাঁক করে গাল পাড়ে—তোমরা দুটো চোরের ব্যাটা, গর্ভস্রাব…

গুপে গম্ভীর মুখে বলে—তা মুখ খারাপ করলে কী হবে! লোকে যে বলে তুমি ছাতা-চোর। আমি অতশত জানি না বটে, কিন্তু শুনেছি ঐ ছাতা-মেয়েছেলেটাকে তুমি মায়াচরের কোন গেরস্তর ঘর থেকে ভাগিয়ে এনেছো!

নিশিকান্তর মাথার মধ্যেটা ভারী বেসামাল হয়ে যায়, বলে, কোন রাঁড়ির ব্যাটা বলে, কোন্…ইত্যাদি।

মহেন্দ্র বিরক্ত হয়ে বলে—মুখ খারাপ করবে না বলছি। দিয়ে দে গুপে ওর ছাতাখানা। খিস্তির চোটে জল গরম করে দিল!

রেগে গেলে নিশিকান্ত এরকম। হাট মাঠ ঘুরে যা গাল শোনে তার কিছু মনে রাখে সে। কারণ, ঐ হচ্ছে তার অস্ত্রশস্ত্র। লোকে তাকে দিক্ করলে তাকেও তো কিছু করতে হয় তখন!

গুপে উঠে চৌকির তলা থেকে ছাতা বের করে দিল। তারপর আচমকা পিছনে একটা লাথি দিয়ে বলল—বেরো শালা!

লাথিটা খেয়ে দরজাটা ধরে সামলে নেয় নিশিকান্ত।

—এ-ই-ই...বলে মহেন্দ্র চেঁচিয়ে উঠে—মারিস না। আর একটু হলে বোতলটা হাত থেকে পড়ে ভাঙত।

—শালার বড় মুখ। গুপে বলে রেগে।

নিশিকান্ত তখন গুপের মা বাবা তুলে নোংরা খিস্তি দিয়ে বেরিয়ে আসে। গুপে অবশ্য ছাড়ে না। দৌড়ে এসে ঠাঁই করে মাথায় একটা কী দিয়ে মারে। ঝিম্‌ঝিম্ করে ওঠে নিশিকান্তর মাথা। সে বোতলটা অবশ্য চেপে রাখে বুকে। ভাঙলে বউমণি আর বিপিন তো আর গুপের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আসবে না। মেরে তারই গা-গতর ব্যথা করে দেবে। নিশিকান্ত রাগে অন্ধকার হয়ে বৃষ্টির মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে চেঁচায়—গু খা, গু খা রাঁড়ির ছেলে…

গুপে আবার বেরিয়ে আসে। দূর থেকে একটা মাটির ভাঁড়ই বুঝি ছুঁড়ে মারে তাকে। নিশিকান্তর বুকে এসে লাগে সেটা। নিশিকান্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাল দিতেই থাকে—আমার পা খা, বাঁ হাত খা হেগো খা…

অনেকক্ষণ ধরে বকে বকে নিশিকান্তর মাথা ফর্সা হয়ে গেল। আসলে কাকে বকছে সেটাই ভুলে গেল সে। কী হয়েছিল তাও মনে পড়ে না আর। তখন নিশিকান্ত ভারী অবাক হয়ে চুপ করে যায়। কার ওপর রেগে গিয়েছিল, কেন গাল দিচ্ছিল কিছুই তেমন মনে পড়ে না।

•

এদিকে বৃষ্টি থেমে চাঁদ উঠে গেছে কখন। দোকানে দোকানে ঝাঁপ পড়ে যাচ্ছে! অবাক নিশিকান্তর ভিতরে একটা সুতোর টান লাগে। লাটাই বউমণির হাতে। নিশিকান্ত-ঘুড়ি তাই চমকে ওঠে, লাট খায়। বউমণি নিশ্চয়ই ডাকছে—নিশি-ই।

খাড়ুবেড়ের মোড়ে যখন নামল নিশিকান্ত, তখন পৃথিবীটা বড্ড অদ্ভুত হয়ে আছে। কী এক ভুতুড়ে চাঁদ উঠেছে আজ আকাশে। চারধারে মেঘের কালি, তার মাঝখানে ফ্যাকাসে একটা ড্রম। বারবার মেঘ ডাকছে পাথর ঘসা শব্দে। তিনদিন বাদে বৃষ্টি এই ধরল। জাড়ের মাস নয়, তবু কেমন শীত ঝরিয়ে দিচ্ছে আকাশঠাকুর। জলে জলময় পৃথিবীটা সাদাটে হয়ে পড়ে আছে অলক্ষুনে জোছনায়।

যেমন ভয় ভূত প্রেত ব্রেহ্মদৈত্যকে, তেমনি ভয় বিপিনবিহারী আর বউমণিকে। খালধারে পিছল মাটি ধরে প্রাণপণে হাঁটে নিশিকান্ত। মাথায় একটা টাটানো ব্যথা! মাজায় ব্যথা। কখন কোথায় লাগল ঠিক খেয়াল কর'ত পারে না সে।

তিনদিন ধরে লক্ষ হাত দিয়ে মাটিকে মেখেছে আকাশ। মাখাজোখা হয়ে তাই ভুতুড়ে জোছনায় সিঁটোনো পৃথিবীটা পড়ে আছে। মেখেছিল বিপিনবিহারীও বউমণিকে। বর্ষা বাদলায় কাজকর্মে বড় সংক্ষেপ। হাঁড়িকুড়ি ছাড়া আর কিছু সকড়ি করেনি বউমণি। কলাপাতা কেটে হড়হড়ে খিচুড়ি ঢেলে খাওয়া। ঘাটলার কাজ ছিল না, কাচাকুচি ছিল না, রোদে দেওয়া জিনিস টানাটানি করা ছিল না। ঘরমোছা ছিল না। বউমণি তেপহর বিছানায় পড়ে থাকত। বিপিন মাঠে একটু চাষের কাজ দেখে এসেই দরজায় হুড়কো তুলে দিত।

ভিতরে কী হত তা কি আর বোঝে না নিশিকান্ত। সেও ওই মাখামাখিরই ব্যাপার। বিকেলে আমতেল দিয়ে মাখা মুড়ি কাঁচালংকা কামড়ে খেয়ে বিপিন যেত বাজানিদের বাড়িতে, ধর্মকথা শুনতে।

কিন্তু ধর্মকথার আগেও কথা থাকে পরেও কথা থাকে। বৃষ্টি-বাদলায় সেই সব কথাই কলঙ্কের কথার মতো ছড়িয়ে গেল। চারধারে ফিসফাস গুজগুজ। নিশিকান্ত একা একা হাসে।

খালধারে একটা আগুন জ্বলছে বিশাল। আগুনের ধারে কালো কালো লোকজন। বাবলাগাছের আড়ালে বড় বড় সব ছায়া নড়াচড়া করছে। নিশিকান্ত থমকে দাঁড়িয়ে যায়। দূর থেকে কাণ্ডটা দেখে আর তখন একটা পোড়া-ঘিয়ের বদ গন্ধ উড়ে আসে। আর আসে চামড়া পোড়া চিমসে মতো গন্ধ।

নিশিকান্ত মাথা নেড়ে আবার হাঁটে। নেতাইয়ের ঠাকুমাটা মরল বোধ হয়। জোর কদমে হেঁটে চলে আসে আগুনের কাছে। বাঁধা শ্মশান বলতে কিছু নেই এখানে, যে যেখানে পারে মড়া পোড়ায়। বাবলা-তলায় একটু উঁচু জমি পেয়ে ওরা এখানেই কাজ সেরে নিচ্ছে।

নেতাই মাল খেয়ে চেল্লাচ্ছিল। স্যাঙাতদের মধ্যে কে যেন চিতা থেকে চ্যালাকাঠ টেনে বিড়ি ধরিয়েছে, তাতে অপমান হয়েছে নেতাই-য়ের। চেঁচিয়ে বলে—কোনো শালা চিতা থেকে বিড়ি ধরাবে না বলে দিচ্ছি। আমার ঠাকুরমার চিতা শালা, কারোর বাপের নয়—বলে দিচ্ছি।

স্যাঙাতদের একজন সান্ত্বনা দিয়ে বলে—বিড়ি নয় রে, সিগারেট····

—কেন ধরাবে? ওর বাপের চিতা শা··· ?

বলতে বলতে নেতাই বাবলাতলা থেকে উঠে খালের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে পেচছাপ করে। আর বলে—আমার ঠাকুমার শালা পুণ্যি দেখ, চিতা নিভে যাবে ভয়ে বৃষ্টি থেমে গেছে। দেখেছিস কখনো অমনধারা শালা? বিড়ি ধরাচ্ছিস চিতা থেকে। আমার ঠাকুমার সম্মান নেই?

স্যাঙতরা খি-খি করে হাসছে।

নিশিকান্ত দেখে, নেতাইয়ের ঠাকুমার মুখখানা দেখা যাচ্ছে। এখনো সেখানে আগুনটা পৌঁছায়নি। চোখের পাতায় চন্দন, তাতে তুলসীপাতা সাঁটা। পোড়ার সময়টায় মানুষের কেমন লাগে তা বড়

জানতে ইচ্ছে করে নিশিকান্তর। দু কদম এগিয়ে এসে সে ছাতা আর বোতল হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে! কেউ কিছু বলে না। সব ব্যাটা বোতল টেনে যাচ্ছে। বেসামাল।

আর হঠাৎ যেন কেউ দেখছে না দেখে, ফাঁক বুঝে নেতাইয়ের ঠাকুমা টক করে চোখ চাইল। নিশিকান্তর কিছু মনে থাকে না। বড় বিস্মরণ। কিন্তু নেতাইয়ের ঠাকুমা চোখ খুলে ভালমানুষের মতো তার দিকে তাকাতেই নিশিকান্তর ঝড়াক করে মনে পড়ে গেল, বহুকাল আগে, পেটব্যথায় বুড়ি কাতরাচ্ছিল একা ঘরে। তখন নিশিকান্ত বাবলার কচিপাতা থেঁতো করে রস খাইয়ে সারিয়েছিল ব্যথা। সেই বাবলা গাছের তলায় নিশিকান্ত দাঁড়িয়ে, আর চিতার আগুনের মধ্যে আধপোড়া নেতাইয়ের ঠাকুমা। চোখে চোখ পড়তেই যেন বলে ওঠে, কী বাবা মনে পড়ে?

মনে পড়ে? মনে পড়ে? বাদলা কেটে মনের মধ্যে একটা জোছনা যেন ভেসে ওঠে হঠাৎ। পড়ে বই কি। কত কী মনে পড়তে থাকে হঠাৎ। নিশিকান্ত টের পায় মনে পড়ার বেনো জল হঠাৎ বাঁধ ফাটিয়ে ধেয়ে আসে যে। নিশিকান্ত ছাতাটা সাপটে ধরে বোতল চেপে ধরে বুকে। একটা আঁক চিৎকার পেড়ে আবার খালধারের রাস্তায় উঠে আসে।

কিন্তু তবু মনে পড়া কি ছাড়ে! আকাশ থেকে হঠাৎ টাপুর-টুপুর খসে পড়ে অতীতের জল। পড়তেই থাকে! নেতাইয়ের স্যাঙাত দু'পা এগিয়ে এসে তাকে ধরে—কী বাবা বোতলে? কোথায় নিয়ে যাচ্ছো বাবা নিশি!

—ছেড়ে দাও। বলে নিশিকান্ত একটা ঝটকা মারে। আর ওই ঝটকাতেই টর্চবাতির আলোর মতো তার বর্তমানটা ছিটকে যায়। বাদলা দিনে ছোট পৃথিবীটা হঠাৎ যেন আদিগন্ত দেখা যায়। মনে পড়ে। মনে পড়ে।

তার নাম নিশিকান্ত নয়। সে নয় এদেশের লোক। নীলকুঠির ধারে একটা ছোট কুঠিবাড়ি ছিল তাদের। মা ছিল মনোরমা, বাবা চন্দ্রনাথ। সুখের ছিল সংসার। জায়গাটা কী যেন! কী যেন! মনে পড়ে, বেঁটে লিচু গাছের বন ছিল সেখানে, থোকা থোকা ফল ধরত, পাকা সড়কের ওপর ছিল ইস্কুলবাড়ি, তার ঘণ্টা বাজত ঢং ঢং, নিশি-কান্তকে ডাকত।....মনে পড়ে, মনে পড়ে...

কিন্তু কী যে যন্ত্রণার ঝড় ওঠে বুকের মধ্যে! হাহাকার এক বাতাস বয়ে যায়। কী হয়েছিল তারপর? অতীতের বৃন্তিট মাতালের মতো টলে টলে পড়ে, দোল খায়। মার, দাঙ্গা, আগুন কী সব হয়েছিল, দাড়িওলা, কালি-মাখা মশাল হাতে কিছু লোক...তারা পায়খানার তলায় নোংরায় লুকিয়ে কাঁপছে। মনে পড়ে···রেল লাইন, ইস্টিশান, ...লঙ্গরখানা....

নিশিকান্ত চিৎকার করে পিছলে পড়ে যায়। রাস্তা বেভুল। কোথায় যাচ্ছে সে? কার কাছে? জোছনায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে চারধারে চায় নিশিকান্ত। এ সে কোথায়?

মাঠের মাঝখানে ছাতা আর বোতল হাতে সে দাঁড়িয়ে আকাশজোড়া পৃথিবীটা দেখে। কী প্রকাণ্ড! সে একা। হারিয়ে গেছে।

ভুতুড়ে জোছনার হাহাকার চারদিকে। তার ঘর নেই, বাড়ি নেই, কেউ নেই।

আঁ—আঁ—আঁ বাক্যহারা চিৎকার দিতে থাকে নিশিকান্ত। চোখে জল আসে। সে উপুড় হয়ে পড়ে মাঠের কাদায়, জলে। কোমর-সমান ডুবে যায়! মাথা চেপে ধরে বিড়বিড় করে বলতে থাকে—ভুলিয়ে দাও, ভুলিয়ে দাও···

ঠিক সময়ে একটা সুতো কে যে গুটিয়ে নেয়, লাটাইয়ে হাত্তা মারে। টান লাগে। ঘুড়ি টাল খায়। বউমণি বুঝি ডাকে—নিশি-ই...

—যাই। বলে কাদাজল থেকে ওঠে নিশিকান্ত। ছাতাটা আর বোতলটা চেপে ধরে বুকে। পিরানের হাতায় চোখ মুছে নেয়। ঘুড়ির সুতো গুটিয়ে নিচ্ছে বউমণি। বড় টান! চাকর বল চাকর, জন বল জন, টান একটা আছেই।

বেশ আছি বাবা, বেশ আছি। বিড়বিড় করে বলে নিশিকান্ত। পৃথিবীটা আবার বাদলা দিনের মতো ছোট হয়ে এসেছে। টর্চবাতির আলোর চৌহদ্দিতে বাঁধা জীবন। আগুপিছু আর কিছুই দেখা যায় না। এই বেশ আছে নিশিকান্ত। এবার নিশ্চিন্তে সে হাঁটে।

বনমালীর বিষয়

এইখানে বনমালী বাগান করেছে। বাগানের মাঝখানটিতে তার লাল ইঁটের বাড়ি। বলতে কী, যৌবনকালটা তো সুখে কাটায়নি বনমালী। বড় কষ্ট গেছে। সে সময় সে ঘর ছেড়ে কাপড়ের গাঁট নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিল। মহাজন ধারে কাপড় দিত, নইলে এ-ব্যবসাও শুরু করতে পারত না সে। ক্রমে ফিরি করতে করতেই তার শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ের কাছে দোকানটা হয়ে গেল। সারাটা জীবন সে দেখেছে, মানুষের লজ্জা ঢাকার জন্য বস্ত্রের বড় প্রয়োজন। বস্ত্র ছাড়া উপায় নেই।

বনমালী সেই মানুষের লজ্জা ঢাকার বস্ত্রের ব্যবসায়ে এখন সুখে আছে। এই যে বাগান, এই যে লাল ইঁটের বাড়ি, এ-ও হচ্ছে মানুষের বস্ত্র। এসব দিয়ে মানুষ লজ্জা ঢাকে। বনমালী তার সারাটা যৌবন-কালের দীনতার লজ্জা ঢেকেছে। বাগানে হরেক ফুল, কত নার্শারি ঘুরে ঘুরে বীজ আনে সে, কত জায়গা থেকে নিয়ে আসে গাছের চারা, লাগায়।

সামনে ফুলের বাগান, পিছনে ফলের। সামনে যেমন ফোটে গোলাপ, বেল, শেফালি, পপি, কিংবা চন্দ্রমল্লিকা, কাঠচাঁপা, তেমনি পেছন দিকে রয়েছে মর্তমান কলার ঝাড়, কেরালার নারকোল গাছ, আম, লিচু, পেয়ারা সুপুরি, কাঁঠালের গাছ। শীতকালে পালং বুনে দেয়, বাঁধা আর ফুলকপি, আলু মুলো বেগুন লঙ্কা সব গাছ লাগায়। অবসর সময়ে ছুটির দিনে সারাদিন বাগানে ঘুরে ঘুরে গাছ দেখে সে। ভারী একটা বিস্ময় তার বুকে থমকে থাকে। এই যে গাছ হয়, ফুল ফোটে, ফল ফলে—এটাই একটা অবাক কাণ্ড। কী করে এক মাটি, এক সার থেকে এত রকমের রঙ আর রস তৈরি হয় তা সে বুঝেই পায় না। মাটির ভিতরে বোধহয় তাহলে সবই লুকিয়ে থাকে। এই ফুল ফোটা, ফল হওয়ার সব গুপ্ত রহস্য!

ফিরি করার সময়ে সে যেত কত বাড়িতে। বিচিত্র সব বাড়ি, বিচিত্র সব মানুষ থাকে তাতে। বনমালী বেরোতো দুপুরের দিকে, যখন বাড়ির কর্তারা থাকেন বাইরে। গিন্নিরা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে

জিনিস রাখে—এটা কর্তাদের পছন্দ নয় কখনো। মেয়েরা ঠকেই। দশ টাকার জিনিস কমিয়ে সাত টাকায় রাখে, তবু দেখা যায় দু টাকা ঠকে গেছে। কর্তারা তাই ফিরিওয়ালা বাড়িতে এলে ভারী বিরক্ত হন, গিন্নিদের ধমকটমক করেন। বনমালী তাই দুপুরে বেরোত। ধার বাকিতে জিনিস দিত, ভারী মিষ্টি ছিল তার ব্যবহার। ডবলের বেশি দাম হেঁকে রাখত, যাতে কমিয়ে কমিয়েও গিন্নিরা তল না পায়। বনমালীর জিত হত বরাবর। এখন তার শ্যামবাজারের দোকানে 'ফিক্সড্ প্রাইস' লেখা কয়েকটা প্লাস্টিকের ছোট বোর্ড ঝোলে। এখন সে আর কষ্ট করে দর কষাকষির মুখে ফেনা তোলা ব্যবসাতে নেই। তা সেই ফিরিওলা বনমালী যখন বাড়ি বাড়ি যেত তখন সে মানুষের বাড়ির ভিত দেখত, জানালা দরজা দেখত, গ্রিল দেখত, আসবাব দেখত। তার মন বলত—যদি কোনোদিন হয়, ভগবান সুদিন দেন তো এরকম বাড়ি করব। সামনে বারান্দা থাকবে, তাতে পদ্ম আর রাজহাঁসের নকশাওলা গ্রিল, ঘরে ঘরে বাথরুম থাকবে, ছাদে থাকবে, ঠাকুরঘর.... এরকম নানা কথা ভাবত, ভেবে রাখত বনমালী। ঘরে টিউবলাইট, রেডিও, রেফ্রিজারেটার, গ্রামোফোন, সবই থাকবে। আর থাকবে বৌ। সুন্দরী লক্ষ্মীমন্ত।

সবই হয়েছে বনমালীর। ভগবানের ইচ্ছা। বাগান হয়েছে, হয়েছে লাল ইঁটের দেড়তলা ছিমছাম সুন্দর বাড়িখানা। সামনে পদ্ম আর হাঁসের নকশাওলা গ্রিল। গ্রীষ্মের রাতে স্নান করে এসে যখন বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে সে, তখনই বেল আর গোলাপের গন্ধ, আরো নানা গন্ধ। সবচেয়ে ভাল লাগে মাটির ভিজে স্নিগ্ধ গন্ধটি। একই মাটি থেকে কোন্ ম্যাজিকওয়ালা যে এতরকম রঙ আর রস তৈরি করছে! বনমালীর বিস্ময় এখানেই শেষ হয় না। বসে বসে সে চারদিক দেখে। তার বিষয় সম্পত্তির ওপর যখন আবহমানকালের চাঁদের আলো পড়ে, তখন তার মনে হয়, তার এক জীবনের দারিদ্র্যের লজ্জা কেমন সুন্দর বাগানের ফুলের গন্ধে, বাড়িটার ছিমছাম সৌন্দর্যে চাপা পড়ে গেছে। বিষয় হচ্ছে মানুষের আত্মার সবচেয়ে বড় বস্ত্র। কী করে এই দুর্লভ বস্ত্রটি পেয়েছে! এইটে ভেবেই তার বিস্ময় আর শেষ হতে চায় না। সে চুপ করে বসে থাকে। মুখটি হাঁ হয়ে যায়, চোখে পলক পড়ে না। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেলে তার বৌ এসে ডাক দেয়—বলি ভুতে পেয়েছে নাকি! ভাবছো কী হাঁ করে।

বনমালী চমকে উঠে তার বৌয়ের দিকে চায়। বিস্ময় তার শেষ হয় না সত্যিই। এই যে রমণীটি—এ হচ্ছে তার সেই মহাজনের মেয়ে। খেটেখুটে বনমালী উন্নতি করল দেখে সে ভারী খুশি হয়েছিল। একদিন তাকে ডেকে বলল—দেখ বনমালী, ছেলের মতো তোমাকে দেখেছি এতদিন। দেখলাম, তুমি বাহাদুর বটে। তোমার মতো ছেলেকে ছাড়তে ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে, তোমাকে বেঁধে রাখি। আমার পয়সার অভাব নেই, বড় তিনটে মেয়েকে সোনা জহরত আর টাকায় মুড়ে ভাল ঘর-বরে বিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ভাল ঘর-বর বলতে লোকে বোঝে টাকাওলা বনেদী বংশ। বনেদী বংশে মেয়ে দিয়ে সুখ পাইনি। জামাইরা সব পৈতৃক টাকায় খায় দায় বাঁশি বাজায়, ঘুড়ি আর পায়রা নিয়ে আছে। পরিশ্রমী, লড়িয়ে মানুষ নয়। ভাবছি শেষ মেয়েটাকে আর ওসব অপদার্থের গলায় ঝোলাব না। তোমার এখন উঠতি সময়, এখনো দাঁড়াওনি। তবু তোমাকেই দেবো, যদি রাজি থাকো।

বনমালী রাজি হয়ে গেল। মেয়েটিকে সে দেখেছিল। সুন্দরীই বলা যায়। রঙটা চাপার দিকে, মুখখানা গোলগাল। কিন্তু সব মিলিয়ে চটকদার। ঘন ভ্রূ, টানা চোখ, গালে টোল। সেই মেয়েটিই এখন তার বৌ। বনমালীর এও এক বিস্ময়।

মহাজনের মেয়ে। ওর বাপের না হোক দশ-বারো লাখ টাকার কারবার। যৌবনকালে ওর বড়বাজারের দোকানের সামনের হাতায় ঠাণ্ডায় বসে থাকত বনমালী। সারা দিনটা কলকাতায় দৌড়ঝাঁপ। পৃথিবীটা তখন ভারী পিছল জায়গা বলে মনে হত। কোথাও দাঁড়ানো যাচ্ছে না। দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে গেলেই পা হড়কায়। প্রাণপণে তখন পৃথিবীতে লেগে থাকার চেষ্টা এক নাগাড়ে চালিয়ে যাচ্ছে বনমালী। বাপ রিফিউজি কলোনিতে দুখানা ঘর তুলতেই মাজা ভেঙে বসে পড়েছে। তার আটটি ছেলেপুলে, বনমালী বড়। তাকে ডেকে বলেছে—রাস্তা দেখ।

তা সারাদিন রাস্তাই দেখতো বনমালী। কত রাস্তা, কত অলি-গলি, কী বিচিত্র কায়দায় কলকাতা শহর কেটে কেটে রাস্তা বানিয়েছে মানুষেরা। তখন বনমালীর বিশ্বাস ছিল, কলকাতা শহরে আগে তৈরি হয়েছে বাড়িঘর, দোকানপাট। তারপর সেই জমাট বাড়িঘর আর দোকানপাটের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে মানুষেরা শাবল গাঁইতি চালিয়ে এই সব অলিগলি তৈরি করেছে। রাস্তাঘাটগুলো তাই এমন গোলমেলে।

সারাদিন রাস্তা দেখে দেখে বনমালী ক্লান্ত হয়ে এ বাড়ির রক, সে বাড়ির বারান্দায় বসত। লোকে অচেনা লোক বিশ্বাস করে না। হুড়ো দিত। বনমালী আবার উঠে রাস্তায় হাঁটত। ক্রমে সে দেখেছিল রোদ উঠলে, গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে ছায়ার জায়গা হচ্ছে বড়বাজার। সেখানে কাটারার ঘিঞ্জিতে কোনোকালে দিনমণির আলো পড়েনি। দুপুরের দিকটায় তাই বনমালীর বাঁধা আস্তানা ছিল বড়বাজার। সেখানে ব্যাপারি খদ্দেরের ভিড়ে দিব্যি গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যেত। হুড়ো যে কেউ দিত না তা নয়। তবু বেশির ভাগ ব্যাপারিই গা করত না। তার মহাজন, হবু শ্বশুরের দোকান-ঘরটার সামনে একধাপ সিঁড়িতে বসে থাকত সে। দেখত, দোকান-ঘরে টিউবলাইট জ্বলে, পাখা ঘোরে, খদ্দেরের ভিড় গায়ে গায়ে, টাকার গাদি লেগে যায় ক্যাশবাক্সে।

মহাজন একদিন এক বড় খদ্দেরকে খাতির করতে গিয়ে বনমালীকে ডেকে বলে—যাও তো খোকা, লাটুর দোকানে তিন কাপ চা বলে এসো তো। বোলো দুখীরামবাবুর চা, তাহলে বেশি দুধ-চিনি দিয়ে দেবে।

সেই হল বনমালীর পয়লা দড়ি, যা দিয়ে নিজেকে সে পিচ্ছিল পৃথিবীর সঙ্গে আজও আটকে রেখেছে। চা বলে এল বনমালী। পরদিন সিগারেট এনে দিল। ক্রমে ক্রমে মহাজন তাকে দিয়ে আরও ফাইফরমাস করতে লাগল। যত করায় তত করে বনমালী, টুঁ শব্দটিও না করে, ফলের আশা না রেখে। 'কী করো খোকা? কোথায় থাকো?'—এরকম দু-একটা প্রশ্নও তাকে মহাজন কখনো কখনো করেছে।

মহাজনের দোকানে দু-একবার কাপড়ের গাঁট বাঁধল সে। দু-এক জায়গায় মাল পৌঁছে দিয়ে এল। ঐভাবেই একদিন মহাজনের মনের মধ্যে সে সেঁধিয়ে গেল। আর মনের মধ্যে একবার সেঁধোতে পারলে আর ভয় নেই। মানুষের মনই হচ্ছে মানুষের ঠিক বাসা। সে দোকানে ঢুকল বিশ টাকা মাইনের কর্মচারী হয়ে। কয়েকদিন পর মহাজনকে ঘাড় চুলকে বলল—কয়েকখানা বাছাই কাপড় ধারে দিন। মহাজন দিল। গোপনে কাপড় বেচে এল সে, টাকা শোধ করল। এইভাবে তার ব্যবসা শুরু। ক্রমে ক্রমে বেশি কাপড়, আরো বেশি কাপড় নিতে নিতে সে একদিন আলাদা হয়ে ফেরিওলা হয়ে গেল।

মহাজন দুখীরাম আপত্তি করেনি। কেবল চোখটা সে খোলা রেখেছিল।

সেই মহাজনকে বরাবর গৃহদেবতার পরের আসনটাই দিয়ে রেখেছিল সে। তার বাড়ির জামাইও যে হওয়া যায় এমনটা তার কখনো মনে হয়নি।

সে রাজি হয়ে গেল। মহাজন দশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে সে এক এলাহি বিয়ে দিল তাদের। লোক খাওয়াল হাজার দুই। সেই ম্যারাপ, আলো, ফুল, লোকজন, উপহার সবই স্বপ্নের মতো মনে হয়। বিয়ের পরও কয়েকদিন সে তার বৌয়ের অঙ্গস্পর্শ করতে ভয় পেত। কেমন যেন মনে হত—আরেব্বাস, এ তো মহাজনের মেয়ে!

বলতে কী, বনমালীর আজও তা মনে হয়।

বাগানে জ্যোৎস্না পড়লে কি ফুল ফুটলে হাঁ করে দৃশ্যটা দেখে বনমালী। তা সেই মহাজনের মেয়ে যখন এসে তাড়া দেয় তখন বনমালী হঠাৎ মুখ তুলে তার বৌকে ঠিক বৌ বলে বিশ্বাস করতে পারে না। বিস্তর রাম-চিমটির দাগ বনমালীর শরীরে আজও আছে। স্বপ্ন দেখছে মনে করে নিজেকে জাগানোর জন্য বিস্তর চিমটি কেটেছে।

তা এখন বনমালীর মনে হয়, স্বপ্ন ব্যাপারটা ভারী গোলমেলে। গত কয়েক বছর ধরে সে একনাগাড়েই বোধ হয় স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যেই করছে বসত। সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে—যদি স্বপ্নেই রেখেছো তো শেষ দিনতক্ আর ঘুমটা ভাঙিও না বাবা।

বনমালী বাহারী বাগান করেছে এইখানে। নানা রঙে রঙিন বাগানের মাঝখানটিতে তার বাড়ি। কলকাতা থেকে জায়গাটা দূরে নয়। কিন্তু কলকাতার বাইরে, বালি-সাকালতলা। বাঁশঝাড় আছে, পুকুর আছে, পুরোনো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আছে, রাতে শেয়াল ডাকে, জ্যোৎস্না উঠলে টের পাওয়া যায়। কলকাতা আর ভাল লাগে না বনমালীর। বিয়ের পরও বছর সাত-আট তার কলকাতার নবীন পাল লেনের পুরোনো ভাড়াটে বাসায় কেটেছে। তার বৌ—আসলে যে মহাজনের মেয়ে—সে-ই তাগাদা দিত। বলত 'বাড়ি করো, বাড়ি না করলে পৃথিবীতে ঠিক শেকড় গাড়ে না মানুষ। তুমি যে বড়লোক, প্রতিষ্ঠাবান, তার প্রথম প্রমাণই হচ্ছে দিনের শেষে তুমি অন্যের বাসায় না ফিরে ফিরছো নিজের বাড়িতে। ভাড়াটে বাড়ির দেয়ালে একটা পেরেক ঠুকলেও বাড়িওয়ালা দৌড়ে আসে। এ আর ভাল লাগে না।'

চৌপর দিন ঘুরে, দালালের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, বিস্তর দেখে-শুনে মহাজনের মেয়ের পছন্দমতো বালির মাকালতলায় জমি নিল বনমালী। গ্রামও নয়, শহরও নয়। ইলেকট্রিক আছে, দোকানপাট আছে। বাড়ি থেকে টানা তার শ্যামবাজারের দোকানে পৌঁছোতে বড় জোর পঁয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশ মিনিট লাগে।

তার বৌ অতসীকে সে বাড়ির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চিন্ত হল। এখন সকালবেলা গৃহদেবতাকে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করে নিজের বাড়ির থেকে বেরোয় বনমালী। পৌনে সাতটায় ট্রেন ধরে। পৌনে আটটার মধ্যে ধূপধুনো দিয়ে দোকান খুলে ফেলে। বাচ্চা একটা চাকর আছে, সে চা এনে দেয়। বাড়ি থেকে যখন বেরোয় তখন প্রায় দিনই চা খেয়ে আসা হয় না। মহাজনের মেয়ের বেলা পর্যন্ত ঘুমোনোর অভ্যাস। সকালে উঠলে সারাদিন মেজাজ ঠিক থাকে না। ঠাকুর আছে, বাচ্চা একটা কাজের মেয়েও আছে বটে, কিন্তু বনমালী কাউকে খাটায় না। এক গ্লাস ইসবগুলের ভুশি খেয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে চলে আসে। সকালের প্রথম চা-টি খায় দোকানে বসে।

দোকানখানা তার নিজের। একার। কোন অংশীদার নেই। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ের কাছে এই দোকানঘরখানা যদি বনমালী এখন ছেড়ে দেয় তবে লাখ দেড়েক সেলামি লেগে যাবে। বনমালী হাজার দশেক দিয়ে নিয়েছিল দশ বছর আগে।

ঘরখানা বড়ই, একনম্বর সেগুন দিয়ে তৈরি তার বিশাল বিশাল আলমারি, শো-কেস, কাউন্টার। কাউণ্টারের গায়ে ইদানীং সানমাইকা লাগিয়ে আরো বাহার খুলছে। দোকানটা চার ভাগে ভাগ করা। এক কাউণ্টারে তাঁত ও সিল্ক. অন্যটাতে মিলের সুতি, সিল্ক, টেরিলিন। একটাতে রেডিমেড, আর সবশেষে হোসিয়ারী। শীতকালে পশমী জিনিস, শাল-মলিদা, সোয়েটার, সুটের কাপড়। লাখ টাকার মাল মজুত রয়েছে দোকানে। কাচের ওপাশে হরেক রঙের বাহার। বনমালীর জীবনে রঙের অভাব নেই। বাড়িতেও রঙ, দোকানেও রঙ।

দোকানের ঠিক মাঝখানটিতে একটি কংক্রিটের থাম। ঘরটার ভারসাম্য রাখার জন্যেই তৈরি। চৌকো থামখানা বিশ্রী দেখায়, তাই বনমালী ভাল পালিশ কাঠে থামখানা আগাপাশতলা ঢেকে চারধারে চারটে সরু, লম্বা আয়না লাগিয়েছে। থাম ঘিরে গোল একখানা

কাউন্টার। থামের একপাশে পেতলের রেলিংওলা ক্যাশের খোপে বসে বনমালী, অন্য ধারটায় প্যাকিং আর ডেলিভারি।

সাতসকালে ধোঁয়া ওঠা পুরো এক গ্লাস সুগন্ধী চা সামনে রেখে বনমালী হাই তোলে। আর চারদিকে চায়, আলাদিনের গল্পের সেই দৈত্য, নাকি মহাভারতের সেই দানব ময়—কার যে কীর্তি তা ঠিক বুঝতে পারে না।

লোকে বলাবলি করে, বনমালী বড় উন্নতি করেছে।

উন্নতি? তা অবশ্য বনমালী অস্বীকার করে না। উন্নতি বই কি! কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা আছে একটা। উন্নতির চেয়েও বেশি হচ্ছে একটা বিস্ময়বোধের জন্মলাভ, এ দোকান যে তারই, সেই যে মালিক, এর যে আর কোনো মহাজন নেই সেটা তার ঠিকমতো বিশ্বাস হতে চায় না। এ দোকান সে কি নিজে করেছে! এ কি তারই! তার বর্ণহীন জীবনে এত রঙের বাহার কবে খোলতাই হল!

কারবার দাঁড়িয়ে গেলে আপনিই চলে, তার জন্য হালদারি শিকদারির আর দরকার হয় না। একবার কারবারটা বেঁধে ফেলতে পারলেই হল। পেতলের রেলিং ঘেরা ক্যাশ কাউণ্টারে বসে পাখির পালকে কানে সুড়সুড়ি দিতে দিতে আরামে আধবোজা চোখে বনমালী দেখে, তার কারবার চলছে। চোখ পুরোপুরি বুজে থাকলেও চলবে। কাপড় মাপা হবে, কাটা হবে, প্যাকিং হবে, ক্যাশে এসে দাঁড়াবে লোকজন, বনমালী টাকা গুনে-গেঁথে তুলবে, ইনকাম ট্যাক্স, পুলিস, কর্পোরেশন সব বন্দোবস্ত—মত চলবে। মাঝে মাঝে দুপুরের দিকে বড়বাজারে মাল তুলতে যাবে বনমালী, কিংবা রেল-ইয়ার্ডে মাল ছাড়াতে। কিছু কষ্ট নেই সেই সব নড়াচড়ায়। টাকার ছবিতে বড় বাহার। সব সয়। বড় ছেলেটা দশে পা দিল। মেরেকেটে আঠারো হলেই কারবার বোঝাবে। ততদিন বেঁচে থাকলেই হল। বড় ছেলেটা একটু বুঝে গেলেই আর চিন্তা নেই। শুধু সেটুকুর জন্য, কয়েক বছর সময়ের জন্য একটু দুশ্চিন্তা তার। মোটা ইন্সিওরেন্স করে রেখেছে নিজের আর বৌয়ের, দোকানও ইন্সিওর করা, তবু ভয় একটু থেকেই যায় সেটাকে ইন্সিওর করা চলে না। আর আট-দশ বছর সে কি বাঁচবে না? বাঁচবে, এখনো সে পোক্ত আছে বেশ। মাত্র পঁয়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ বছর, ঠিকমতো বাঁচলে আরো বহুদিন তার বাঁচার কথা।

বিকেলের দিকে সত্যচরণ আসে। গাঁটরি বওয়ার আমলে তার সঙ্গে ভাব হয়েছিল। দিনের শুরুতে ঠিক করে নিত কে কোন্ রাস্তায়

ফিরি করবে। সেই থেকে বন্ধুত্ব। সত্যচরণ তেমন কিছু করতে পারল না। রিফিউজি কাটারায় দোকান দিয়েছে একটা। চলে না তেমন। স্টকও রাখতে পারে না। শরীরটাই সত্যচরণের জুতের নয়। রোগা-ভোগা, তার ওপর নেশা-ভাঙ, একটু মেয়েমানুষের দোষও ছিল, গায়ে পারা উঠে যাচ্ছেতাই ভুগছিল একবার। জমানো টাকা সব তাতেই গলে গেল। শেষমেশ রিফিউজি কাটারায় দোকান ছাড়া আর উন্নতি করতে পারল না সে। ছেলেরা বড় হয়েছে, তাদের মধ্যে বড়টি দোকান দেখে, সত্যচরণ আসে বনমালীর দোকানে। দরজার কাছে টুলখানায় বসে থাকে। ছ'টা বাজলে বনমালী ক্যাশে সবচেয়ে বুড়ো আর বিশ্বাস কর্মচারী সুধীরবাবুকে বসিয়ে বেরিয়ে আসে।

দুই বন্ধুতে তেমন কোনো কথা হয় না, বনমালী একটা সস্তার নেশা শিখেছিল। মোদক। হেমদা কবিরাজের দোকানে এক সময়ে যেত বাবার জন্য স্বর্ণ-সিঁদুর কি চ্যবনপ্রাশ আনতে। সেই থেকে মদনানন্দ মোদকের বিজ্ঞাপনটা খুব টানত। হেমদার পর বরদা কবিরাজের আমলে সাহস করে কথাটা পেড়েছিল সে—মোদক একটু খেলে বোধ হয় প্রফুল্ল থাকা যায়, কী বলেন বরদাবাবু?

খুব হেসেছিলেন বরদা, বললেন—লজ্জার কী? প্রফুল্ল থাকলেই হয়।

সেই থেকে সে বাঁধা খদ্দের। নেশাকে নেশা, গন্ধ বেরোয় না, মাতলামি নেই, কেবল একটা বুঁদ হয়ে যাওয়া আনন্দের ভাব আছে।

সেবার যখন সত্যচরণ লিভারের বারোটা বাজিয়ে কদিন প্রাণান্ত-কর ন্যাবায় ভুগে উঠল তখন তার বৌ তাকে দিয়ে মা কালীর পা স্পর্শ করিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় যে মদ খাবে না। মদ ছেড়ে ভারী মুশকিলে পড়ে গেল সে। বনমালী তখন তাকে মোদক ধরায়। বরদা কবিরাজের দোকানে এখন দৈনিক যাতায়াত, কবিরাজও বন্ধু হয়ে গেছে। পয়সার বেশ সাশ্রয়। কেবল সত্যচরণ খুঁতখুঁত করে বলে—মাইরি বরদাবাবু, শুনেছি মৃতসঞ্জীবনীতে নাকি এইট্টি পারসেন্ট অ্যাল-কোহল আছে!

—আরো কম। বরদা কবিরাজ চেয়ারে কেতরে বসে হাঁটু দুটো তুলে নাড়তে নাড়তে বলে।

—তোমরা কি আর সেই অ্যালকোহল দাও নাকি। বলে সত্যচরণ হাই তোলে।

—তবে কী দিই ?

—কাঁচা ধেনো। একটা বোতল দিও তো, চেখে দেখবো।

বনমালী কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলে—যা নিয়ে আছো তাই নিয়ে থাকো। একটারই বশ হও।

সত্যচরণ রোগে ভুগে খেঁকি হয়ে গেছে, সহজেই খ্যাঁক করে ওঠে। বলে—সেই জন্যই তো তোমার টাকা ছাড়া আর কিছু হল না। তুমি ঐ একটি জিনিসের বশ।

—আর কী হবে শুনি। বনমালী দাপটে বলে।

সত্যচরণ তখন কথা খুঁজে পায় না। বিড়বিড় করে।

নেশা জমে এলে বনমালী মিটিমিটি হাসে—টাকা হলে সংসারী মানুষের আর কী হওয়ার থাকে! অ্যাঁ! আমি ভেবে তো পাই না। কী বলেন বরদাবাবু ?

বরদা রবাপকেলে ব্যবসা এখন ঝুল। পুরোনো আমলের ঘর ভাড়া কম বলে দোকান টিকে আছে। যুদ্ধের বাজারে লাখোপতি হওয়ার জন্য বরদা বিস্তর পাথরকুঁচির ব্যবসা করতে গিয়ে ঘোল খায়, নইলে এতদিনে সে দোকান তুলে দিত। এখন দোকানের কলে ইঁদুরের মতো আটকে পড়ে গিয়ে খাবি খায়। মোদকের খদ্দেররাই বাঁচিয়ে রেখেছে। সালসা-টালসা, সুধা কিংবা পাঁচনে চলে না। বরদা কবিরাজ তাই ফলাও মোদক বানায়। খদ্দের প্রায় বাঁধা। বনমালীর কথা শুনে একটু ছটাকে হাসি হেসে বলে—তাই তো। টাকাই হচ্ছে সংসারের সুতো, যেমন ইচ্ছে মালা গাঁথা যায়।

সত্যচরণ সেটা মানতে চায় না। বলে—বনমালী, তোমার সত্য উপলব্ধিই তো হল না। এই যে পৃথিবীতে জন্মেছো, এর কটা জায়গা দেখলে তুমি ? কটা মানুষের সঙ্গে ভাব ভালবাসা হল ? জীবনের একশো মজা আছে তার কটা মজার স্বাদ পেয়েছো ? মদ খেলে না, মেয়েমানুষের কাছে গেলে না, কাশী হরিদ্বার বৃন্দাবন কি লণ্ডন নিউইয়র্ক গেলে না—ধুস্ ওটা কি জীবন ? তুমি হচ্ছো গিয়ে সাদা দেয়াল, ছবি-ছক্কর নেই, রঙ নেই, দূর দূর…সাঁঝের বেলা মোদক চেটে ভাম্ হয়ে বসে থাকো, এর বেশি তোমার আর কিছু হল না।

ততক্ষণে নেশা জমে আসে। চোখে লাল নীল নানরকম রঙ দেখে বনমালী। দেখে কলকাতার রাস্তাঘাটে কেমন সব বাহারী রঙ, কেমন আলো, কেমন মিঠে বাতাস বইছে! এ সময়ে তার মনের ওপর

একরকম মাখনের প্রলেপ পড়ে যায়। কোনো কথাতেই রাগ হয় না, বরং ভালবাসতে ইচ্ছে করে। সত্যচরণের কথা শুনে তাই সে মৃদু হাসে। দুলে দুলে হাসে। তারপর বলে—বিশ্বরূপ দেখতে ত্রিভুবন ঘুরতে হয় না। আমি আমার দোকানে বসেই দেখি।

—আমার ইয়ে। বলে সত্যচরণ। তারপর মৃদু হেসে বলে—আর এক বিশ্বরূপ তোমার পরিবারের রূপে। তোমার মতো মাদী পুরুষ দেখিনি হে। অত ন্যাওটা হয়ো না বনমালী, একটু নিজের সংসারের বাইরের দুনিয়াটাকেও দেখ।

বনমালী ঝিমুনোর মধ্যেই বলে—যারা বাউণ্ডুলে তাদের ঘরে জায়গা হয় না, পরিবার বের করে দেয় বাড়ি থেকে। তখন তাদের অগত্যা বিশ্বরূপ দেখতে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। সত্যচরণ, সাফল্যের মধ্যে যে বিশ্বরূপ আছে তা তোমার দেখার কপাল নেই।

তর্ক হয়, ঝগড়াঝাঁটি হয়। তারপর একটা টানা রিক্সায় উঠে দুজনে ফিরে আসে। বনমালী ফিরে ক্যাশ মেলায়। সত্যচরণ হেঁটে বাড়ি ফেরে। যতটুকু বনমালীর রিকশায় আসা যায় ততটুকুই লাভ, তারপরের রাস্তাটুকু তার নিজের।

বনমালী জানে সত্যচরণ তাকে গাল পাড়তে পাড়তে বিড়বিড় করে বকতে বকতে বাড়ি ফেরে। তা হোক। বনমালীর রাগ হয় না। সত্যচরণের সঙ্গে তার অবস্থার তফাতটুকুই প্রমাণ করে যে বনমালীর উপলব্ধিই সত্য। সত্যচরণেরটা হচ্ছে গিয়ে প্রলাপ। তার রাগ করার দরকার হয় না।

নটা সাতের ট্রেনটা রোজ পায় না বনমালী। তার পরের ট্রেন নটা পঞ্চান্নোয়। লম্বা সময়। হাওড়া স্টেশনের মুখে বারোমাস কয়েকটা ছোকরা কাটামুণ্ডুর মতো ঝুঁটি ধরে কানফুল নাকফুলের মতো ছোটো ফুলকপির আঁটি বিক্রি করে। হাতে সময় থাকলে অসময়ের কপি সওদা করে বনমালী, স্টেশনের বাইরের দোকান থেকে মহাজনের মেয়ের জন্য ফল কেনে। মর্তমান কলাটা আবার মহাজনের মেয়ের বড় পছন্দ। ছেলেপুলের জন্য খেজুর কি আমসত্ত্ব, লিচু বা আম—সময়ের ফলপাকুড় কেনে। সওদা করেও সময় থাকে। তখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অন্যমনে নানা কথা ভাবে। বেশির ভাগই বাকি বকেয়া, মন্দা বাজার, সোনার দর, আয়কর, জমি ইত্যাদির কথা। কখনো-সখনো সত্যচরণের বিশ্বরূপেরও কথাও ভেবে ফেলে। সত্যটা পাগল। একটা জীবন ফক্কুড়ি করে কাটিয়ে দিল।

ট্রেনে পনেরো মিনিট বালি স্টেশন, তারপর মিনিট ছয়েকের হাঁটা-পথ। বাগানের ফটকে পা দিতেই অন্য জগতে চলে আসে বনমালী। ছবির মতো বাড়িখানা তার, চারদিকের ফুলবাগিচায় ডুবে আছে। নানা ঘরে নানা আলো, দরজায় পাতলা রঙিন লেস্-এর পর্দা ওড়ে। লাল, সবুজ, নীল, হলুদ সব টিউবলাইট জ্বলে ঘরে ঘরে। ধূপগন্ধ পাওয়া যায়। রেডিওর শব্দ আসে। ভাল রান্নার গন্ধ।

বাগানের ফটক থেকেই বনমালীর দ্বন্দ্বের শুরু হয়। এ বাড়ি কি তার! এই বাগান, ঐ আলো, ঘরে ঘরে সব দামী আসবাব, এ সব কি তার! মনে কিছুতেই বিশ্বাসটা আসে না। ঘেমো শরীর, সারা-দিনের পরিশ্রম, চিন্তা সব মিলিয়ে বনমালীর ভিতরটা শুকিয়ে থাকে। ভিতরে ভিতরে সে জানে পৃথিবীতে খুব সাধারণভাবে বেঁচে থাকাটাও কত কষ্টকর! কী পরিশ্রমটাই গেছে এক জীবনে! তাই বোধহয় এত আলো, মহার্ঘ জিনিসপত্র, বাগান এসব দেখে তার ভিতরটা কেমন চমকে ওঠে। এখনো রিফিউজি কলোনিতে তাদের পরিবার আলাদা পড়ে আছে। মা ভাই বোন। সম্পর্ক না থাকার মধ্যেই। বনমালী মাস মাস এক দুশো ধরে দেয়, ভাইরা খেটে খায়, একটা বোনের বিয়ে বাকি। সে বাড়িতে গিয়ে পা দিলে দুর্ভাগ্যজনক অতীতটা যেন হুড়-মুড় করে মাথায় ভেঙে পড়ে। সব মনে পড়ে যায়! সেই দুর্ভাগ্যের দিন তো খুব বেশি দূরে ফেলে আসেনি সে, তাই মনে পড়ে। এই সব বাড়িঘর, আলো, বাগান অবিশ্বাস্য লাগে।

মহাজনের মেয়েকে খুশি করা সহজ কথা নয়। টাকার খেলা সে মেয়ে দেখেছে বিস্তর। তাই বনমালীর অবস্থা ফিরলেও সে এখনো পুরোপুরি খুশি নয়। বাড়িঘর সে-ই সাজায়, ঘরে ঘরে নানা রঙের আলো জ্বালে, ছেলেমেয়েদের নিত্যনতুন পোশাক পরায়, নিজেও সাজে খুব। তাকে খুশি রাখার জন্যই পরিবারের সঙ্গে আর একত্র হল না বনমালী, বাড়ির লোকেরা তার কুৎসা গায় সেইজন্যে। বলে—মেড়া, কামাখ্যার যোগিনীদের বশ-করা পুরুষমানুষ—আরো কত কী! এত করেও মহাজনের মেয়ের মন পাওয়া গেছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বাড়িতে ফিরে বরাবর তার নিজেকে অতিথি অতিথি মনে হয়, ভয়ে ভয়ে অস্বস্তিতে আল্‌গা আল্‌গা থাকে সে! পরিষ্কার গেঞ্জি পরে, দামী লুঙি, চুল আঁচড়ায়, পায়ে মোষের-নাক চটি, রোজ দাড়ি কামাতে হয়—বিস্তর ঝামেলা। হাঁটুর ওপর লুঙি তুলে, বিড়ি

ফুঁকে, বিছানায় গড়ানোর গার্হস্থ্য আয়েস তার কপালে নেই। মহাজনের মেয়ে সব টিপ্ টাপ্ চায়। ছেলেমেয়েদের যে টেনে হিঁচড়ে বুকে নিয়ে হামলে আদর করে চিড়বিড়ে ভালবাসা মেটাবে, তারও উপায় নেই। ছেলেমেয়েরা মায়ের শাসনে আল্‌গা থাকে, গায়ে গায়ে মাখামাখি বারণ। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না উঠলে, কি ফুলের গন্ধ ছুটলে, কি অকারণ পুলকে মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, বৌকে বুকে চেপে ধরে লণ্ডভণ্ড করে দেয় পোশাক, গাল কামড়ে ধরে আল্‌গা দাঁতে, ঝামরে দেয় বাঁধা চুল। কিন্তু তা করতে গিয়ে থমকে যায়। সেই পুরোনো গণ্ডগোল। বৌকে বৌ মনে হয় না, মনে হয়—এ তো মহাজনের মেয়ে! ভারী একটা ভয়-ভক্তির ভাব এসে পড়ে তখন।

মোদকটা অনেকক্ষণ ধরে শরীরের ভেতর খেলা করে। রিম্‌ঝিমে একটা আনন্দের ভাব। দেহ নিশপিশ করে। সুন্দর বাগানের ভিতর দিয়ে বারান্দা পর্যন্ত কংক্রিটে বাঁধানো চওড়া রাস্তা পার হতে হতে সে দেখে, বারান্দায় মহাজনের মেয়ে দাঁড়িয়ে। গায়ে একটা নেট্-এর ফুলহাতা ব্লাউজ, বুকে-পেটে অনেকখানি খোলা জায়গা। এ ছাঁটের ব্লাউজ বনমালীর দোকানেও রাখা হয় না। মহাজনের মেয়ের পোশাক নিউমার্কেট থেকে আসে। পরনের মিহিন খদ্দরের ছাপা শাড়িটা পর্যন্ত বনমালীর দোকানের নয়।

—বাঃ বাঃ! বনমালী খুশি হয়ে বলে—দিব্যি কাট্‌টা তো ব্লাউজের! স্টক করবো নাকি!

—তোমার তো কেবল স্টকের চিন্তা। একটা জিনিস চোখে পড়েছে যখন, তখন তার সৌন্দর্যটা দেখ, তা না স্টক।

লজ্জা পায় বনমালী। হেঁ-হেঁ করে হেসে বলে—চোখে লাগল বলেই তো বললাম।

বৌ গম্ভীর হয়ে বলে—বাড়িতে এসে যখন দোকানদারি পোশাকটা ছাড়বে, তখন দোকানদারি স্বভাবটাও ছেড়ে ফেলবে। আমার বাবা বাড়িতে মেজাজী জমিদারের মতো থাকতেন।

বনমালী যে একদিন ফিরিওলা ছিল তা বোধহয় অতসী ভুলতে পারে না। দোষ নেই। নিজের অবস্থাকে আজও তো নিজেই সঠিক বিশ্বাস করতে পারে না বনমালী!

স্বপ্ন! সবই স্বপ্ন। মার্বেল-মাজা বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে ওডিকোলোন আর দামী পাউডারের গুঁড়ো গায়ে মেখে কিছুক্ষণ বারান্দায়

বসে বনমালী। বাগানে জ্যোৎস্না পড়ে, ফুলের গন্ধ আসে। নিজের গা থেকে প্রসাধনের গন্ধ ছড়ায়। পাশেই হেলানো চেয়ারে বসে থাকা অতসীর গয়নার টুং-টুং শোনা যায়। স্বপ্ন ছাড়া আর কি!

টেবিলে বসে রাতের খাবার খায় সে। মোদকের নেশার রেশটা তখনো থাকে। খাবারের স্বাদ ভারী ভাল লাগে। ছেলেমেয়েরা সব ইংরিজি স্কুলে পড়ে। অতসীর কড়া নিয়ম, বাড়িতেও ভাইবোনেরা পারতপক্ষে ইংরিজিতে কথা বলবে। খাওয়ার টেবিলের এধারে ওধারে ছেলেমেয়েরা পরস্পরের দিকে ইংরিজি কথা ছুঁড়ে দেয়, লুফে নেয়, বাবার দিকে চেয়ে হাসে। বনমালী ভাল বোঝেনা, কিন্তু ভারী একটা সুখ হয়। সেও হাসে। এ যেন কোন্ না কোন্ বড়লোকের সাহেবি কেতার খাওয়ার ঘরে তার মতো উটকো এক লোকের নিমন্ত্রণ, অস্বস্তিটা মোদকটাকে ধাক্কা মারে, নেশাটা ফিকে হয়ে আসে প্রায়। তবু হাসে বনমালী, সুখও হয়।

সত্যচরণ মাঝে মাঝে দু'হাতের বুড়ো আঙুল অশ্লীল ভঙ্গিতে নেড়ে তাকে দেখিয়ে বলে—এত যে করলে হে, কিছুই তোমার নয়। যখন পটল প্লাক্ করার সময় হবে তখন বুঝবে কী গু-খোরের কাজই করেছো একটা জীবন। নিজেকেই জানলে না বনমালী।

ফক্কড়। সত্যচরণের কথা ভাবতেই তার ঐ শব্দটাই কেবল মনে আসে। রাতে ভাল ঘুম হয় না বনমালীর। চারদিক নিশুত হয়ে গেলে সারা বাড়ি জুড়ে কে যেন, কারা যেন কেবলই খুটখাট শব্দ করে। উদ্বেগ। মহাজনের মেয়ে তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক খাটে ঘুমোয়। বনমালীর ঘর আলাদা, বিছানাও, তবু পাছে মহাজনের মেয়ের ঘুম ভাঙে সেই ভয়ে বনমালী বাতি জ্বালে না। টর্চ জ্বেলে জ্বেলে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। দরজা-জানালা ঠেলে দেখে, গ্রিলের দরজার তালা নেড়ে দেখে। আবার শোয়, ঝিমুনি আসে। আবার শব্দ পেয়ে ওঠে।

জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। অন্ধকারে ভূতের মতো ঘর থেকে ঘরে ঘুরতে ঘুরতে বনমালী তার বিষয়-সম্পত্তি দেখতে পায়। দেখে বাগানের জ্যোৎস্না। সুখ তাকে খামচে ধরে। সুখ তাকে যন্ত্রণা দেয়। সত্যচরণ বলে—একটা জীবন পরের ঘরেই বাস করলে বনমালী, সেটা টেরই পেলে না। ফক্কড়, কে কার ঘরে বাস করে দেখে যা হারামজাদা। চিরকাল মদ মেয়েমানুষের পিছনে উচ্ছন্নে গেলি। থু!

বেঁটে একটা ডেশাও কুকুর আছে অতসীর। কর্মের নয়। কেবল

হাত পা চাটে, আর পায়ে পায়ে ঘোরে। মাঝে মাঝে ভুক ভুক করে নরম আদুরে আওয়াজ ছাড়ে। বনমালীর সঙ্গে প্রায় রাতেই সেটাও ইঁদুরের মতো বেঁটে বেঁটে পায়ে তুড়তুড় করে ঘোরে।

ছাদের সিঁড়িঘরের দরজা দেখে পিছু ফিরতেই সে কুকুরটার লেজ মাড়িয়ে দিল। বলল—আঃ হাঃ, ব্যথা পাসনি তো! কুকুরটা আদুরে আওয়াজ ছাড়ে! গ্রিলের গেট-এ একটা শব্দ হয়। কে যেন দরজা নাড়ে।

বনমালী টর্চ জ্বেলে নেমে আসে। কুকুরটা দৌড়ে গিয়ে ভয় পেয়ে ফিরে আসে। পায়ের চারধারে ঘোরে। বনমালী গাল দেয়—ব্যাটা নিষ্কর্মা।

সদরটা খুলে বারান্দায় পা দিতেই ভীষণ চমকে যায় বনমালী। কোলকুঁজো এক মানুষ, গ্রিলের ওধারে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে।

চিলের মতো চিৎকার করে সে কে?

ছায়াটা ফিসফিস করে বলে—দাদা, আমি গো, আমি হরিপদ।

বনমালী ভারী অবাক হয়—হরিপদ? এত রাতে তুই কোত্থেকে?

—একবার বাড়ি চলো, মার অবস্থা খুব খারাপ।

—মা? বনমালী যেন কিছুক্ষণ বুঝতে পারে না। বাগবাজারের দোকানে, কি মাকালতলার বাড়ি জুড়ে তার যে জীবন তাতে মা তো নেই।

—অবস্থা কেমন বললি?

—ভাল নয়। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। রাত বোধহয় কাটবে না।

বনমালী চাবি এনে দরজা খোলে। চোরের মতো সাবধানে ঢোকে হরিপদ। এইসব বাড়িঘর দেখা তার অভ্যাস নেই, দাদা-বৌদি নিষ্পর! বলে—কুকুব সামলাও।

—কামড়াবে না, ঘরে আয়। শব্দ সাড়া করিস না, তোর বৌদির আবার পাতলা ঘুম।

অন্ধকারেই মাথা নাড়ে হরিপদ—না, না, সেসব আমরা জানি।

ঘরে এসে দুই ভাই অন্ধকারে মুখোমুখি বসে। বাতি জ্বালে না বনমালী, মহাজনের মেয়ের ঘুম বড় পাতলা।

—কী হয়েছে?

হরিপদ মাথা নিচু করে বলে—কী আর হবে। বুড়ো হয়েছে।

বয়সটাই তো রোগ। যেবার বাবা ফেঁপে-ফুলে মরে গেল, সেই থেকে মা আর মা নেই। তুমি তো অতশত খবর রাখো না। মার বড় টান ছিল তোমার ওপর।

ফিসফিস করে বনমালী জিজ্ঞেস করে—কীরকম টান?

হরিপদ বলে—দেরি কোরো না দাদা, যদি যেতে চাও তো চলো. সাড়ে বারোটায় শেষ ট্রেন। যদি তুমি না যাও, আমাকে ফিরতেই হবে।

বনমালী তবু ওঠে না, একটু চুপ করে থেকে বলে—যাচ্ছি। টানের কথাটা কী যেন বলছিলি!

—মার খুব টান ছিল তোমার ওপর। প্রায়দিনই তালের বড়াটা, নারকোলের নাড়ুটা বানিয়ে কৌটোয় ভরে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিত তোমাকে দেওয়ার জন্য।

—তোরা কখনো দিসনি তো!

—দেবো কী! বৌদি রাগারাগি করবে হয়তো, আর সেসব কি এখন আর তোমরা খাও! ভাল ভাল খাবার তোমাদের। আমরা তাই সেসব নিজেরাই লুকিয়ে খেয়ে ফেলতাম। তবু মা মরে মরে তৈরি করত। কতদিন তোমাকে দেখতে চেয়েছে। গত তিন-চার মাস একটানা মা তোমাকে দেখেনি। দাদা, ওঠো। বেশি সময় নেই।

—উঠি। বলে একটা শ্বাস ছাড়ে বনমালী!

—উঃ দাদা, কী পেল্লায় বাড়িখানা বানিয়েছো, কী বাগান!

বনমালী ধমক দেয়—আস্তে। তোর বৌদি উঠে পড়বে। শব্দ করিস না।

হরিপদ মিইয়ে যায়। ফিসফিস করে বলে—প্রত্যয় হয় না।

—কী?

—এসব যে তোমার।

—আমারও হয় না। বলে বনমালী অন্ধকারেই কাপড় বদলাতে বদলাতে বলে—হরিপদ—

—উঁ।

—তোর বৌদি জেগে যাবে, এইটাই ভয়। নইলে—

—নইলে কী?

বনমালী আবার একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—নইলে আমি একটু কাঁদতুম। আমার বড় কাঁদতে ইচ্ছে করছে রে!

দুর্ঘটনা

ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে অংশু যখন নানা ব্যথা-বেদনা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াতে পারল তখনো ধাঁধার ভাবটা তার যায়নি। সাধারণত দুর্ঘটনায় পড়লে খুব জোরালো ধাক্কায় মনের ক্রিয়া কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। পূর্বাপর কিছু মনে পড়ে না। মন যুক্তিহীন আচরণ করতে থাকে। তবে এ স্মৃতিভ্রংশ নয়। অংশু জানে।

নিজের ছোট্ট প্রিয় ফিয়াট গাড়িটার ছয় ছত্রখান চেহারাটা অংশু খুব মন দিয়েই দেখল। যাকে বলা যায় টোটাল ডিজইন্টিগ্রেশন। চেসিস ছাড়া কিছু আস্ত নেই বা যথাস্থানেও নেই। একটা দরজা উপুড় হয়ে পড়ে আছে ঢালু জমির ঘাসের ওপর। দরজার এক প্রান্ত দিয়ে একজোড়া ভারী সুন্দর পা ও গোলাপী সালোয়ারের প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। আঙুলে রূপোর চুটকি, নখে পালিশ।

নিচু হতে খুব কষ্ট হচ্ছিল অংশুর। কোমরটার জখম বোধহয় বেশ গভীর। তার বয়স বিয়াল্লিশ। এ বয়সে এ ব্যথা সহজে সারবার নয়। তবু নিচু হয়ে অংশু দরজাটা তুলবার চেষ্টা করল। প্রথমবারে পারল না। দ্বিতীয় চেষ্টায় পারল।

অংশুর ভিতরে কোনো শব্দ এমনিতেই ছিল না। দরজার তলায় দৃশ্যটা দেখে তার ভিতরটা যেন আরো নিস্তব্ধ ও চিন্তাশূন্য হয়ে গেল। রাণু বেশি যন্ত্রণা পায়নি নিশ্চয়ই। মাথাটা তুবড়ে গেছে পিছন থেকে। মৃত্যু ঘটেছে তৎক্ষণাৎ।

অংশু দরজাটা ছেড়ে দিলে সেটা ফের রানুর ওপর ধর্ষণকারীর মতো চেপে বসে যায়। অংশু হাইওয়ের দিকে মুখ তুলে তাকায়। হাইওয়ের এই অংশটা খুবই নির্জন। টানা লম্বা রাস্তার দুদিকটায় ফাঁকা। তবু দুর্ঘটনার গন্ধে লোক জুটবেই। এখনো জমেনি। একটু পর পর দু দুটো লরি ঝড়ের বেগে চলে গেল।

তার গাড়িটাকে মেরেছে একটা লরি। তার দোষ সে লরিটাকে ওভারটেক করার চেষ্টা করেছিল। কয়েকবার চেষ্টা করেও প্রথম-দিকে পারেনি। লরিটা সাইড দিচ্ছিল না। কত রকমের বদমাশ ড্রাইভার থাকে। অংশুর সন্দেহ লরিওলা তার গাড়ির আয়নার

সামনের সিটে বসা অংশুর পাশে রাণুকে দেখছিল। রাণু তো দেখার মতোই। মেয়েছেলে দেখলে কিছু কিছু পুরুষ অদ্ভুত আচরণ শুরু করে দেয়। লরির ড্রাইভার সম্ভবত সেরকমই একজন। বহুক্ষণ ধরে লরিটা অংশুর পথ আটকে রেখে যাচ্ছিল। কখনো খুব স্পিড দিচ্ছিল, কখনো ঢিলাঢালা ভাবে এগোচ্ছিল।

ঠিক এই জায়গাটাতেই অংশু একটু ফাঁক পেয়ে অত্যন্ত তীব্র গতিতে লরিটাকে পাশ কাটাচ্ছিল। না কাটালেও ক্ষতি ছিল না। তবে রাণু বার বার বলছিল, উঃ, সামনের লরিটার ডিজেলের ধোঁয়া আমার একদম সহ্য হচ্ছে না। ওটাকে কাটাও তো। তাই কাটাচ্ছিল অংশু। তবে এ সময়ে সে একটা মারাত্মক ভুল করে। ড্রাইভারের কেবিনটা সমান্তরালে চলে আসতেই অংশু বাঁ দিকে চেয়ে একটু নিচু হয়ে ড্রাইভারের উদ্দেশে চেঁচিয়ে গাল দিয়েছিল, এই শুয়ারকা বাচ্চা, মাজাকি হো রহা হ্যায়?

ড্রাইভারটা কোন্ দেশী তা বলা শক্ত। লরিওয়ালাদের কোনো দেশ থাকে কি? বিশেষ করে দূরপাল্লার লরিওয়ালা? অংশু দীর্ঘকাল হাইওয়েতে গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এই সব লরিওয়ালা যে দেশেই হোক,চণ্ডীগড় থেকে ডিব্রুগড় বা দিল্লি থেকে ব্যাঙালোর ট্রিপ মেরে মেরে এদের গা থেকে প্রাদেশিকতা মুছে গেছে। এদের দেশ, ঘর সব এখন এক লরির প্রশস্ত কেবিন। ফিয়াটের ঘাতক লরিওয়ালার মুখটায় খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল, মুখখানা ছিল প্রকাণ্ড, মাথায় বড় বড় রুক্ষ চুল, রোমশ হাত। একবার জানালা দিয়ে তাকাল ছোট্টো ফিয়াটের দিকে। তারপর আচমকা লরিটা ডানদিকে ঘেঁসতে শুরু করল অত্যন্ত বিপজ্জনক ভাবে। অংশু তখনো পুরোপুরি কাটাতে পারেনি, পিছোনোরও উপায় নেই।

কী হচ্ছে তা বুঝবার আগেই রাণুর দিকটায় লরিটা প্রথম ধাক্কা মারে। সেটা এমন কিছু গুরুতর ছিল না। অংশু সামাল দিতে পারত। রাণু একটা তীব্র চিৎকার করে উঠেছিল বটে, কিন্তু তাও পারত অংশু। কিন্তু লরিটা রসিকতা করছিল না। টাটার সেই অতিকায় হেভি ডিউটি ট্রাক অংশুর দেওয়া গালাগালটা ফেরত দিল দ্বিতীয় ধাক্কায়। সেটা ঠিক ধাক্কা নয়। রোড রোলার যেমন থান ইঁট ভেঙে চেপে বসিয়ে দেয় রাস্তায়, অবিকল সেই ভাবে পিসে দিল প্রায়।

অংশু নিজের ট্রাউজারের ভেজা ভাবটা টের পেল এতক্ষণে। না রক্ত নয়। গাড়িটা যখন তাকে আর রাণুকে গর্ভে নিয়ে চক্কর খেয়েছিল তখন অংশুর পেচ্ছাব হয়ে যায়। অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে একটা। অংশুর একটু গা ঘিনঘিন করল।

বলতে কি এই গা ঘিন ঘিন করাটাই দুর্ঘটনার পর অংশুর প্রথম প্রতিক্রিয়া। এছাড়া তার মন সম্পূর্ণ ফাঁকা, সুখ-দুঃখ শূন্য।

একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে অংশু তার গাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে সরে এল। নিচের দিকে ঢালু জমি গড়িয়ে গিয়ে একটা চওড়া নালায় শেষ হয়েছে। নালাটা জলে ভর্তি। দুটো ছাগল নির্বিকার ভাবে আগাছা চিবোতে চিবোতে উঠে আসছে। অংশু একটা গাছের তলায় ছায়ায় বসল। কিছু করা উচিত। কিন্তু কী তা সে স্থির করতে পারছিল না।

একটা সমস্যা অবশ্যই রাণু। বেশ বড় রকমের সমস্যা। বেঁচে থাকলে রাণু সমস্যা হত না। যেমন করেই হোক নানারকম অনভিপ্রেত প্রশ্ন তারা দুজনে মিলে এড়াতে পারত। কিন্তু রাণু এখন মৃত। অর্থাৎ নিরেট একটি বোঝা বা ভার মাত্র। অংশুর গাড়িতে তার উপস্থিতি নিয়ে যাবতীয় প্রশ্নের জবাব অংশুকে একাই দিতে হবে। রাণুর বদলে যদি সে নিজে মারা যেত, বা দুজনেই, তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না। সে মরে রাণু বেঁচে থাকলে রাণু শুধু ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়লেই হত। দুজনে মরলে অবশ্য প্রশ্ন উঠত কিন্তু জবাবদিহি করার কিছু ছিল না।

অবশ্য এসব সমস্যা খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে না অংশু। তার ফাঁকা অভ্যন্তরে কিছু গুঞ্জন উঠছে মাত্র। বেকুব এবং রাগী এক লরিওলা যে কী ঘটিয়ে গেল তা সে নিজেও জানে না। তবে প্রতিশোধটা সে বড় বেশি নিয়েছে। দূরপাল্লার লরি ড্রাইভারদের এত আত্মসম্মানবোধ থাকার কথা নয়। "শুয়োর কি বাচ্চা" বা এই ধরনের গালাগাল তাদের কাছে জল-ভাতের সামিল। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এত বড় প্রতিশোধের পিছনে কারণ একটাই। দূরপাল্লার নারীবর্জিত দৌড়ে লোকটার ভিতরে একটা পুঞ্জীভূত যৌন-কাতরতা ছিল সেটাকে উসকে দিয়েছিল রাণু। আর সেই বেসামাল কাম থেকে এসেছিল ক্রোধ। ক্রোধ থেকে হিংসা। ইন্ধন ছিল অংশুর নিতান্তই বহু ব্যবহৃত এবং বিষহীন একটি গালাগাল।

একটু দূর থেকে অংশু ধ্বংসস্তূপটা দেখতে পাচ্ছে। রাণুর পা দুটো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। অংশুর মনে হচ্ছিল তার এখান থেকে অবিলম্বে সরে পড়া উচিত। কিন্তু কাজটা খুব বাস্তব বুদ্ধি-সম্মত হবে না। ওই ধ্বংসস্তূপ হাজারটা আঙুল তুলে তাকে নির্দেশ করবে, চিহ্নিত করবে।

হাইওয়ের ওপর পাঁচ সাতজন লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে। দু তিনটে গাড়ি এবং লরিও থামল। ঢাল্‌ বেয়ে উঠে আসছে কাছাকাছি গ্রামের কিছু লোক। তাদের ভয়, বিস্ময় ও কাতরতার স্বাভাবিক উক্তিগুলি শুনতে পায় অংশু।

একজন স্যুটপরা বয়স্ক ভদ্রলোক অংশুর সামনে এসে দাঁড়ায়। অংশু চোখ ভাল করে তোলে না। এক পলক তাকিয়ে মুখটা নামিয়ে রাখে।

লোকটা জিজ্ঞেস করে, গাড়ি কে চালাচ্ছিল? আপনি?

হ্যাঁ। বলেই অংশু টের পায় তার গলার স্বর ভাঙা এবং বিকৃত। কেমন কেটে যাচ্ছে।

কী করে হল বলুন তো!

লরি। ফের গলার স্বরে একটা কাঁপুনি টের পায় অংশু।

ভদ্রমহিলা...! বলে ভদ্রলোক কথাটাকে ভাসমান রাখেন।

অংশু গলা খাঁকারি দেয়। এতক্ষণে সে শরীরেও কাঁপুনিটা টের পাচ্ছে। বলে, কী অবস্থা?

ভাল নয়। হাসপাতালে রিমুভ করতে হবে।

অংশু নড়ে না। মাটির দিকে চেয়ে থাকে।

আপনার ইনজুরি কি রকম?

জানি না। ব্যথা।

শকটাই মনে হচ্ছে বেশি। আসুন, আমি কলকাতার দিকে যাবো। পৌঁছে দিচ্ছি।

অংশু উঠতে চেষ্টা করে। প্রথমটায় পারে না। তারপর ওঠে। ঢাল্‌ বেয়ে হাইওয়েতে উঠতে উঠতে লোকটাকে জিজ্ঞেস করে, ও কি বেঁচে আছে?

ডাক্তাররা বলতে পারবে। কণ্ডিশন ভাল নয় বোধহয়।

ফিয়াটের একটা টায়ার পড়ে আছে সামনে। অংশু দাঁড়ায়। স্টেপনিটা। পা দিয়ে স্টেপনিটাকে স্নেহভরে একটু ছোঁয় অংশু। তার মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসছে, কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসছে।

সে লোকটার দিকে চেয়ে বলে, আমি তো কলকাতায় যাবো না।

তবে কোথায় যাবেন ?

আমি যাচ্ছিলাম ব্যাণ্ডেল।

ও। বলে লোকটা যেন একটু ভাবে। তারপর বলে, কিন্তু আমি তো কলকাতা যাবো। ব্যাণ্ডেল হলে—

অংশু মাথা নেড়ে বলে, না। আমাকে ব্যাণ্ডেল যেতে হবে। কলকাতা নয়।

লোকটা চলে গেলে অংশু ধ্বংসস্তূপটার দিকে তাকায়। বহু লোক জড়ো হয়ে গেছে। রাণুকে বের করে ঘাসের ওপর শুইয়েছে ওরা। ভীড়ের জন্য রাণুকে ভাল দেখা যাচ্ছে না। তবে ওর গোলাপী সালোয়ার আর কামিজ ভীড়ের ফাঁক দিকে মাঝে মাঝে ঝলকাচ্ছে।

কয়েকজন লোক তাকে লক্ষ করছে। তার প্যান্ট ভেজা, চুল উসকো খুসকো, চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। দুর্ঘটনার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ থাকার কথা নয়।

লোকগুলো এগিয়ে আসে এবং একজন খুব সহানুভূতির গলায় জিজ্ঞেস করে, আপনার গাড়ি ?

হ্যাঁ।

উনি, ওই ভদ্রমহিলা আপনার স্ত্রী তো ?

না। কলিগ। গলায় সেই কাঁপুনিটা রয়ে গেছে, টের পেল অংশু।

উনি বোধহয়—!

জানি। অংশু রুমাল বের করতে গিয়ে ফের ভেজা ট্রাউজার টের পায়। গা গুলিয়ে ওঠে। রুমালটাও পেচ্ছাপে ভিজে শপশপ করছে। অংশু সেটা ফেলে দেয়। কোমরটায় অসম্ভব ব্যথা। এত ব্যথা যে অবশ করে দিচ্ছে। শরীরে থিরথির কাঁপুনি হয়েই যাচ্ছে।

আমরা একটা লরি থামিয়েছি। ফাঁকা লরি। ভদ্রমহিলাকে আর আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

কোন হাসপাতাল ?

ব্যাণ্ডেল।

লরির খোলের মধ্যে বসে ব্যাণ্ডেল যেতে যেতে অংশু পুরোপুরি জেগে উঠল। যত জেগে উঠল তত টের পেল, তার শরীরের হাড়

মাংসের গভীরে সঞ্চারিত তীব্র সব ব্যথা। কিন্তু ব্যথার চেয়েও বেশি তাকে অভিভূত রাখছিল লরিতে খোলের মেঝের ওপরে পড়ে থাকা রাণু।

রাণুর খুব একটা রক্তপাত ঘটেনি। কাঁধ আর বুকের খানিকটা অংশ রক্তে ভেজা, গালে একটু ছোপ। এগুলো তেমন মারাত্মক নয়। মারাত্মক হল, রাণুর মাথার আকারটা। বেশ গোলাকার ছিল ওর মাথা এখন চ্যাপ্টা।

লরিতে আরো লোক আছে। তারা কথা বলছে। দুর্ঘটনা নিয়েই কথা হচ্ছে। নতুন কিছু নয়। অংশু চোখ বুজল।

ব্যাণ্ডেল সমীরণের বাগানবাড়িটা আজ তার আর রাণুর জন্য তৈরি হয়ে আছে। সারাদিনের প্রোগ্রাম ছিল তাদের দুজনের। এটা নতুন কিছু নয়। গত এক বছর ধরে তার আর রাণুর ঘনিষ্ঠতা চলছে। এযাবত প্রায় কোনো রবিবারই তারা বাদ দেয়নি।

এক বছর আগে অংশু রাণুর প্রেমে পড়ে। কিন্তু অংশুর প্রেম বরাবরই ধৈর্যহীন। বেশিক্ষণ তা ভাবের স্তরে থাকতে চায় না, শরীরে নেমে আসতে চায়। আশ্চর্য এই, রাণু সেটা খুব সহজেই বুঝে গিয়েছিল। সেও প্যানপ্যানে রোমাণ্টিক পুরুষ পছন্দ করে না।

চমৎকার জুটি। সুন্দর বোঝাপড়া। উপরন্তু সমীরণের মতো একজন বুঝদার, সমবেদনাশীল ও বড়লোক বন্ধু থাকায় বাগানবাড়িটা তাদের কুঞ্জবন হয়ে উঠতে দেরি হয়নি।

কিন্তু মুশকিল হল, মাংসের ক্ষুধা খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভাবালুতা না থাকায় তার আর রাণুর সম্পর্কটা নিতান্তই শরীরের উত্তেজনায় সীমাবদ্ধ থাকছিল। বোধহয় তাতেই মঙ্গল হয়েছে। রাণুর জন্য তেমন শোক নেই অংশুর।

তবে দুশ্চিন্তা আছে। গভীর দুশ্চিন্তা। এতদিন রাণু আর তার সম্পর্কের কথা জানত তারা দুজনে মাত্র। সমীরণ রাণুকে চেনে না। চেনার চেষ্টাও করেনি। তবে সে জানে যে, অংশুর একজন আছে। সমীরণের বাগানবাড়ির মালী এবং বাবুর্চি ও বেয়ারা অংশু আর রাণুকে চেনে বটে, তবে পদবী দিয়ে। তারা অংশু বা রাণুর প্রকৃত পরিচয়, ঠিকানা বা কর্মস্থল সম্পর্কে কিছুই জানে না। সুতরাং অত্যন্ত গোপন ছিল রাণু ও অংশুর সম্পর্ক, এই দুর্ঘটনা সব অনাবৃত করে দেবে। কিছুই আর চাপা থাকবে না। অংশুর স্ত্রী আলপনা অত্যন্ত

সাদামাটা সরল মেয়ে। স্বামীর প্রতি তার এক ধরনের মুগ্ধতাবোধ আছে। অংশুও তাকে সাধ্যমতো ভালবাসে বা ভালবাসার চেষ্টা করে। সে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, মেধার গুণে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভাল ফল করে তিন চারটে কোম্পানি ঘুরে এখন একটা মস্ত বড় বেসরকারি মাল্টি-ন্যাশনালে বড় চাকরি পেয়ে গেছে। আলপনার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ করে। স্বামী-স্ত্রী, বাবা, মা, ভাই, বোন নিয়ে এখনো তাদের যৌথ পরিবার, তবে অর্থনৈতিক চাপ তেমন নেই। তার দাদা বিশাল-তর ইঞ্জিনিয়ার, ছোট ভাই বিজনেস ম্যানেজমেণ্টে পারদর্শী এবং সেও পাঁচ হাজারী পোস্টে বহাল। দাদা বিয়ে করেনি, করবেও না। একটু সাধু মানসিকতার লোক। ছোটো ভাইয়ের জন্য চেষ্টা চলছে। দুটি বোন বিয়ের বাকি। তবে তারা সুন্দরী, ছাত্রীও ভাল। অংশুরা বেশ সুখী পরিবার।

কিন্তু সেই সুখের সানকীতে এই দুর্ঘটনা একটি বজ্রাঘাত হয়ে গিয়ে পড়বে। আর সেইটেই দুশ্চিন্তার কারণ। রবিবার প্ল্যাণ্ট দেখতে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে পড়তে কোনো অসুবিধে হয়নি তার এতদিন। কারণ, তাকে অবিশ্বাস করার কারণ ছিল না। এখন ব্যাণ্ডেলের রাস্তায় সুন্দরী এক সহকর্মীর সঙ্গে সে কোথায় যাচ্ছিল এ প্রশ্নের জবাব কী হবে? যাই সে বানিয়ে বলুক, সত্য গোপন থাকবে না।

রাণুর দিককার কথাও সে একটু ভাবল, সহকর্মী হলেও সে বা রাণু কেউ কারো ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বেশি কিছু জানতে চায়নি। জানার দরকার ছিল না। অফিসে রাণু পাবলি-সিটি অফিসার। আর্ট কলেজের ছাত্রী ছিল এবং এক সময়ে তার দু একটা প্রদর্শনীও হয়েছে। তবে তেমন নাম করতে পারেনি। রাণুর স্বামী আছে, তবে তাকে ঘিরে রহস্যও আছে। রাণু নিজের স্বামী সম্পর্কে বেশি কিছু বলেনি তাকে। রাণুর একটি ছেলে আছে বলে সে শুনেছে। সবচেয়ে যেটা অবাক হওয়ার কথা রাণুর বাড়িতে কখনো যায়নি অংশু। রাণু যেতেও বলেনি তাকে কখনো। কাজেই ওই রহস্যময় দিক থেকে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সেটা ভাবতে গিয়ে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল অংশু। রাণু একদিন শুধু বলেছিল, ওর স্বামীও আর্টিস্ট এবং খুব জেলাস টাইপের লোক।

জেলাস কথাটার নানা অর্থ করে নেওয়া যায়। জেলাস আজকাল

কে নয়? এক এক জন এক এক রকম জেলাসিতে ভোগে। রাণুর শিল্পী স্বামীর জেলাসি কী ধরনের হতে পারে?

মাথা পরিষ্কার হয়ে গেছে অংশুর। লরিটা একটা হাসপাতালের চত্বরে ঢুকছে। কিন্তু এখনো অংশু কোনো স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে পারেনি। দুর্ঘটনা যখন, তখন পুলিশের কাছে এজাহার দিতেই হবে। রাণু বা নিজের আইডেনটিটি গোপন করতে চেষ্টা করা মূর্খতা। তার ভাঙা ফিয়াটের নম্বর প্লেট তো আর বদলানো যাবে না এখন। লাইসেন্সও দেখাতে হবে।

সুতরাং? সুতরাং সত্যং ব্রূয়াৎ। উপায় নেই। স্টেচারে করে যখন রাণুর মৃতদেহ নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন অংশু মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিল, একটা সুখী পরিবারে—নলের শরীরে যেমন কলি—তেমনি অবিশ্বাস, সন্দেহ, কুটিলতা ও পারস্পরিক দূরত্ব প্রবেশ করছে। অংশুর তিন বছর বয়সী একটা ছেলে আছে। বেশি বয়সের সন্তান। সে কিছু বুঝবে না ঠিকই। কিন্তু ওটা কোনো সান্ত্বনাও নয়।

অংশু উঠতে পারছিল না। তার শরীর এখন ছেড়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড ব্যথা। কাঁপুনি। দু-চারজন লোক তাকে ধরে লরি থেকে নামল।

পায়ে জোর পাচ্ছিল না, তবু কোনরকমে নিজেকে খাড়া রাখে সে। রাণুর ঠিকানা চাই। কিন্তু কিছুতেই সেটা মনে পড়ছে না তার। ব্যাপারটা জরুরী। এক্ষুনি ঠিকানা চাই। এক্ষুনি হাসপাতালের লোকেরা রাণুর ঠিকানা জিজ্ঞেস করবে তাকে। কী বলবে সে? ঠিকানা জানে না? বিশ্বাস করবে কেউ সেকথা? ভাববেই বা কী?

আসলে ঠিকানার দরকারই ছিল না। রবিবার রবিবার রাণু ট্যাকসিতে চলে এসেছে কর্পোরেশন বিল্ডিং-এর পিছনের পার্কটার কাছে। অংশুও এসেছে তার গাড়ি নিয়ে। সেখান থেকে ব্যাণ্ডেল। ঠিকানার দরকার ছিল না।

কিন্তু বলতে তো হবে।

শেষ অবধি সমস্যাটা কাটিয়ে উঠতে পারল অংশু।

ডিসিজড-এর নাম?

রাণু সরকার।

ঠিকানা?

ম্যাকগুয়ের অ্যাণ্ড কম্পানি। সিকস্‌টিন

এটা তো অফিসের ঠিকানা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হোম অ্যাড্রেস ?

দেখুন, উনি ছিলেন আমার কলিগ। আমরা একটা প্ল্যান্ট ভিজিট করতে যাচ্ছিলাম অন অফিসিয়াল স্ট্যাটাস। ওঁর হোম অ্যাড্রেসটা আমার জানা নেই।

অফিসে নিশ্চয়ই আছে।

আছে। বলে হাঁফ ছাড়ল অংশু।

আপনিও তো বেশ ইনজিয়োরড, না ?

একটু তো লাগবেই। অত বড় অ্যাকসিডেন্ট।

আপনি কি ভর্তি হবেন না ?

না। তার দরকার নেই। ওয়ান টেটভ্যাক উইল বি এনাফ। আমি কি যেতে পারি এখন ?

কোথায় যাবেন ?

বাড়ি। আমার একটু রেস্ট দরকার।

পুলিশ এনকোয়ারি হবে জানেন তো।

জানি।

অংশু আরো কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়ে বেরিয়ে এল। রিকশা ধরল একটা।

সমীরণের বাগানবাড়িটা ভারী ছিমছাম, নির্জন, সুন্দর। বিশাল বাগানে অনেক পাখি ডাকছে। অংশু স্নান করেছে। প্যান্ট আণ্ডার-ওয়্যার ধুয়ে রোদে শুকোতে দিয়েছে। একটা মস্ত তোয়ালে জড়িয়ে বসে আছে বারান্দার বেতের চেয়ারে। দু কাপ চা খেয়েছে সে। শরীর বা মনের অস্থিরতার কোনো উপশম ঘটেনি।

সমীরণের এই বাড়িটা মোটামুটি ভাবে ফুর্তিরই জায়গা। সমীরণ নিজে তার মেয়েমানুষদের নিয়ে এখানে আসে মাঝে মাঝে। সুতরাং এখানে একটি বার আছে। অংশু মদ খায় না। সে আর রাণু এসে বড় জোর চা বা কফি খেয়েছে, মুর্গির ঝোল দিয়ে ভাত সেঁটেছে, তারপর একটা শোওয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে। সেই আসঙ্গই ছিল মদ।

আজ দু কাপ চায়ের পরও তার অন্য কিছু প্রয়োজন বলে মনে হল।

অংশু ডাকল, বিশু।

বেয়ারা ছুটে এল, বলুন।

কী আছে তোমাদের বলো তো! হুইস্কি বা ব্র্যাণ্ডি!

সব আছে।

একটু ব্রাণ্ডি দাও তো। সোডা মিশিয়ে কিন্তু।

বিশু চলে গেল। অংশু পাখির ডাক শুনতে লাগল। পাখি, অনেক পাখি।

বারান্দার সামনেই একটা ঢ্যাঙা লোহার ফ্রেমে শেকলে বাঁধা একটা দোলনা ঝুলে আছে। তারা দুজনে—অর্থাৎ অংশু আর রাণু যে দোলনায় চড়ত তা নয়। তবে মাঝে মাঝে রাণু গিয়ে বসত ওখানে। সে বসত পা মুড়ে। হাতে থাকত স্কেচের প্যাড আর পেনসিল। অনেক পাখির স্কেচ করেছিল।

ওর ব্যাগটা কোথায় গেল? ভেবে অংশু হঠাৎ সোজা হয়ে বসে। তারপর ভাবে, যেখানেই থাক তাতে কী আর যায় আসে? ভেবে ফের গা ছেড়ে দিল সে।

ব্রাণ্ডিতে প্রথম চুমুক দিয়ে তার খুব ভাল লাগল না। এর আগে এক আধবার সে সামান্য খেয়েছে। কোনোবারেই ভাল লাগেনি বলে অভ্যাস করেনি। আজ ভাল না লাগা সত্ত্বেও সে ধীরে ধীরে, জোর করে পুরোটা খেয়ে নিতে পারল। বেশি নয় অবশ্য। এক পেগ হবে।

মাথাটা একটু কেমন লাগছে কি?

অংশু চোখ বুজে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

খাবেন না স্যার? লানচ রেডি।

অংশু একটু চমকে ওঠে। সামান্য সেই চমকে শরীরটা নড়তেই কোমড় থেকে ব্যথাটা চিড়িক দিয়ে উঠে আসে মেরুদণ্ড বেয়ে। স্পাইনাল কর্ডে যদি লেগে থাকে তবে ভয় রয়ে গেল। ঘাড়ের দিকেও একটা ব্যথা মাথাচাড়া দিচ্ছে। যদি স্পণ্ডেলাইটিসের মতো কলার নিতে হয়?

আজ স্যার দিদিমণি এলেন না?

ডাইনিং হল-এর দিকে যেতে যেতে অংশু বলল, না।

আপনি কি স্যার অসুস্থ?

অংশু একটা শ্বাস ফেলে বলল, একটু চোট হয়েছে। তেমন কিছু নয়।

গাড়িও আনেননি আজ স্যার।

সার্ভিসিং-এ গেছে।

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অংশুর রাগ হচ্ছিল না। কারণ, এসব সৌজন্যমূলক প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক। বিশু আর জেরা করছে না। জবাব দেওয়াই উচিত। চেপে গেলে সন্দেহের বীজ বপন করা হবে।

অংশু প্রকৃত মুশকিলে পড়ল খেতে বসে। চমৎকার সরু চালের সাদা গরম ভাত, কাঞ্চনবর্ণ মুর্গির কারি, ধোঁয়া ওঠা ডাল, মুচমুচে আলু ভাজা, মাছের ফ্রাই, চাটনি দেখে আজ তার বার বার ওয়াক আসছিল। এতক্ষণে রাণুকে কাটাছেঁড়া করা হচ্ছে কি? নাকি ঠাণ্ডা ঘরে ফেলে রেখেছে! ওর সৎকারেরই বা কী হবে? কে এসে নেবে ডেড বডি? ওর স্বামী? কিন্তু ওই বডির কিছু দায়িত্ব তো অংশুরও আছে। অংশু তো কম ভোগ করেনি ওই শরীর, যতদিন জ্যান্ত ছিল।

অংশু বিস্তর নাড়াঘাঁটা করে সব ফেলে ছড়িয়ে উঠে পড়ল।

খেলেন না স্যার?

আজ আর পারছি না। একটা পান আনো তো বিশু। জর্দা দিয়ে।

এসব খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি অ্যারেনজমেন্টের জন্য প্রতি রবিবার অংশুকে পঞ্চাশটা করে টাকা দিতে হয়। আজ আবার এক পেগ মদের দাম আছে। খরচটা আপাতত বেঁচে যাচ্ছে অংশুর। সামনের রবিবার সে অবশ্যই আসছে না।

বারান্দায় যেতে গিয়েই হলঘরের টেলিফোনটা নজরে পড়ল তার। একটু থমকাল সে। তাদের কলকাতার বাড়িতেও টেলেফোন আছে। কথা বলবে কি? একটু ইতস্তত করে অংশু। তারপর হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয়, বলবে। বলাই উচিত। ফিরলে সকলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্ঘটনার কথা বলতে তার ভীষণ অস্বস্তি হবে। মুখ না দেখেই বলে দেওয়া ভাল। বলতে যখন হবেই।

কিছুক্ষণের চেষ্টায় সে বাড়ির লাইন পেল। ধরল তার বোন রীতা।

শোন, আজ একটা বিচ্ছিরি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

অ্যাকসিডেন্ট! বলে রীতা একটা আর্তনাদ করে উঠল ওধারে।

শোন, ডোন্ট বি নারভাস। আমার কিছু হয়নি।

কিছু হয়নি !

আমার কিছু হয়নি, তবে গাড়িটা গেছে। আর···

আর কী ?

আমার সঙ্গে একজন কলিগ ছিল। তার অবস্থা ভীষণ খারাপ।

বাঁচবে না ?

বোধহয় না।

সে কী ?

চেঁচাস না। ঠাণ্ডা হয়ে শোন। আমি ব্যাণ্ডেল থেকে কথা বলছি।

ব্যাণ্ডেল থেকে ? ব্যাণ্ডেল থেকে কেন ? তুমি তো প্ল্যান্টে গিয়েছিলে।

হ্যাঁ। প্ল্যান্টেই ভদ্রমহিলা ধরলেন আমাকে। ব্যাণ্ডেলে ওঁর কে একজন আত্মীয় থাকেন, গুরুতর অসুস্থ। আমাকে একটু পৌঁছে দিতে বললেন।

ভদ্রমহিলা! কে গো ?

আমাদের পাবলিসিটি অফিসার রাণু সরকার।

তুমি ব্যাণ্ডেলে গেলে পৌঁছে দিতে ?

কী আর করব। ট্রেনের নাকি আজ কি সব গণ্ডগোল ছিল হাওড়ায়, তাই।

ট্রেনের গণ্ডগোল ! তাহলে কী হবে ! মা আর বউদি যে বড়দার সঙ্গে আজ তারকেশ্বর গেল !

তারকেশ্বর ! ও গড ! অংশু হাল ছেড়ে দিল প্রায়।

কী বলছ ?

অংশু মনে মনে নিজেকে বলল, ইডিয়ট, এর চেয়ে ঢের ঢের বেশি চক্কর পড়েও দুনিয়ার চালাক লোকেরা বেরিয়ে আসে। তুমি কি গাড়ল ? চালাও, চালিয়ে যাও।

অংশু একটু ধীর স্বরে বলল, ট্রেনের গণ্ডগোল ছিল কি না তা তো আমার জানার কথা নয়। ভদ্রমহিলা বলছিলেন, তাই ধরে নিয়েছি আছে।

ব্যাণ্ডেলে কোথায় আছো তুমি এখন ? কোথা থেকে কথা বলছ ?

অংশু এত মিথ্যে কথা একসঙ্গে জীবনে বলেনি। একটু ঢোক গিলে বলল, হাসপাতালের কাছ থেকে।

ভদ্রমহিলার কিরকম লেগেছে ?

মাথাটা থেঁতলে গেছে।

উঃ মা গো।

একটু চুপ করে থেকে রীতা বলল, কী হয়েছিল মেজদা ?

লরি। একটা লরি এসে মেরেছিল বাঁ দিকে।

বাঁচার কোনো চানস নেই ?

না।

গাড়িটা ?

গেছে। একদম গেছে।

তুমি তাহলে কী করে ফিরবে ?

দেখছি। ফেরার জন্য চিন্তা নেই। পারব।

শোনো মেজদা, ছোড়দা একটু আড্ডা মারতে বেরিয়েছে সকালে। ও ফিরলে তোমাকে গিয়ে তুলে আনবে। ও ওর গাড়ি নিয়েই বেরিয়েছে। নইলে আমিই চলে যেতাম—

না, তার দরকার নেই।

বাবাকে বলব তো ?

বলিস। তবে আগে বলিস যে, আমার কিছু হয়নি।

সত্যিই হয়নি তো ?

হলে কি আর ফোন করতে পারতাম ?

তুমি কখন ফিরবে ?

রাণুর একটা ভালমন্দ খবর পেলেই। ছাড়ছি। ভাবিস না!

তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি এসো!

অংশু ফোন রেখে দিল। শোওয়ার ঘরে এসে সে দরজা বন্ধ করে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। শরীরের ভার আর বহন করা যাচ্ছে না।

বিছানাটা নরম, ফোম রবারের। ভারী নরম। এই বিছানাতেই সে আর রাণু—। কিন্তু রাণুর স্মৃতি তাকে একটুও তাড়া করছে না! তবে এতক্ষণে দুর্ঘটনার পুরো ভয়াবহতা সে একা ঘরে স্মরণ করতে পারল। ওইরকম ভাবে চুরমার হয়ে যাওয়া একটা গাড়ির ভিতরে থেকেও কী করে সে বেঁচে গেল সেটা এখনো ভেবে পাচ্ছে না সে। বাঁচলেও এমন আস্ত অবস্থায় তো কিছুতেই নয়। তবু আশ্চর্য কিছু ব্যথা বেদনা নিয়ে সে বেঁচেই আছে। ভাবতেই শিউরে উঠল সে। তার শরীর থেকে রক্তপাতও হয়েছে সামান্য। মাত্র চার জায়গায় ছড়ে

বা চিড়ে গেছে, জামাকাপড় অবশ্য ছিঁড়েছে, কিন্তু তা ব্যবহারের অযোগ্য নয়। এত বড় একটা অ্যাকসিডেণ্ট যাতে রাণু তৎক্ষণাৎ মারা গেল, ফিয়াটটা হয়ে গেল খণ্ড খণ্ড, তাতে পড়েও সে এমন ফুলবাবুটির মতো অক্ষত, অনাহত রয়ে গেল কেন ?

ক'দিন আগেই "রিপ্লির বিলিভ ইট আর নট"-এ সে পড়েছিল একজন লোক মোটরগাড়িতে লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় একটা ট্রেন এসে সেটার ওপর পড়ে এবং প্রায় ছশো মিটার মোটরগাড়িটাকে থেঁতলাতে থেঁতলাতে পিষে দলা পাকিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে। আশ্চর্য এই যে মোটরচালক সামান্য কিছু কাটা ছেঁড়া নিয়ে তা সত্ত্বেও দিব্যি বেঁচে গিয়েছিল, হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি হতে হয়নি। অংশুর ব্যাপার-টাও তাই নয় কি ?

এ বাড়িতে যে এত পাখি ডাকে তা আগে কখনো লক্ষ করেনি অংশু। আজ সঙ্গে রাণু নেই বলেই বোধহয় করল। পাখিদের গণ্ডগোলেই বোধহয় তার ঘুম এল না। শরৎকালের দিব্যি মনোরম আবহাওয়াটি ছিল আজ। ভাবহীন কিছু মেঘ পায়চারি করে ফিরছে আকাশে। এবার বাদলাটা গেছে খুব। তাই চারিদিকটা ধোয়া মোছা চমৎকার! কিন্তু এমন মনোরম আবহাওয়া পেয়েও তার ঘুম এল না এক ফোঁটা। অবশ্য তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পেটে ভাত পড়েনি, রাণু মারা গেছে, ঘুম আসার কথাও তো নয়। তবু চুপচাপ চোখ বুজে অংশু পাখিদের গণ্ডগোল শুনতে লাগল।

ঘুম তো নয়ই, একে বিশ্রামও বলে না। মন প্রশান্ত না থাকলে বিশ্রাম ব্যাপারটাও একটা শক্ত ব্যায়াম মাত্র। এই বিশ্রামের ব্যায়ামটা তাকে করতে হচ্ছে একটাই মাত্র কারণে। তার প্যাণ্ট এখনো শুকোয় নি। না শুকোলে বেরোবে কী করে ?

নিজের ফিয়াট গাড়িটার কথা শুয়ে শুয়ে ভাবল অংশু। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিন্তু চমৎকার অবস্থায় ছিল কেনার সময়। তার হাতে সেট হয়ে গিয়েছিল। ইনসিওর করা আছে, কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে অংশু। তবে গাড়িটা তো আর ফিরবে না। পার্টসগুলো চুরি হয়ে যাবে অ্যাকসিডেণ্ট স্পট থেকে। চাকা, ব্যাটারি।

অংশু ফের উঠে হলঘরে আসে। খুবই কষ্টে। তারপর থানায় ফোন করে।

আপনারা অ্যাকসিডেণ্ট স্পট-এ কোনো পাহারা রেখেছেন ?

না স্যার।

একটু পাহারা রাখলে ভাল হত না ? পার্টস চুরি যাবে যে !

আমাদের লোক বড্ড কম।

তাহলে ?

কিছু করার নেই স্যার। চুরি যাওয়ার হলে এতক্ষণে হয়ে গেছে।

হোপলেস। বলে অংশু ফোন রেখে দেয়।

ট্রাউজার এখনো শুকোয়নি। কোমরের কাছে বেশ ভেজা। তবু, অংশু প্যান্ট পরে নেয়, জামা গায়ে দেয়, বিশুকে একটা রিক্সা আনতে বলে বারান্দায় বসে পাখির ডাক শোনে।

রাত আটটা নাগাদ যখন বাড়ি ফিরল অংশু তখন সে অনেকটাই বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত, হা-ক্লান্ত। তবে বিপর্যয়ের ভাবটা সে ইচ্ছে করেই একটু বাড়িয়ে তুলেছিল। যাতে বেশি প্রশ্নের জবাব দিতে না হয়।

বাইরের ঘরেই তার জন্য অপেক্ষা করছিল সবাই। পারিবারিক ডাক্তারও তৈরি হয়ে ছিলেন। সে বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র মা এসে তাকে প্রথম ধরল।

একটি প্রশ্নেরই জবাব দিতে হল তাকে।

মেয়েটা কি মারা গেছে ?

হ্যাঁ।

ইস !

ডাক্তার তাকে ঘুমের ওষুধ দিলেন। নাড়ি টাড়ি দেখলেন একটু। তারপর ঘুমের হাতে ছেড়ে দিলেন।

অংশু ঘুমোলো। প্রচণ্ড গভীর টানা ঘুম। পরের দিনটাও পড়ে থাকতে হল বিছানায়। মাঝে মাঝে অফিস এবং থানা থেকে ফোন এল বাড়িতে। ভাগ্য ভাল যে, তাকে ফোন ধরতে হল না। সে অসুস্থ, শয্যাগত এবং আণ্ডার সেডেশন, সুতরাং জবাব দেওয়ার দায় নেই। বাড়ির লোকেরা সারাদিন প্রায় নিঃশব্দ রইল।

কিন্তু এই অবস্থা তো স্থায়ী হবে না। তাকে জাগতে হবে এবং মুখোমুখি হতে হবে সকলের। অনেক প্রশ্ন আছে ওদের। সঙ্গত প্রশ্ন, বিপজ্জনক প্রশ্ন। প্রশ্ন করবে পুলিশ, প্রশ্ন করবে অফিসের সহ-কর্মীরা। একটি নিটোল, ছিদ্রহীন মিথ্যে গল্প বানানো খুব সহজ হবে না। কোনো মিথ্যেই তো ছিদ্রহীন নয়।

চোখ খুলতেই লজ্জা করছিল অংশুর। আলপনার মুখ শুকনো, চোখ সজল। মুখ দেখে মনে হয়, সারা রাত তার পাশে বসে জেগে কাটিয়েছে। তার ছোটো ভাই আকসিডেণ্ট স্পট থেকে ঘুরে এসেছে, এটাও সে টুকরো-টাকরা কথা থেকে টের পেল। থানা পুলিশ ইনসুরেনস সবই সে সামলাচ্ছে।

পরের রাত্রিটাও গভীর ঘুমে কেটে গেল অংশুর। জাগল বেলায়। আলপনা তার গায়ে মৃদু নাড়া দিয়ে বলল, তোমার অফিস থেকে ফোন এসেছে। জরুরী দরকার।

কে ফোন করছে?

ডিরেকটর নিজে। আধ ঘণ্টা পর আবার ফোন করবে।

অংশু চুপচাপ চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে পর্দা উঠছে রঙ্গমঞ্চের। হাজার জোড়া চোখ তার দিকে চেয়ে থাকবে। সে রঙ্গমঞ্চে একা।

আধ ঘণ্টা পরই ফোনটা এল।

অংশু?

বলছি।

কেমন আছো?

একটু ভাল।

বেলা বারোটায় একবার অফিসে আসতে পারবে?

পারব।

আজ মিসেস সরকারের ডেড বডি রিলিজ করেছে সকালে। সোজা অফিসে আসছে। এখান থেকেই ক্রিমেশনে নিয়ে যাবে।

অফিসের সিঁড়িতে তারা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে লরি, লরির ওপর খাটে রাণু শুয়ে আছে। অফিস থেকে বিশাল একটা টায়ারের আকৃতির মালা দেওয়া হয়েছে তার বুকের ওপর!

প্রতীকটা চমৎকার। এক লরি মেরে দিয়ে গেছে রাণুকে। আর এক লরির ওপর সে এখন শোওয়া। বুকে ফুলের চাকা। চমৎকার।

এতগুলো লোকের এই সমবেত নিস্তব্ধতা ভারী অস্বস্তিকর। অংশুর অল্প অল্প ঘাম হচ্ছে। লরিটা চলে যাচ্ছে না কেন? কেন চলে যাচ্ছে না?

ডিরেকটর চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন; ফিলিং সিক অংশু?

একটু।

স্বাভাবিক। ইট ওয়াজ এ গ্রেট শক। মিসেস সরকারের হাজব্যাণ্ড আর বাচ্চাকে আনতে গাড়ি পাঠানো হয়েছে। দে আর বিয়িং লেট।

অংশু বুকের দুটো বোতাম খুলে ফেলল। স্ট্যানস পাল্টাল পায়ের। তারপর একটা গাড়ি এসে থামল লরিটার পেছনে।

অংশু স্থির হয় এবার। পিছনের দরজাটা খুলে একজন রোগা ও পাগলাটে চেহারার লোক নেমে আসে। পরনে পায়জামা, হ্যাণ্ডলুমের খয়েরি পানজাবি। চুল বড় বড়। সামান্য দাড়ি আছে। চুল দাড়ি কাঁচা পাকা, কিন্তু লোকটার বয়স খুব বেশি নয়, পঁয়ত্রিশ টয়ত্রিশ হবে। অংশুর বাঁ পাশ থেকে কে যেন চাপা স্বরে বলে উঠল, এ রাসক্যাল। ডাউনরাইট রাসক্যাল!

লোকটার পিছনে একটা বাচ্চা নেমে এল। নীল প্যাণ্ট, সাদা জামা। বেশ রোগা। বছর পাঁচেকের বেশি বয়স নয়। মুখটায় কেমন ভ্যাবাচ্যাকা ভাব। চোখে ভয়।

নিস্তব্ধতাটা ভাঙল আচমকা। নিখুঁত একটা কাচের পাতে যেন হঠাৎ মস্ত এক হাতুড়ির ঘা।

ছেলেটা সরু পাখির স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, মা...মা...মা....মা...মা....

অংশুর ভিতরে সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে শব্দটা একটা বিদ্যুৎগতি ছুঁচের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। কানে হাত চাপা দিয়ে অংশু একটা কাতর শব্দ করল, উঃ!

ছেলেটাকে কে যেন লরির ওপর তুলে দিয়েছে। রোগা, হাড্ডিসার, হতভম্ব ছেলেটা আর কোনো শব্দ বা কথা খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু তীক্ষ্ণ পাখির স্বরে ডাকছে, মা···মা ··মা···মা···

অংশু ধীরে ধীরে বসে পড়তে থাকে। দু হাতে প্রাণপণে বন্ধ করে থাকতে চেষ্টা করে শ্রবণ। কিন্তু সব প্রতিরোধ ভেঙে সেই তীক্ষ্ণ পাখির ডাক তার ভিতরে সূচীমুখ হয়ে ঢুকে যায়। লণ্ডভণ্ড করে দিতে থাকে তার অভ্যন্তর। মা--মা—মা—মা—

অংশু মাথা নাড়ে। শব্দটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে। পারে না। হাঁ করে শ্বাস টানবার চেষ্টা করে সে। তবু দম আটকে আসতে থাকে। সে হাত তুলে বলতে চেষ্টা করে, ডেকো না! ওভাবে ডেকো না! আমি পারছি না—

কিন্তু কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না অংশু। দু হাতে কান চেপে সে অভিভূতের মতো চেয়ে থাকে। একটি শব্দের বুলেট বার বার এসে বিদ্ধ করে তাকে। ঝাঁঝরা করে দিতে থাকে।

লামডিঙের আশ্চর্য লোকেরা

লামডিঙে খুবই অদ্ভুত অদ্ভুত ধরনের ঘটনা ঘটত। এই ছোট্ট শহরে কৃপণ, লোভী, রাগী, চোর, সাধু ম্যাজিসিয়ান, ডাকাত, সাহসী, ভীতু নানারকমেরই লোক ছিল। সকলেই সকলকে চিনত।

মগন ছিল চোর এবং খুব একটা উঁচু দরের চোরও নয়। প্রায়ই চুরি করতে কারও বাড়ি ঢুকে ধরা পড়ে যেত। সিত্যসিন্ধুবাবুর বউ একদিন তাকে রান্নাঘরে ধরে • ফেললেন। চুরি করার আগে মগন জালের মিটসেফ থেকে মাছের ঝোল আর ভাত বের করে খাচ্ছিল আপন মনে। খেয়ে দেয়ে বাসনপত্র নিয়ে সটকাবার মতলব। ধরা পড়ে যাওয়ায় খুব বিগলিত মুখে বলল, চারটি খাচ্ছি মাসিমা। গরিবের তো এই এই একটাই দোষ, বড্ড খিদে পায়। সত্যসিন্ধুবাবুর বউ তাতে গললেন না, চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করলেন। লোক জড়ো হয়ে মগনকে নাকে খং দেওয়াল। এতে প্রতিবেশী গগনবাবু একটু অসন্তুষ্ট হয়ে রীতিমত উঁচু গলায় কালীবাবুকে বললেন, মশায় মগনটা একেবারে কাঁচা চোর বটে, কিন্তু চোর তো? এ তল্লাটে ওই মোটে একটাই চোর. তা ও যদি চুরি ছেড়েই দেয় তবে গেরস্তকে সজাগ রাখার আর তো উপায়ই রইল না। চোর ছ্যাঁচড় থাকলে মানুষ সাবধান হতে শেখে, নষ্টচন্দ্রার দিন যে চুরির প্রথা আছে তাও হল ওই জিনিসই। আমি বলি কি, মগন যদি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েই তবে আমাদের উচিত তাকে হাসিমুখে ক্ষমা করা। মগন আমাদের এক-টা মৌলিক শিক্ষা তো দেয়। সকর্কতার শিক্ষা।

কালীবাবু কথাটার যুক্তিযুক্ততা মেনেই বোধহয় আমতা আমতা করে বললেন, মগনের উচিত চুরিটা আরও ভাল করে শেখা। নইলে প্রায়ই ব্যাটা ধরা পড়ে আর মাঝরাতে আরামের ঘুমটার দফা রফা হয়ে যায়। এ মোটেই ভাল কথা নয়।

গগনবাবু দুঃখ করে বললেন, কে শেখাবে বলুন? সেরকম গুরু কি আর আছে। আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি করিম-চোর সামন্ত দারোগার কোমরের বেল্টখানা বাজি রেখে দিনে দুপুরে চুরি করল।

কালীবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, দুপুরে দারোগারা খুব ঘুমোয়

আর ঘুমোনোর সময় বেল্ট খুলে রাখে। এটা খুব খারাপ অভ্যাস।

গগনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, মোটেই নয়। কোমরে পরা অবস্থায় খুলে নিয়ে করিম বাজিকে বাজি জিতল তার ওপর সামন্ত দারোগা পাঁচ টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, জীবনে এরকম চোর আর দেখিনি। তুই ডাকাত হ।

পরদিনই সকালবেলা মগন বাজারে গিয়ে গোপেশ যাদুকরকে ধরল গোপেশদা, দু চারটে হাতসাফাই এবারে শিখিয়ে দিন। নইলে ইজ্জত থাকছে না।

গোপেশ যাদুকর লোকটা মজার মানুষ। সময়ে এবং প্রায় সর্বত্রই সে হাতসাফাই দেখায়। ম্যাজিক ছাড়া সে একদম থাকতে পারে না। বাজার করার সময়েও সে কত সময়ে মাছ, ফুলকপি, আলু বা দোকানে ঢুকে বিস্কুটের প্যাকেট, ক্রিমের শিশি সকলের চোখের সামনেই হাওয়া করে দেয়। তবে মগনের সঙ্গে তার তফাৎ হচ্ছে, সে আবার জিনিস গুলো ফিরিয়ে দেয়। সে তো চোর নয়।

রোজকার মতোই সে মগনকে বোঝাতে লাগল, চোর যদি যাদুকর হয় বা যাদুকর যদি হয় চোর তাহলে সমাজের ঘোর বিপদ। চুরি করা যদি ছেড়ে দিস তবে শেখাতে পারি।

মগন মাথা চুলকে বলে, আচ্ছা ভেবে দেখি।

আসলে মগনের বিপদ হয়েছে পায়রাকে নিয়ে। পায়রা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার খুব ভাব। কিন্তু পায়রার বাপ পাঁচশো টাকা পণ চেয়ে বসেছে। সেটা জোগাড় না হলে বিয়ে হওয়ার নয়। পায়রা রোজ খোঁটা দিচ্ছে, হিঃ খুব জানা আছে, কেমন মুরোদের চোর।

মগনকে বিদায় করে গোপেশ নানা মজার কাণ্ড করতে করতে বাজার সারে। শৈবালবাবু অতি সতর্ক লোক। তার জামার ভিতরে গুপ্ত পকেট, তাতে টাকা রেখে সেফটিপিন দিয়ে আটকে তবে বাজারে আসেন এবং সারাক্ষণ পকেটে হাত চেপে থাকেন। সেই শৈবালবাবু আজ শীতের প্রথম ফুলকপি কিনে দাম দিতে গিয়ে থ'। পকেটে টাকা নেই।

গোপেশ পাশেই দাঁড়িয়ে পালং শাক কিনছিল। একটু হেসে বলল, আরে তাতে কি! আমি কিছু ধার দিচ্ছি কপিটা কিনেই বাড়ি যান।

শৈবালবাবু হেঁ হেঁ করে কিছুক্ষণ জামার পকেটটা চুলকোলেন।

তারপর গোপেশকে বললেন, ইয়ে বুঝলে কথাটা পাঁচ কান কোরো না। ষষ্ঠীপদর সঙ্গে একটা বাজি ধরেছিলুম, যদি কেউ আমার পকেট কখনও মারতে পারে তাহলে পাঁচশো টাকা হারব। যে টাকা গেছে যাক, বাজিটা না হারি।

গোপেশ গম্ভীর হয়ে বলল, তাই বা কেন, টাকাটা তো মনে হয় বেশি দূরে যায়ওনি। ওই তো ব্রিজলাল বেগুনওলার কাঁধের গামছাটায় কী যেন একটা বাঁধা আছে, দেখুন তো।

বলাই বাহুল্য ব্রিজলালের গামছায় বাঁধা অবস্থায় শৈবালবাবুর টাকা পাওয়া গেল এবং ব্রিজলাল খুবই অপ্রতিভ হাসি হেসে বলল, গোপেশবাবু, আপনি তো আমাকে জেল খাটিয়ে মারবেন।

বাজার টাজার সেরে গোপেশ যখন ফেরে তখন পাড়ার মোড়ের মাথায় গোলবাড়ির বারান্দায় বসে-থাকা অহীনবাবু তাঁকে ধরবেনই, ও গোপেশ, আরে এসো এসো এদিকে একটু, মাছটা কি কিনলে একটু দেখিয়ে যাও।

বুড়ো মানুষ বলে গোপেশ বা আর কেউই তাঁকে এড়াতে পারে না। অহীনবাবু বেশ ভোরে উঠে একটু মর্নিং ওয়াক সেরে এসেই বারান্দায় দক্ষিণ কোণটায় মোড়া পেতে বসে থাকেন। অহীনবাবুর এই কোণটায় বসবার একটা কারণ হল, ওদিকটায় বড়লোক আশুতোষ ঘোষের বাড়ির রান্নাঘর। সকাল থেকেই রান্নাঘরের নানারকম ভাল ভাল গন্ধ আসতে শুরু করে। রুটি সেঁকার গন্ধ, ডিম ভাজার গন্ধ, মাংসের গন্ধ, মাছের কালিয়া বা পোলাওয়ের গন্ধ। অহীনবাবু নিজের পয়সায় ভাল জিনিস কখনোই খান না। কিন্তু গন্ধের নেশায় তাঁর অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায়। তাঁর আর এক নেশা হল, কে কী কিনে আনছে বাজার থেকে তা দেখা।

বসে বসেই হাঁক মারেন, ওহে ও শিকদার, বলি সব ভাল তো? তা মাছটা মনে হয় আজ জব্বর কিনেছো! মুখখানা তোমার বেশ হাসি-হাসি দেখছি যেন। দেখি দেখি, আমরাও একটু হাসি!...বাঃ বাঃ এ যে সরল পুঁটি গো, ভারী তেলালো মাছ, একটু সর্ষেবাটা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রাঁধতে বোলো বউমাকে। একেবারে চাকুম চুকুম লেগে যাবে 'খন।...আরে মুখুজ্জেমশাই নাকি? প্রাতঃপেন্নাম। আজও কি কাটা পোনা নাকি? থলেটা একটু ফাঁক করুন দাদা, আপনার কাটাপোনাকে একটা গুডমর্নিং জানিয়ে দিই। ব্রাহ্মণের ভোগে লাগবে,

ব্যাটার কপালটা ভালই।....আরে আরে কে ও? কালী না? বলি পালাচ্ছ কোথায়, তোমার মাছ না দেখে কি ছাড়বো?....ও বা বা এ যে দেখছি ফুলকপি আর কৈ মাছ। আজ তো একেবারে খুনখারাপি করে ফেলেছো হে··

সবাই চলে টলে গেলে অহীন ধীরে সুস্থে বাজারে বেরোন। বেশি বেলায় বাজারে তেমন কিছু থাকেও না। ঝড়তি পড়তি যা পান সস্তায় কেনেন। কপি পাতাটাতা অনেক সময় দোকানিরা ফেলে দেয়। অহীনবাবু সকলের অলক্ষ্যে তাও কয়েকটা কুড়িয়ে নেন।

এই সময়ে বাজারে অহীনবাবুর সঙ্গে প্রায় দিনই বিধুবাবুর দেখা হয়ে যায়। বিধুবাবু লোকটার ভারী ভুলো মন। সকালবেলায় বাজারে তিনি প্রায়দিনই কিছু না কিছু হারিয়ে যান। হয় পয়সা, না হয় চশমা, কিংবা ঘড়ি, অথবা পকেটের পেন, কখনও পায়ের এক পাটি চটি, কোনওদিন রুমাল, কিংবা মাছের থলে। সেটা আবার খুঁজে দেখতে তাকে বাজারে ফিরতে হয়।

বিধুকে দেখেই অহীনবাবু হাঁক দেন, বলি ওহে বিধু, বাজারে আবার দেখছি যে! কিছু ফেলে গেছ নাকি? আচ্ছা তুমি সবসময়ে এত কী ভাবো বলো তো!

বিধু মাথা চুলকে বলেন, ভাবছি দুনিয়াটার হচ্ছেটা কী।

কেন দুনিয়াটার কী এমন হচ্ছে। এই তো আজও পুবদিকে সূর্য উঠেছে। মাছের দাম বেড়েছে। শীতকালে শীত বেড়েছে।

বিধুবাবু তবু মুখটা গোমড়া করে বলেন, তবু দুনিয়াটার একটা কিছু হচ্ছে।

অহীনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তা হবে।

গল্পগুজব করতে করতে অহীনবাবু আর বিধুবাবু যখন ফেরেন তখন প্রায়ই রসো পাগলা এসে অহীনবাবুর পথ আটকায়, এই যে বাবু, কিছু ভিক্ষে দেবেন?

রসো পাগলাকে দেখলে অহীনবাবু ভারী বিব্রত বোধ করতে থাকেন। বলেন, আঃ, যাও যাও, অন্যদিকে দেখ।

রসো ছাড়ে না। পিছু পিছু আসতে থাকে আর খিক খিক করে হাসে আর বলে, জীবনে একটা দিন দিয়ে দেখুন, মনটা কেমন ফুরফুরে লাগবে, গান গাইতে ইচ্ছে করবে, গিন্নিমা মুখ করবেন না।

আঃ যাও না হে, বলছি তো নেই।

রসো বিড়বিড় করতে থাকে, না দিলে আজ আপনার ডাল সেদ্ধ হবে না, মাছে নুন বেশি পড়ে যাবে, গলায় কাঁটা ফুটবে···

গোটা লামডিঙে রসো পাগলাই একমাত্র লোক যে চাঁদ দেখলেও খুশি হয়, অমাবস্যাতেও আনন্দে গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায়! সে রোদেও খুশি, বৃষ্টিতেও তার আহ্লাদ। শীত, গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই তার মন নাচে। সর্বদাই রসো খুশি বটে, কিন্তু খিদে পেলে ভারী রেগে যায়।

রসোর খিদে পায় সকালেই। ঘুম থেকে উঠেই সে যে কোনও বাড়ির সামনের রাস্তায় পায়খানা করে সেই বাড়ির উদ্দেশে তর্জন গর্জন করতে থাকে, সব তো বেরিয়ে গেল, এখন ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে না? নিজেরা তো দিব্যি সাঁটছো, রসোব কথা একটু ভাবতে হবে না?

লোকে রসোর নোংরামি দেখে চটে যায় বটে, কিন্তু তাদের অভ্যাসও হয়ে গেছে। খেতে দিলে অবশ্য রসো নিজেই নোংরাটা সাফ করে দেয়।

দুপুরে রসো খায় জৈনদের লঙ্গরখানায়। রাতে এঁটো-কাঁটা জুটে যায়। খাওয়ার সময়টুকু বাদ দিলে রসো ভারী আনন্দে আছে। রাত্রিবেলা সে গিয়ে নয়নসাধুর আখড়ায় পড়ে থাকে। আর ভূতেরা নাকি তার গা হাত পা টিপে দেয়।

বলাই বাহুল্য লামডিঙের মতো জায়গায় ভূত না থাকলে যেন মানায় না। বাস্তবিক লালডিঙে ভূতের এতই বাড়বাড়ন্ত এবং খ্যাতি ছিল যে, নানা জায়গা থেকে অনেক সাধু তান্ত্রিক আর ফকির ভূত ধরতে লামডিঙে চলে আসত। বিশেষ করে শীতে আর বর্ষায় নাকি ভূতেরা চারদিক গিজগিজ করে। করবেই। কারণ বর্ষায় আর শীতেই বুড়ো আর থুত্থুরেরা খুব মরে। তাই তো ভূত হয়ে চারদিকে ঘোরে।

বেশি নয়, নয়নসাধু মোট পাঁচটা ভূত ধরেছিল। তার মধ্যে একটা হল খাঁটি মেম সাহেব। নয়নসাধু কথাটা খুব বড়াই করে বলেও বেড়ায়, আমার পাঁচজনের মধ্যে একটা মেম, বুঝলি? মাটির তলা থোক হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে আর একটা কবরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাকে যেন খুব আদর করছিল। আমি গিয়ে খপ করে চুলের ঝুঁটি চেপে ধরে বললাম, কী রে মেম, এখানে কী হচ্ছে? অমনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, সাধুবাবা, আমি আমার ছেলেকে আদর করছি। মাত্র তিন বছর বয়সে মরে গিয়েছিল কলেরায়—তা

মেমটার জন্য দুঃখু হল। ছেলের আত্মা তো স্বর্গে চলে গেছে। নিষ্পাপ শিশু, তার আত্মা তো আর পাপের দুনিয়ায় পড়ে থাকবে না। সেই থেকে মেমটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখেছি পুষে।

মেমভূতটাকে নয়নসাধু ধরলেও মল্লিকবাবুদের বাড়ির ঘড়িরামকে সে ধরতে পারেনি। ঘড়িরামকে ধরা অত সহজও ছিল না। ঘড়িরাম যখন জীবিত ছিল তখন একটাই নেশা ছিল তার। ঘড়ির নেশা। খুবই গরিব ছিল বলে ঘড়িরামের পক্ষে ঘড়ি কেনা ছিল দুঃসাধ্য। সে কুলির কাজ করত রেল স্টেশনে। কী করে এবং কেনই বা যে তার ঘড়ির শখ হল বলা মুশকিল, তবে ছোট্ট একটা কাঁচে ঢাকা বাক্সর মধ্যে তিনটে কাঁটা ঘুরছে এ দৃশ্য দেখলে সে মুগ্ধ হয়ে যেত। শোনা যায়, ঘড়িরাম বিস্তর মেহনত করে না খেয়ে পয়সা জমিয়ে বহুদিনের চেষ্টায় সস্তায় একটা ঘড়ি কিনেছিল এক জুয়াড়ির কাছ থেকে। কিন্তু যে-দিন ঘড়িটা সে কেনে তার পরদিনই পুলিশ এসে তাকে চুরির দায়ে ধরে নিয়ে যায়। ঘড়িরামকে জেল খাটতে হয়েছিল ক'মাস। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই ঘড়িরাম অন্য মূর্তি ধরল। বিনা দোষে জেল খাটার শোধ তুলতে সে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল যে, লামডিঙ-কে প্রায় ঘড়িশূন্য করে দিয়েছিল সে। ছোরা নিয়ে সন্ধের পর সে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করত এবং যে যেত তারই হাতের ঘড়ি কেড়ে নিত। মোট তিন হাজার সাতশ সাতষট্টিটা ঘড়ি সে সংগ্রহ করে মল্লিকবাবুদের পরিত্যক্ত বাড়ির মাটির নিচে জমিয়ে রেখেছিল। অবশেষে পুলিশ তার সন্ধান পেল এবং বাড়ি ঘিরে ফেলল। ঘড়িরাম পালানোর চেষ্টা করল না, আত্মসমর্পণও করেনি। সে ছোরা হাতে পুলিশকে তেড়ে এল মারতে। ফলে পুলিশের গুলিতে সে মরে গেল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে মরে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘড়িরামের শরীর থেকে একটা বায়ুভূত ঘড়িরাম বেরিয়ে এসে পুলিশকে তাড়া করল। দ্বিতীয় ঘড়ি-রামের তাড়া খেয়ে পুলিশ পালাতে পথ পেল না। সেই থেকে মল্লিক-বাবুদের বাড়ির ধারে কাছে কেউ ঘেঁসে না। কিন্তু আশপাশ দিয়ে দিনের বেলা যারা যায় তারা তিন হাজার সাতশো সাতষট্টিটা ঘড়ির সমবেত টিক টিক আওয়াজ শুনতে পায়।

টিক টিক শব্দটা অবশ্য লামডিঙে নতুন কিছু নয়। বরং এ শব্দটা লামডিঙের একটি অতি পরিচিত শব্দই বলা যায়। ছোট্ট এক-ধরনের টিনের খেলনা আছে যা হাতের তলায় লুকিয়ে নিয়ে চলা যায়,

টিনের একটু পাত আছে সেটাতে আঙুলের চাপে টিক টিক করে শব্দ করে।

ফুলু নামে একটা মেয়ে রোজ তার বাড়ির জানালা দিয়ে নন্টু নামে একটা ছেলেকে দেখতে পেত। নন্টু বেশ ভাল ছেলে, কোনোদিকে তাকায় না, ক্লাসে ফার্স্ট হয়, প্রাইজ পায়। দেখতেও সুন্দর। কিন্তু ফুলুর খুব ইচ্ছে নণ্টু একটু তার দিকে তাকাক। ফুলুও দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু পোলিও রোগে তার দুটো পা এমনভাবে কুঁকড়ে গিয়েছিল যে, দোতলা থেকে সে নামতেই পারত না। ফুলুই একদিন ফেরিওলার হাতে ওই খেলনার শব্দ শুনে একটা কিনে নেয়। নন্টু যেই যেত অমনি বাজাত। নন্টুও দোতলার দিকে তাকাত। চোখাচোখি হত দুজনে। ফুলুও হাসত, নন্টুও হাসত। ফুলু হাসত আনন্দে উত্তেজনায়, নন্টু হাসত করুণায়।

কিছুদিন পরেই নণ্টু পাশ করে বড় শহরে পড়তে চলে গেল এবং ফুলু খেলনাটা অবহেলায় ফেলে রাখল বিছানার পাশে টেবিলে। সেখান থেকে সেটা একদিন নিয়ে নিল তার ছোট ভাই টুলু।

টুলু খেলনাটা বাজিয়ে তার ঘুমন্ত মাকে চমকে দিত। কুকুর বেড়ালকে ভয় দেখাত। তারপর সে একদিন সেটার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলল। টুলু ও ফুলুর বাবা ও মার মধ্যে একদিন বেশ ঝগড়া হল। কথা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু টুলুর বাবার চা চাই, জল চাই, সময়-মতো ভাত চাই। অথচ কথা বন্ধ। ওদিকে টুলুর মার হয়তো দোকান থেকে কিছু আনাতে হবে বা অসময়ে টাকার দরকার পড়েছে। টুলুর বাবা হঠাৎ হাতের কাছে টিকটিক খেলনাটা পেয়ে সেটা বাজালেন এবং তাঁর বউও সংকেত বুঝে চা বা জল দিয়ে গেলেন। খেলনাওলা আবার আসায় টুলুর মাও ওরকম একটা খেলনা কিনে কাছে রাখলেন। দুজনের মধ্যে প্রায়ই ভাব ঝগড়া এবং আবার ভাব হয়। কিন্তু ঝগড়া হলেই দুজনে ওই যন্ত্রের সাহায্যে পরস্পরকে সংকেতবাক্য পাঠাতে থাকেন।

দেখাদেখি আরও স্বামী স্ত্রীরাও অনুরূপ খেলনা কিনে ফেললেন। খেলনাটার নাম দেওয়া হল কটকটি।

তারপর থেকে লামডিঙে টিকটিক শব্দের আর কোনও অভাব রইল না। সর্বত্র এবং প্রায় সর্বদাই টিকটিক শোনা যেতে লাগল।

এই শব্দই একদিন ব্রজেশ্বরকে তাঁর ঘরের বাইরে টেনে আনল।

ব্রজেশ্বর বসু যে লামডিঙে থাকেন এটা অনেকের জানা ছিল বটে, কিন্তু মানুষটা গত বিশ বছর তাঁর ঘর থেকে বেরোননি। বাজার-হাট দোকান-পাট কোথাও তাঁকে কখনও দেখা যায় না। তাঁর বাজার হাট করেন প্রৌঢ়া স্ত্রী। ব্রজেশ্বর তাঁর ঘরে বসে গত বিশ বছর যাবৎ একটানা সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে একটা গুরুতর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে কেউ কেউ শুনেছে। তবে মানুষটাকে কেউ চোখে না দেখতে পাওয়ায় মোটামুটি তাঁর কথা সবাই ভুলে গিয়েছিল।

সেদিন রাতে চোর মগন এসে পায়রার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কটকটি বাজিয়ে তাকে সংকেতে ডাকছিল। চুরি করতে বেরোনোর আগে পায়রার সঙ্গে রোজই সে দেখা করে যায়। গগনবাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর ঝগড়া চলছে কিছুদিন। গগনবাবু কটকটি বাজিয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে ভাত চাইছিলেন। কালীবাবুর বাড়িতে বেড়ালে দুধে মুখ দিয়েছে বলে তাঁর ছেলে বাবু আনন্দে কটকটি বাজাচ্ছিল। আজ রাতে তাকে আর দুধ খেতে হবে না।

কাছাকাছি এতগুলো কটকটি একসঙ্গে বেজে ওঠায় ব্রজেশ্বর দীর্ঘ বিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম সচকিত হলেন। তাঁর মনে হল, একটা কোনও বিপর্যয় আসন্ন। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এসে তিনি দেখলেন, পৃথিবীটা বিশ বছরে অনেকে পাল্টে গেছে। যেখানে গাছ ছিল সেখানে বাড়ি উঠেছে, যেখানে মাঠ ছিল সেখানে রাস্তা হয়েছে। সেদিন খুব ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। ব্রজেশ্বর মুগ্ধ হয়ে চারিদিককার দৃশ্য দেখতে লাগলেন এবং ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

তাঁকে দেখে পায়রা "ভূত-ভূত" বলে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল এবং মগন "রাম-রাম" বলতে বলতে প্রাণভয়ে ছুটে পালাল। মগনের কটকটি যন্ত্রটা পড়ে গিয়েছিল, ব্রজেশ্বর সেটা কুড়িয়ে পেলেন এবং বাজিয়ে দেখলেন। গত বিশ বছর তিনি ঘরের বাইরে আসেননি। তাই তিনি জানেন না, মানুষ এই ক'বছরে কী কী আবিষ্কার করেছে। তিনি দেখে খুবই বিরক্ত হলেন যে, মানুষ এই বিশ্রী যন্ত্রটা আবিষ্কার করেছে। কটকটিটা হাতে নিয়ে তিনি আনমনে হাঁটতে লাগলেন।

সামনেই একটা ভাঙা বাড়ি এবং পরিত্যক্ত বাগান। বাগানের ধারে তিনি এক যুবক এবং একটি যুবতীকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখলেন। যুবক এবং যুবতীরা জ্যোৎস্না রাতের নির্জনতায় দাঁড়িয়ে কী করতে পারে তা ব্রজেশ্বর চিন্তা করলেন না।

তিনি সোজা গিয়ে তাদের সামনে হাজির হয়ে কটকটিটা বাজিয়ে রুদ্ধস্বরে বলতে লাগলেন, মানুষ গত বিশ বছরে এই সব আবিষ্কার করে দুনিয়াটাকে উচ্ছন্নে দিচ্ছে আর তোমরা এখানে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে ফিসফাস করছ ?

যুবতীটি জলভরা চোখে যখন ব্রজেশ্বরের দিকে ফিরে চাইল তখন ব্রজেশ্বর অবাক হয়ে দেখলেন মেয়েটি মেমসাহেব। মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ছেলেটা ব্রজেশ্বরের দিকে কটমট করে চেয়ে বলল, আমরা দুঃখের কথা বলছিলাম আর আপনি এসে সব ভণ্ডুল করে দিলেন। মানুষ কী করেছে তা আমরা জানি না। জানতে হলে মানুষদের কাছে যান। আমরা মানুষ নই।

ব্রজেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, তবে তোমরা কী ?

আমি ঘড়িরাম আর এ হচ্ছে মেরি, আমরা দুজনে দুজনকে ভাল-বাসি। ব্রজেশ্বর ভালবাসা কথাটার তেমন মানেই জানেন না, মাথা চুলকে বললেন, ও তা সে বেশ তো।

কিন্তু মনে মনে ব্রজেশ্বর খুব ভাবতে লাগলেন, ভালবাসা জিনিসটা গোল না চৌকো, লাল না সবুজ। ঘড়িরাম আর মেরি সেই জ্যোৎস্না-রাত্রে ব্রজেশ্বরকে পেয়ে তাদের দুঃখের কথা বলতে লাগল। ঘড়িরাম মেরিকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু নয়নসাধু বলেছে ঘড়িরাম তিন হাজার ঘড়ি পণ না দিলে সে কিছুতেই মেরিকে ছাড়বে না। অথচ ঘড়ি ঘড়িরামের প্রাণ।

অনেকক্ষণ ধরে শোনার পর ব্রজেশ্বরের মাথা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল, ভালবাসা জিনিসটা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন, বহুকাল পর স্মৃতি-পটে আবার সেসব ভেসে উঠল। ঠিকই তো, তিনিও তাঁর বউকে এক-সময় ভালবাসতেন। তারপর সৃষ্টিতত্ত্বের পাল্লায় পড়ে জিনিসটা এক-দম উবে গিয়েছিল মন থেকে।

ব্রজেশ্বর আর দাঁড়ালেন না। প্রায় দৌড়ে বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন তাঁর প্রৌঢ়া স্ত্রী ঘুমোচ্ছেন। মুখখানায় দুঃখ-দুর্দশার ছাপ পড়েছে বটে, কিন্তু এখনও লক্ষ্মীশ্রী লেগে আছে। বউকে ঘুম থেকে জাগিয়ে একটু আদর করতে ইচ্ছে করছিল তাঁর। কিন্তু বহুকাল বউকে ডাকেননি বলে নামটাও মনে আসছিল না।

হঠাৎ হাতের কটকটির দিকে নজর পড়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ব্রজেশ্বর। বউয়ের কানের কাছে কটকটিটা নিয়ে বাজাতে লাগলেন।

বহুদিন বাদে সেই রাতে দুজনের খুব ভালবাসা হল। তাঁরা দু-জনেই খুব হাসলেন, একটু কাঁদলেনও, অনেক জমা কথা ছিল, সে-গুলোও বলতে লাগলেন। কথার ফাঁকে কৌশলে বউয়ের নামটাও জেনে নিলেন ব্রজেশ্বর। উমা। নামটা তাঁর বেশ পছন্দই হল। আর সব চেয়ে বড় কথা, কটকটি জিনিসটাকে তাঁর আর অপছন্দ হল না। খুবই উপকারী জিনিস। মানুষের অনেক কাজে লাগে।

পরদিন থেকেই ব্রজেশ্বরকে পথে ঘাটে হাটে বাজারে সর্বত্র দেখা যেতে লাগল। হাতে কটকটি। যখন তখন বাজাচ্ছেন। লোকে জ্বালাতন হয়ে গেল।

লামডিঙের লোকের অবশ্য জ্বালাতনের অভাব ছিল না। কোজাগরী পূর্ণিমায় লামডিঙের আশেপাশে বনের মধ্যে যেসব সাদা সুন্দর ডল পুতুলের মতো পরীরা নেমে আসত, তাদের কথা সকলেই জানে। লাম-ডিঙের পরীদের মতো সুন্দর পরী অন্য কোথাও দেখা যায় না। তারা বুনো ফুলের মধু খেত ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে। বাতাসে ভেসে তারা কত রকমের নাচের মুদ্রা তৈরি করত। চারদিকটা ভরে উঠত তাদের গায়ের আশ্চর্য সুগন্ধে।

কিন্তু জ্বালাতন এল অন্য দিক থেকে। ভিন্ন গ্রহের যে সব প্রাণী মহাকাশ থেকে প্রায়ই লামডিঙের বনে বাদাড়ে তাদের বেলুনের মতো বা চুরুটের মতো বা পিরিচের মতো মহাকাশযানে করে নামত তাদের সঙ্গে কারও কখনও ঝগড়া বিবাদ বা যুদ্ধ হয়নি। তারা নেমে এসে লামডিঙের সরস সতেজ ঘাস কেটে নিয়ে যেত, ছিঁড়ে নিয়ে যেত লেবু বা করমচার পাতা। তাদের চেহারা খুবই অদ্ভুত, পোশাকও অন্য-রকম। লামডিঙের লোকেরা তাদের দূর থেকে দেখত। কাছে যেত না। শুধু রসো-পাগলা গিয়ে তাদের কাছে বিড়ি চাইত। ভিন্ন গ্রহের প্রাণীরা যে বিড়ি খায় না এ তো সকলেই জানে। তবে তারা ঘাস ও গাছের পাতা খেতে খুবই ভালবাসে। ভিন্ন গ্রহের একজন প্রাণী একবার সত্যসিন্ধুবাবুর নাতনির হাত থেকে রসগোল্লা কেড়ে নিয়ে খেয়ে-ছিল বলে শোনা যায়। এবং রসগোল্লা খাওয়ার পরই সে সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে টলতে টলতে কোনও রকমে তার মহাকাশযানে ফিরে গিয়েছিল। একবার তাদের নজর পড়ল ওই পরীদের দিকে। সেবার কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে যখন পরীরা এসে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে আনন্দ করছে তখন অনেকগুলো মহাকাশযান চারদিকে নেমে এল এবং ভিন্ন

জগতের প্রাণীরা দলে দলে জালদড়ি আর আঠাকাঠি নিয়ে এল পরীদের ধরতে। তারপর বনের মধ্যে সে কী হয় যুদ্ধ!

রসো পাগলাই প্রথম খবরটা দিল সবাইকে ছুটে এসে। লামডিঙের লোকেরা খুব বীর নয়, কিন্তু পরীরা হল তাদের নিজেদের ছেলেমেয়ের মতো। লাঠিসোটা নিয়ে তারাও ছুটল পরীদের বাঁচাতে।

কিন্তু ভিন্ন গ্রহের প্রাণীরা অনেক বেশি শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান। তারা নানারকম অস্ত্রশস্ত্র বের বের করে ভয় দেখাতে লাগল। অন্য-দিকে পরীরা তখন প্রাণপণে ছুটোছুটি করছে। আর একদল ভিন্ন গ্রহের প্রাণী তাদের নানা কলকৌশলে ঝপাঝপ ধরে ফেলছে।

এই যখন অবস্থা তখন হঠাৎ ঘড়িরাম কোথা থেকে এসে হাজির হল। তার হাতে ছোরা। সঙ্গে মেরি, মেরির হাতে একগাছা ঝাঁটা। তারপর সে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। ভিন্ন গ্রহের প্রাণীরা যতই গুলি করুক আর রশ্মি ছুঁড়ুক ঘড়িরামের কিছুই হয় না। কিন্তু ঘড়িরামের পরা-ক্রমে তাদের নাজেহাল অবস্থা। মেরির ঝাঁটাও কম গেল না। নয়ন-সাধুর পাঁচটা ভূতও এসে হাত লাগাল। তাদের চেহারা রোগা এবং ধোঁয়াটে হলেও ভিন্ন গ্রহের প্রাণীরা তাদের কাছে গো-হারান হেরে পালাল।

পরীরা আবার খেলতে লাগল বনের মধ্যে।

লামডিঙের গল্প সহজে শেষ হবার নয়। এক গল্প থেকে আর এক গল্পে এবং তা থেকে আর এক গল্পে চলে যেতে কোনও বাধা নেই। চোর সাধু ম্যাজিসিয়ান লোভী কৃপণ সব রকমের মানুষ এবং অমানুষ নিয়ে লামডিঙ। নিত্যই সেখানে নতুন নতুন সব ঘটনা শুরু হচ্ছে। কিন্তু সব ঘটনাই যে শেষ হচ্ছে এমন নয়। আসলে পৃথিবীর কোনও গল্পই বোধ হয় পুরোপুরি শেষ হয় না। নানা শাখাপ্রশাখায় তা ছড়িয়ে যেতে থাকে। কিন্তু আমাদের তো এক জায়গায় থামতেই হবে।

দেখা হবে

নকশিকাঁথার মত বিচিত্র এক পৃথিবী ছিল আমাদের শৈশবে। এখনও পায়ের তলায় পৃথিবীর মাটি, চারিদিকে গাছপালা, মাথার উপর আকাশ। বুক ভরে শ্বাস টেনে দেখি। না, শীতের সকালে কুয়াশায় ভেজা বাগান থেকে যে রহস্যময় বন্য গন্ধটি পাওয়া যেতো তা আর পাওয়া যায় না। আমাদের সাঁওতাল মালি বিকেলের দিকে পাতা পুড়িয়ে আগুন জ্বালত। সেই গন্ধ কতবার আমাকে ভিন্ন এক জন্মের স্মৃতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আর মনে আছে মায়ের গায়ের ঘ্রাণ। সে গন্ধে ঘুমের ভেতরেও টের পেতাম, মা অনেক রাতে বিছানায় এলো। মার দিকে পাশ ফিরে শুতাম ঠিক। তখন নতুন ক্লাসে উঠে নতুন বই পেতাম ফি বছর। কী সুঘ্রাণ ছিল সেই নতুন বইয়ের পাতায়। মনে পড়ে বর্ষায় কদম ফুল কুড়িয়ে এনে বল খেলা। হাতে পায়ে কদমের রেণু লেগে থাকত বুঝি। কী ছিল। কী থাকে মানুষের শৈশবে। বিকেলের আলো মরে এলো যেই, অমনি পৃথিবীটা চলে যেত ভূতেদের হাতে। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়া ছিল ভারি শক্ত। বিশাল বাড়িতে কয়েকটি প্রাণী আমরা গায়ে গায়ে ঘেঁষে থাকতাম। ভোরের আলোটি ফুটতে না ফুটতে ঘুম ভেঙে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ছুটতাম বাইরে। বাইরেটাই ছিল বিস্ময়ের। সূর্য উঠছে, আকাশটা নীল, গাছপালা সবুজ। সব ঠিক আগের দিনের মতই। তবু অবাক হয়ে দেখতাম, মনে হতো, গতকাল ঠিক এরকম দেখিনি তো। সেই আনন্দিত ছেলেবেলায় একটা দুঃখের ঘটনা ঘটে গেল। আমার ছোটকাকা মৃত্যুশয্যায়। মাত্র দেড় বছর আগে কাকিমা এসেছেন ঘরে। একটি ফুটফুটে মেয়েও হয়েছে। সে তখন হাত পা নেড়ে উপুড় হয়, কত আহলাদের শব্দ করে। তবু বৌ-মেয়ে রেখে ছোটকাকার মরণ ঘনিয়ে এলো। বিকেলে শ্বাস উঠে গেছে। দাদু তখন বাইরের বারান্দায় বসে আছেন। বাঁ হাতে ধরা তামাকের নল, কল্কেতে আগুন নিভে গেছে কখন। সন্ধের পর জ্যোৎস্না উঠেছে সেদিন। দাদু সেই জ্যোৎস্নায় পা মেলে বসে আছেন। ভিতর বাড়িতে কান্নার শব্দ উঠেছে। বাবা আর জ্যাঠামশাইরা এসে দাদুকে ডাকলেন।

—আসুন, প্রিয়নাথকে একবার দেখবেন না ?

দাদু খড়মের শব্দ তুলে ভিতর-বাড়িতে এলেন। তাঁর মুখখানা একটু ভার দেখাচ্ছিল, আর কিছু নয়। ছোটকাকা তখন বড় বড় চোখে চারদিকে তাকাচ্ছেন। কাকে যেন খুঁজছেন। কী যেন খুঁজে পাচ্ছেন না। বার বার বলছেন—তোমরা সব চুপ করে আছ কেন ? কিছু বলো, আমাকে কিছু বলো।

জ্যাঠামশাই নিচু হয়ে বললেন—কী শুনতে চাও প্রিয়নাথ ?

ছোটকাকা ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে বললেন—আমি কী জানি ! একটা ভাল কথা, একটা সুন্দর কথা কিছু আমাকে বলো, আমার কষ্ট ভুলিয়ে দাও। আমি কেন এই বয়সে সবাইকে ছেড়ে যাচ্ছি—আমার মেয়ে রইল, বৌ রইল—আমার এই কষ্টের সময় কেউ কোন সুখের কথা বলতে পারো না ?

বড় কঠিন সেই পরীক্ষা। কেউ কিছু বলতে পারে না। সবাই কেবল মরোণোন্মুখ মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, কথা খুঁজে পায় না। কিন্তু প্রত্যেকেরই ঠোঁট কাঁপে।

একজন অতি কষ্টে বললো—তুমি ভালো হয়ে যাবে প্রিয়নাথ। শুনে ছোটকাকা ধমকে বললেন—যাও যাও—।

আর একজন বললো—তোমার মেয়ে-বৌকে আমরা দেখবো, ভয় নেই।

শুনে ছোটকাকা মুখ বিকৃত করে বললেন—আঃ, তা তো জানিই, অন্য কিছু বলো।

কেউ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

সেই সময়ে দাদু ঘরে এলেন। স্বাভাবিক ধীর পায়ে এসে বসলেন ছোটকাকার বিছানার পাশে। ছোটকাকা মুখ ফিরিয়ে তাঁকে দেখে বললেন—বাবা সারাজীবন আপনি কোনো ভাল কথা বলেননি, কেবল শাসন করেছেন ! এবার বলুন।

সবাই নিস্তব্ধ ! সেই নিস্তব্ধতায় একটা পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ অদৃশ্য থেকে এগিয়ে আসছে। ছোটকাকাকে জীবনের তীরভূমি থেকে অথৈ অন্ধকারের এক সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাবে বলে ঢেউটা আসছে, আসছে। আর সময় নেই। ছোটকাকার জিভটা এলিয়ে পড়েছে, বার বার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, মুখ প্রবল ব্যথায় বিকৃত !

দাদু একটু ঝুঁকে শান্ত স্বরে বললেন—প্রিয়নাথ, আবার দেখা হবে।

কী ছিল সেই কথায়! কিছুই না। অতিথি-অভ্যাগত বিদায় দেওয়ার সময় মানুষ যেমন বলে, তেমনি সাধারণভাবে বলা! তবু সেই কথা শুনে মৃত্যুপথযাত্রী ছোটকাকার মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে গেল। তিনি শান্তভাবে চোখ বুজলেন। ঘুমিয়ে পড়লেন।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। নকশিকাঁথার মত বিচিত্র সুন্দর শৈশবের পৃথিবী কোথায় হারিয়ে গেছে। সেই সুন্দর গন্ধগুলো আর পাই না, তেমন ভোর আর আসে না। মায়ের গায়ের সুঘ্রাণের জন্য প্রাণ আনচান করে। পৃথিবী বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। বুড়ো গাছের মধ্যে শুকিয়ে যাচ্ছে আমার ডালপালা। খসে যাচ্ছে পাতা। মহাকালের অন্তঃস্থলে তৈরি হচ্ছে একটি ঢেউ। একদিন যে এই পৃথিবীর তীরভূমি থেকে আমাকে নিয়ে যাবে।

বুকের মধ্যে শৈশবের একটি কথা তীরের মতো বিঁধে থরথর করে কাঁপছে আজও। সেই অমোঘ ঢেউটিকে যখনই প্রত্যক্ষ করি, মনে মনে তখনই ঐ কথাটি বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। শৈশবের সব ঘ্রাণ, শব্দ ও স্পর্শ ফিরিয়ে আনে। মায়ের গায়ের ঘ্রাণ পেয়ে যেমন ছেলেবেলায় পাশ ফিরতাম তেমনি আবার পৃথিবীর দিকে পাশ ফিরে শুই। মনে হয়, দেখা হবে। আবার আমাদের দেখা হবে।

জমা-খরচ

কী বুঝেছো মুখুজ্জে ? চল্লিশ পেরিয়ে জীবনের এক আধটা হিসেব কষে ফেলা উচিত ছিল তোমার। একদিন ছুটি-টুটি দেখে বরং একটা খাতা নিয়ে বসে যাও। এক দিকে লেখ জমা, অন্য ধারে খরচ। ঐ যেমন অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টরা ডেবিট ক্রেডিট লেখে আর কি !

জমার ঘরে প্রথমেই লেখ, জন্ম। ওটা প্লাস পয়েণ্ট। একটা আর্নিং তো বটেই। কিন্তু আয়ুটাকে জমার ঘরে রেখো না। জন্মের পর থেকে আয়ু আর জমা হয় না। এটা খরচ বলে ধরো।

ব্যালানস শিটটার দিকে একবার তাকাও, ভাল দেখাচ্ছে না ? জমা, জন্ম। খরচ আয়ু।

জন্মের পর একরোখা বহু দূর চলে এসেছো। টর্চের আলোটা একটু পিছন দিকে ঘুরিয়ে ফেলবে নাকি ? মগজের ব্যাটারি এখন আর তেমন জোরালো নয় হে। আলো একটু টিমটিমে। তবু দেখা যায়। একটা সাইকেল দেখতে পাচ্ছো, মাটির দাওয়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো ? একটা লেবু গাছ ! আর ঐ মস্ত সেই নদী ! শীতে দুধ-সাদা চর জেগে ওঠে বুকে, ভর বর্ষায় রেলগাড়ির মতো বয়ে যায়।

এসব কোনো খাতেই লিখো না মুখুজ্জে। ওগুলো না জমা, না খরচ। ঐ সেই বাঘের মতো রাগী লোকটা সন্ধ্যায় আবছায়ায় পুব-মুখো মস্ত ডেক চেয়ারে বসে আছে বারান্দায় ! চেনো তো। আর কারো বশ মানেনি কখনো, কেবল তোমার কাছে মেনেছিল। তোমার ইস্কুলের হাতের লেখা পর্যন্ত চুপি চুপি লিখে দিত, ভুলে গেছ ? কোন খাতে ধরবে তোমার দাদুকে ?

জমার ঘরে ধরলে ? ভুল করলে না তো ? একটু ভেবে দেখ। বরং কেটে দাও। কোনো খাতেই ধোরো না।

ময়ূরটার কথা লিখবে নাকি ? সত্যি বটে, গোলোকপুরের জমিদার বাড়ির মস্ত উঠোনে পাম গাছের নিচে ওকে তুমি বহুবার পেখম ধরে থাকতে দেখেছো। চালচিত্রের মতো রঙিন বিস্ময়। কিন্তু বলো, বিস্ময় আমাদের কোন কাজে লাগে ? আমাদের মূলধন জমার খাতে সৌন্দর্যের কোনো ভূমিকাই নেই।

বরং জমার খাতে ধরতে পারো তোমার জেঠিমার হাতে ডাল ফোড়নের গন্ধটাকে। ঐ অসম্ভব সুন্দর ডাল দিয়ে থাবাথাবি করে কতজন ভাইবোন মিলে এক থালায় ভাত মেখে খেতে।

আর বর্ষায় মুকুন্দর ঘানিঘরের পিছনে যে কদমফুল ফুটত! যদি খুব ইচ্ছে হয় তবে ওটাকেও জমার ঘরেই ধরতে পারো। তবে আমি বলি ফুল-টুল, জীবনে খুব একটা কাজে লাগে না। কদমফুল অবশ্য লেগেছিল। পাপড়ি ছিঁড়ে গোল মুণ্ডুটা দিয়ে তোমরা ফুটবল খেলতে শিখলে।

প্রথম এরোপ্লেন দেখার কথা মনে পড়ে? টর্চটা ভাল করে ফেল। দেখতে পাবে। ঐ যে কলকাতার মনোহরপুকুরের সেই দোতলার ঘর? দেশের বাড়ি, নদী, লেবুবন, দাদু সবকিছু থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল তোমাকে। সারাদিন মন খারাপ। পৃথিবী জুড়ে তখন বিশাল এক যুদ্ধ চলছে। এরোপ্লেনের আওয়াজ পেলেই ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসতে তুমি। মাথাটা উঁচুতে তুলতে। তুলতে তুলতে মাথা লটকে যেত পিঠের সঙ্গে। এরোপ্লেন যেত ঝাঁক বেঁধে। তার মধ্যে একটা এরোপ্লেন দলছুট হয়ে একটা ডিগবাজি খেয়ে নিয়ে আবার উড়ে গেল।

তোমার শৈশব মাখামাখি হয়ে আছে রেলগাড়ি আর এরোপ্লেনে। তোমার ভিতরে জঙ্গল, পাহাড়, নদী, কুয়াশা, চা-বাগান ঢুকে পড়েছিল কবে! আজও তুমি তাই নিজের চারদিকটা স্পষ্ট করে দেখতে পাও না। মাঝে মাঝে ঝুম হয়ে বসে থাকো। তোমার মাথার মধ্যে রেল লাইন দিয়ে গাড়ি বহু দূরে চলে যায়, আকাশ পেরোয় বিষণ্ণ এরোপ্লেনের শব্দ, অবিরল নদী বইতে থাকে। তোমার সময় যায় বৃথা। মুখুজ্জে, এগুলো তোমার খরচের দিকে ধরে রাখো।

সেই কোকিলের ডাকের কথা তুমি বহুবার শুনিয়েছো লোককে। কাটিহারের সেই ভোরবেলা, শীতশেষের কুয়াশা-মাখা আবছায়ায় শিমুল বা মাদার গাছের মগডাল থেকে একটা কোকিল ডেকে উঠেছিল। সেই ডাকে অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল শৈশবের নির্মোক। তুমি জেগে উঠলে। সত্যি নাকি মুখুজ্জে? ঠিক এরকম হয়েছিল?

সেই কোকিলের ডাকের কথা তুমি একদিন বড় হয়ে বলেছিলে তোমার ভালবাসার যুবতীটিকে।

সে বলল, যাঃ।

সত্যি। তুমি বুঝবে না বুলু। এরকমই হয়েছিল।

কোকিলের ডাক আমি তো কত শুনেছি! কোনোদিন আমার সেরকম হয়নি তো!

আঃ, কোকিলের ডাকটাই তো আর বড় কথা নয়।

তবে?

সে যে সেই বিশেষ মুহূর্তে ডেকে উঠল সেইটেই বড় কথা।

বিশেষ মুহূর্তটা কিসের?

শিশু বয়সের অবচেতনার ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ল যে।

যাঃ, বানানো কথা।

মুখুজ্জে, আজও তুমি ঠিক করতে পারোনি, কোকিলটাকে কোন খাতে ধরবে। কিন্তু কোনো না কোনো খাতে ধরতেই হবে যে, ওটা যে তোমার জীবনকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল।

ধরো, জমার খাতেই ধরো।

কোকিলের ডাকের পরেই এল মঞ্জু। মঞ্জুই তো? ঠিক বলছি না! মঞ্জুর মতো সুন্দর মেয়ে সেই বয়সে তুমি আর দেখনি। বব চুল, ফর্সা, টুকটুকে, মেম ছাঁটের ফ্রক। এর কথাও তুমি বহুবার বলেছো। মঞ্জুর সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পেতে। মঞ্জু তোমাকে পাত্তা দিত না। কিন্তু সেই বয়সের টান কি সহজে ছাড়ে। ওদের বাড়ির আনাচ কানাচ দিয়ে ঘুরতে, গুলতিতে পাখি মারবার চেষ্টা করতে, বড় গাছে উঠে যেতে। দেখানোর মতো এই সব বীরত্বই সম্বল ছিল তোমার।

তারপর একদিন নিজেদের বাগানে খেলতে খেলতে মঞ্জু একদিন ফটকের কাছে ছুটে এসে ডাক দিল, রতু! এই রতু!

তুমি পালাচ্ছিলে ডাক শুনে। মঞ্জু ছাড়েনি তবু। ফটক খুলে পাথরকুচির রাস্তায় কচি পায়ের শব্দ তুলে দৌড়ে এসে হাত ধরল। বড় বড় চোখে চেয়ে রইল মুখের দিকে, অবাক হয়ে।

এত ডাকছি, শুনতে পাওনি?

ডাকছিলে? ও তাহলে, শুনতে পাইনি।

ঠিক শুনেছো। দুষ্টু কোথাকার! ভারী ডাঁট তো তোমার।

তুমি কথা বলতেই পারোনি।

মঞ্জু হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তোমাকে, ওদের বাগানে। পরীর

মতো মেয়েরা খেলেছে ওদের বাগানে, গাছে চড়ছে, হাসছে, চেঁচাচ্ছে। চোরের মতো দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি।

মঞ্জু দৌড়ে একটা পেয়ারা এনে তোমার আড়ষ্ট হাতে গুঁজে দিয়ে দিয়ে বলল, খাও রত্নু।

খাবো ?

তবে পেয়ারা দিয়ে কী করে লোকে ? খায়ই তো।

কী যে সুগন্ধ মাখানো ছিল পেয়ারাটার গায়ে, আজও মনে আছে তোমার। হয়তো পাউডার বা স্নোয়ের গন্ধ, হয়তো তা মঞ্জুরই গন্ধ।

পেয়ারাটাকে কোন খাতে ধরবে মুখুজ্জে।

ইস্কুলে চোরের মার খেতে তুমি রোজ। মার খেতে খালাসি-পট্টিতে, মেছোবাজারে, বাবুপাড়ায়। দুষ্টু ছিলে, দাঙ্গাবাজ ছিলে, তাই মার খেতে খেতে বড় হলে। সবচেয়ে বেশি লেগেছিল একদিন। ইস্কুল থেকে ফেরার সময়ে খালাসিপট্টিতে একটা লোক হঠাৎ অকারণে কোথা থেকে সমুখে এসে তোমার পথ আটকাল।

তুমি পাশ কাটাতে চেষ্টা করছিলে।

লোকটা হঠাৎ বলল 'শুয়োর কা বাচ্চা,' তারপর বিনা কারণে তোমার কান ধরে গালে একটা চড় কসিয়ে দিল। সেই চড়টা আজও জমা আছে। কিছুতেই ভোলোনি। শোধ নেওয়া হয়নি। তুমি শোধ নিতে ভালবাস না কিন্তু আজও ভাবো, এই চড়টার শোধবোধ হওয়া দরকার। চড়টাকে কোন খাতে ধরবে মুখুজ্জে ?

বড় একটা শ্বাস ফেললে ? ফেল। তোমার অনেক নিশ্বাস জমা হয়ে আছে।

বেশ গুছিয়ে বসেছো। প্রথম যৌবনের ততটা টানাটানির সংসার আর নেই। দুবেলা দুটো ভালমন্দ খাও। ঘরে দু-চারটে দামী জিনিসপত্রও নেই কি ? আছে ছেলে, মেয়ে, বউ।

বউ সেই মঞ্জু নয়, বুলুও নয়। এ অন্য একজন, যাকে তুমি আজও চেনোনি।

বউ বলে তুমি অপদার্থ, ভীতু। বদমাশ। কখনো বলে, তোমাকে ভালবাসি।

এইসব কথাগুলো হিসেবে ফেলে দেখ তো, কোনটা জমা, কোনটা খরচ।

পারছ না মুখুজ্জে, গুলিয়ে যাচ্ছে।

ঐ যে একটি চিঠি এল তোমার নামে সেদিন। কী সুন্দর এক অচেনা মেয়ের চিঠি।

পড়ো মুখুজ্জে। লিখছে: আপনার একটুখানি বেঁচে থাকা আমার কাছে অনেকখানি। প্রণাম করলাম।

কোন খাতে চিঠিটাকে ধরছ? জমা। হাসালে।

বড্ড জট পাকিয়ে যাচ্ছে হিসেব নিকেশ মুখুজ্জে। মেয়ে এসে গলা জড়িয়ে বলছে, বাবি তোমাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। আবার ছোট্ট ছেলেটা তোমাকে দেখলেই দুহাত তুলে ঝাঁপিয়ে আসে।

এগুলো জমার খাতে ধরবে না।

সুখ আর দুঃখগুলোকে আলাদা করে করে আঁটি বেঁধে রেখেছো, কিন্তু কোন খাতে যাবে তা ধরোনি। সব সুখই তো আর জমা নয়। সব দুঃখই যেমন নয় খরচ।

কাঁদছো মুখুজ্জে। কাঁদো। এই মধ্য বা শেষ যৌবনে একটু আধটু কাঁদতেই হয় মানুষকে। হিসেবের সবে শুরু কিনা।

আশ্চর্য প্রদীপ

অনিকেত চাকরি করে একটা আধা-বিদেশী ফার্মে, কেটেকুটে নিয়ে মাসে বেতন পায় সাত শ' ছাব্বিশ টাকা। তার মধ্যে বাড়ি ভাড়াতে যায় এক শ' আশি, দুধ পঞ্চান্ন, ঝি পনেরো। খবরের কাগজ, ইলেকট্রিসিটি, ছেলের ইস্কুলের মাইনে এসব বাদ-সাদ গিয়ে হাতে যা থাকে তা দিয়ে বেঁচে থাকা যায়। তার বৌ ঝুমুর আবার একটু বড়-লোকের মেয়ে। খুব বড়লোক নয়, তবে কলকাতায় বাড়ি আছে, ওর এক দাদা গাড়িও কিনেছে। ঝুমুর তাই একটু নাক-উঁচু। প্রায়ই বলে—গ্যাসের উনুন কেনো! কিস্তিবন্দিতে একটা ফ্রিজ কেনা যায় না? বাইরের ঘরটায় ভাড়ার টেবিল ফ্যান রেখে মাসে মাসে টাকা গচ্চা যাচ্ছে, একটা পাখা কিনলেই তো হয়।

ঝুমুর এসব বলে ব'লে অনিকেত রাগ করে না। বরঞ্চ তার মনের মধ্যেও ওসব ইচ্ছে হয়। নিজস্ব পাখা, গ্যাসের উনুন, ফ্রিজ এসব আজকাল মধ্যবিত্ত ঘরেও দেখা যায়। তার বন্ধুদেরও অনেকের আছে। একটা তিন শ' টাকার ইনক্রিমেনট যদি দৈবক্রমে পেয়ে যেত, তাহলে বেশ হত। কিন্তু সে আশা নেই। বরং এ বছর নাকি বোনাসও কমে যাবে। মনটা নিসপিস করে। বড্ড গরিবিয়ানা মতে তারা থাকে। অনেকদিন ধরে ভাল জামা-প্যাণ্টও করায় না সে। কত নতুন ধরনের প্যাণ্ট-জামার কাপড় বেরিয়েছে গত এক বছর ধরে।

পুরোনো বাড়ি ছেড়ে মাস চারেক হল অনিকেত নতুন বাড়িতে এসেছে বণ্ডেল গেটে। নতুন বাড়ি বলতে কিন্তু বাড়িটা নতুন নয়। বরং বেশ পুরোনো বাড়ি। দেড়খানা একতলার ঘরের জন্য এক শ' আশি টাকা গুনতে হয়। এর আগে শেয়ালদার কাছে ছিল, দুখানা ঘরের ভাড়া এক শ' দশ। কিন্তু ছেলেটাকে সাউথের ভাল স্কুলে ভর্তি করার পর থেকেই ঝুমুর সাউথে আসার জন্য অস্থির। তাই আরো সত্তর টাকা মাসিক গুনোগার দিয়ে চলে আসতে হয়েছে দক্ষিণে। ছেলের ইস্কুলটাই এখন বড় কথা।

বাড়িটা ভাল লাগে না অনিকেতের। বড্ড অন্ধকার। একটা ঘর নিচের তলায়, আর আধখানা ঘর পেয়েছে গ্যারেজের ওপর।

গ্যারেজের ওপরকার ঘরটা বড়ই ছিল, বাড়িওলা দেয়াল তুলে সেটাকে দু টুকরো করে বাকি আধখানা ঘরে তার অনেক পুরোনো জিনিসপত্তর ডাঁই করে রেখেছে। তবু এই ঘরটায় কিছু আলো-বাতাস আসে। অনিকেত এটাকেই তার বসার ঘর করেছে, যদিও তার বাসায় লোক-জন বড় একটা আসে না। অনিকেতও কাউকে ডাকে না। লোকজন এলে ভদ্রতা-টদ্রতা করতে ঝুমুর বড় খুশি হয় না। বৌয়ের খুশিটাই তো এখন বড় কথা।

অনিকেত খুব ভাবতে ভালবাসে। বলতে কি ভাবাটাই হচ্ছে তার সবচেয়ে প্রিয় নেশা। একটা সিনেমা দেখল, কি একটা বই পড়ল, অমনি সিনেমা বা বইয়ের গল্পের সুতো ধরে কত কী চিন্তা তার মাথায় মায়াজাল ছড়িয়ে দেয়। আর সে-সব চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে দাঁড়ায় একটা চিন্তা—আমার যদি অনেক টাকা থাকত।

অফিস থেকে ফিরে প্রায়-সময়েই সে একটু রাতের দিকে এই আধ-খানা ঘরটায় এসে বসে সিগারেট খায় আর ভাবে। ছুটির দুপুরে এখানেই এসে মেঝেয় পড়ে ঘুমোয়।

গ্রীষ্মকাল পড়ে গেছে। রবিবার। বেলা করে খেয়ে অনিকেত চুপচাপ চলে এল দেড়তলার ঘরখানায়। একা বোকা শুয়ে থাকল মেঝেয় শতরঞ্চি পেতে। একটা সিগারেট শেষ হয়েছে, আর একটা ধরাবে কি না ভাবতে ভাবতেই ঘুমের আমেজ চলে এল। ঘুম আসার এই সময়টা বড় ভাল লাগে অনিকেতের। বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্ন কেমন কেমন গুলিয়ে যায়। এসব ব্যাপারগুলো আছে বলেই মানুষের বেঁচে থাকাটা একরকম সওয়া যায়।

ঘুমঘোরে অনিকেত আবোল-তাবোল আধোচেতনায় অনেক হিজি-বিজি দেখছিল। এ সময়ে একটা ঠুনঠুন শব্দে চটকা ভাঙল তার। পাশ ফিরে দেখল, একটা ধেড়ে ইঁদুর একটা বেশ বড়সড় প্রদীপের মতো কী একটা জিনিস টেনে এনেছে মেঝেয়। প্রদীপটা তাদের নয়, অনিকেত জানে। বোধ হয়, বাড়িওয়ালার গুদামঘরটা থেকেই এনেছে। "যাঃ, যাঃ" বলে তাড়া দিতেই ইঁদুরটা প্রদীপ ফেলে পালিয়ে গেল।

অনিকেতের কাছ থেকে খুব দূরেও নয় প্রদীপটা। সে হাত বাড়িয়েই নাগাল পেল। হাতে তুলে নিয়ে দেখল, বেশ ভারী। "সলিড মেটাল। সোনা-টোনা নয়তো!" বলে হাতলওলা মস্ত প্রদীপটা একটু নাড়াচাড়া করল সে। প্রদীপটার গায়ে ময়লা পড়েছে বহুদিনের।

এটা যে দীর্ঘকাল ব্যবহার হয়নি তা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু জিনিসটা সুন্দর। এখনা বেচে দিলে পাঁচ-দশ টাকা পাওয়া যাবে। অবশ্য বেচবার কথা এমনিই ভাবল সে। বেচবার প্রশ্নও ওঠে না। অন্যের জিনিস। কিছুক্ষণ প্রদীপটা হাতে নিয়ে শুয়ে রইল সে। হঠাৎ মাথায় ভাবনা এল—আচ্ছা, এটা যদি সেই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হত। যদি এটাতে হাত ঘসলেই এখন একটা দৈত্য এসে দাঁড়ায় আর বলে—কী চাও বল, এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।

ভাবনা-চিন্তারও একটা শক্তি আছে। অনিকেত উঠে বসল। যদি সত্যিই এ-রকম কিছু হয়। যদিও বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে এসব বিশ্বাস কোনো কাজের নয়, তবু যদি হত। অ্যাঁ! যদি হত?

প্রদীপটা হাতে নিয়ে আঙুলে একটু ঘসা দেয় সে। একা ঘরেও তার হাসি পাচ্ছিল, আর বোকা-বোকা লাগছিল নিজেকে। জানে তো এসব সত্য নয়। এ-রকম হয় না। তবু সে কয়েকবার প্রদীপটার ভিতর দিকে ডান হাতের বুড়ো আঙুল জোরে বারকয়েক ঘসা দিল।

না, কিছুই ঘটল না। কিন্তু হঠাৎ ভেজানো দরজাটার কড়া খুট-খুট করে আস্তে নড়ে উঠল।

ঝুমুর এল নাকি চা নিয়ে? চট করে হাতের ঘড়িটা দেখে নিল অনিকেত। না, ঝুমুর এত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে না। মোটে দুটো পঁচিশ।

—কে?

উত্তর নেই।

অনিকেত প্রদীপটা রেখে গিয়ে দরজা খুলে অবাক। খুব লম্বা-চওড়া আর খুব দামী পোশাক-পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। অন্তত ছ'ফুট তিন-চার ইঞ্চি লম্বা তো হবেই। বিশাল কাঁধ, প্রকাণ্ড বুক, ইয়া চওড়া হাতের কব্জি। বিদেশী সিনথেটিক কাপড়ের সাদা স্যুট পরা, গলায় টাই, মৃদু একটা ইনটিমেট সেণ্টের গন্ধ ছড়াচ্ছে লোকটার গা থেকে। বোধহয় বকসিং বা কুস্তি করে। কিন্তু খুব ফর্সা আর সুপুরুষ, মুখে মৃদু বিনীত একটু হাসি।

অনিকেতকে দেখেই দু হাত জড়ো করে বলল—আমাকে চিনবেন না। আমি প্রদীপের দৈত্য।

অনিকেত বলল—প্রদীপ দত্ত? প্রদীপ দত্ত! আপনার সঙ্গে কোথাও কি পরিচয়—?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল—প্রদীপ দত্ত নয়। প্রদীপের দৈত্য! আপনি এক্ষুনি ঐ প্রদীপটা ঘসেছিলেন, তাই না?

স্তম্ভিত অনিকেত মাথা নাড়ল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

লোকটা বলল—তাই আমাকে আসতে হল। বলুন, এখন আপনার জন্য কী করতে পারি?

যদিও অনিকেত বিশ্বাস করতে পারছিল না লোকটাকে, তবু বলল—ভিতরে আসুন।

প্রকাণ্ড এবং সুপুরুষ লোকটা মাথা নিচু করে ঘরে এল। চারদিকে চেয়ে বলল—ঘরটা ভীষণ ছোটো আর স্টাফি, এই ঘরে থাকেন কী করে?

—অভ্যেস। তাছাড়া পাচ্ছিই বা কোথায়?

লোকটা অনিকেতের সোফা সেটে পা ছড়িয়ে বসল, কিন্তু মুখে সেই অতি বিনীত হাসি আর হাবভাবে নম্রতা ছড়িয়ে আছে।

অনিকেত মুখোমুখি বসল, তার সস্তা সিগারেটের প্যাকেটটা লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—আমরা গল্পে পড়েছি, আশ্চর্য প্রদীপ ঘসলে তার ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো বিশাল চেহারার দৈত্য বেরিয়ে আসত। এই বড় বড় দাঁত, তালগাছের মতো উঁচু চেহারা!

লোকটা সিগারেট দেখে হাত জোড় করে বলল—ওটা পারব না মিস্টার বোস। এখন থেকে আপনি আমার বস। বসের সামনে ধূমপান করাটা বেয়াদবি।

অনিকেত খুশিই হল। প্যাকেটে গোনা-গুনতি ছ'টা সিগারেট আছে, আজ আর কিনবার কথা নয়। একটা ফালতু খরচ হয়ে গেলে অসুবিধে হত। সকালে চায়ের পরে সিগারেটটায় টান পড়ত।

লোকটা বলল—হ্যাঁ, যে কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। চেহারার কথা তো! সেই ধোঁয়ার মতো ধড় নিয়ে দেখা দিলে আপনিও খুশি হতেন না, পাঁচজনে চেঁচামেচি করত। তা ছাড়া ইভোলিউশন বা বিবর্তন বলেও তো একটা কথা আছে। তাই যে-যুগের যেমন দরকার, তেমনি হয়েই আমাকে আসতে হয়। ক্লায়েন্টরা ঘাবড়ে গেলে বা হার্টফেল করলে ফায়দা কী? বলে লোকটা হাঁ করে দাঁতগুলো দেখিয়ে বললেন—এই দু পাশে দুটো মস্ত দাঁত ছিল, সব ছোটো করিয়ে ফেলেছি স্ক্রেপ করিয়ে। এ-যুগে এসব প্রি-হিস্টোরিক দাঁত কি চলে?

অনিকেতের নিজের এখন সিগারেট খাওয়ার কথা নয়। একটু আগেই খেয়েছে। হিসেব করে না চললে—!

লোকটা একটু হেসে বলল—তাই আপনি প্রদীপ ঘসামাত্র আমি প্রদীপ থেকে বেরিয়ে আসিনি, বরং আপনাকে ঘাবড়ে যেতে না দিয়ে খুব ভদ্রভাবে দরজায় নক করেছি।

অনিকেতের বুকটা কাঁপছিল। উত্তেজনায় সিগারেটটা ধরিয়েই বুঝল, বেহিসেবী খরচ হয়ে যাচ্ছে। আবার তৎক্ষণাৎ মনে হল—এ লোকটা যদি প্রদীপের দৈত্যই হয়ে থাকে তবে এর কাছে অনায়াসেই তো এক প্যাকেট সিগারেট চাওয়া যায়! একটু ভেবে অনিকেত খুব লাজুক স্বরে বলল—এক প্যাকেট সিগারেট যে এখন কাকে দিয়ে আনাই।

—জাস্ট এ মিনিট। লোকটা টপ করে উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেট থেকে এক প্যাকেট পাঁচ শো পঞ্চান্নর কিং সাইজ কুড়িটার প্যাকেট আর একটা ক্ষুদে গ্যাসলাইটার বের করে সেন্টার টেবিলে রেখে বলল—আমি এটা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। ইউ মে নীড এ লট অব সিগারেটস। বলুন, এখন আর কী করতে পারি!

খুব অবিশ্বাসভরে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটারটা দেখল অনিকেত। তার বুক কাঁপছে, অসম্ভব নার্ভাস লাগছে, ভয় করছে। তবু লোকটার বিনয় আর ভদ্রতা দেখে তার একটু সাহসও হচ্ছিল আস্তে আস্তে। সে বলল—আমি যা চাই সব দিতে পারবেন?

লোকটা মাথাটা অল্প নেড়ে বলল—নিশ্চয়ই। যে-কোন বস্তুগত জিনিসই আমি আপনাকে দিতে পারি। কিন্তু যদি আপনার মন খারাপ লাগে কখনো, বা যদি গানের গলা না থাকা সত্ত্বেও কখনো আপনার সঠিক সুরে গান গাইতে ইচ্ছে করে, তাহলে সেসব ক্ষেত্রে আমার কিছু করার নেই। কিন্তু মন ভাল রাখার জন্য আমি আপনাকে সিনেমার টিকিট, সুন্দরী মেয়ে বা ভাল মদ সাপ্লাই দিতে পারি, গানের জন্য তানপুরা, হারমোনিয়াম বা ভাল ওস্তাদ এনে দিতে পারি।

—যদি অসুখ হয়?

—তার জন্য ডাক্তার বা ওষুধ এনে দেওয়ার ভার আমার, কিন্তু অসুখ সারানোর দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। বস্তুগত সব জিনিসই আপনি আমার কাছ থেকে পাবেন, বাট নাথিং অ্যাবস্ট্রাক্ট অর ম্যাজিক্যাল।

অনিকেত মাথা নেড়ে বলে—বুঝেছি।

লোকটা মিষ্টি হেসে বলল—এ যুগের সঙ্গে আমার ক্ষমতাকেও সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

অনিকেত শ্বাস ফেলে বলল—তাতেই হবে।

লোকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল—ধন্যবাদ। এবার বলুন—

অনিকেতের চাইতে লজ্জা করছিল। একটা লোক তাকে মাগনা মাগনা জিনিসপত্র দেবে, ভাবতে কেমন লাগে। তাই সে সরাসরি কিছু চাইতে পারল না। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল—আমার নাম অনিকেত। এ নামের মানে আপনি কি জানেন?

লোকটা হেসে বলল—আলবৎ। অনিকেত মানে যার নিকেত বা নিকেতন অর্থাৎ বাড়ি নেই। মানে, গৃহহীন।

অনিকেত মৃদু লাজুক হেসে বলে—আমি সার্থকনামা। আমার বাড়ি নেই।

—ইট উইল বি অ্যারেঞ্জড। বলে লোকটা মাথা নেড়ে পকেট থেকে একটা চমৎকার নোটবই আর ডটপেন বের করে বলল—বলুন কী রকম বাড়ি আপনার দরকার? রিকোয়ারমেণ্টসগুলো একটু ডিটেলে বলবেন।

অনিকেত ভীষণ সংকোচের সঙ্গে বলে—ছোটখাটো একটা বাড়ি হলেই হবে। যেমন হোক।

—সংকোচ করবেন না মিস্টার বোস। আমি আপনার যে কোনো হুকুম তামিল করতে বাধ্য। ডোণ্ট বি শাই।

অনিকেত একটু ভেবে বলল—দোতলা। পাঁচ-ছ'খানা ঘর। ভাল বাথরুম-টাথরুম। দক্ষিণে বারান্দা। যদি একটু বাগান—? বলে থামল।

—হুঁ হুঁ বলুন। ঘরগুলো কত বাই কত?

—মাঝারি। খুব বড় বা ছোট নয়।

—বুঝেছি। ফার্নিচারের কথা কিছু বলবেন?

—ফার্নিচার? ওঃ হ্যাঁ, ফার্নিচার। ধরুন, ডানলোপিলোর সব চেয়ার, সোফা, বার্মা টিক-এর খাট। মানে, সব মডার্ন জিনিস, আর কি। আপনি যেমন ভাল বুঝবেন তেমন। আর আমার স্ত্রী একটা ফ্রিজের কথা প্রায়ই বলেন, আর গ্যাস উনুন।

লোকটা নোটবই বন্ধ করে বলল—বাড়িটা কোন্ এরিয়ায় হলে আপনার পছন্দ?

—ধরুন, নিউ আলিপুর! না, না, সেখানে বড় নির্জন জায়গা,

চাকরের দুপুরে বাড়ির গিন্নিকে খুন করে পালানোর কেস কাগজে পড়েছি। তার চেয়ে যোধপুর পার্ক ভাল।

লোকটা মাথা নাড়ল, বলল—ইট উইল বি অ্যারেঞ্জড্। ভাববেন না। কাল বেলা এগারোটায় আমি আপনার অফিসে ফোন করব। ততক্ষণে একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। আমি আসি তাহলে। বলে লোকটা উঠল।

অনিকেত তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বলল—আচ্ছা, আমি আপনাকে কী বলে ডাকব বলুন তো?

লোকটা একটুও না ভেবে হেসে বলল—ইজি। আপনি যে নামে আমাকে প্রথম ডেকেছিলেন সেই নামে ডাকবেন। প্রদীপ দত্ত।

লোকটা চলে গেল। হঠাৎ অনিকেতের মনে হল—কী বোকা আমি। টেলিভিশনের কথাটা বলে দিলাম না! ভেবে পরমুহূর্তেই সে হাসল। ভাবল, দূর! লোকটাকে তো আবার এক্ষুনি ডাকতে পারি। কিন্তু এক্ষুনি আবার ডাকতে লজ্জা করল বলে ডাকল না। কাল তো দেখা হবেই।

প্রদীপটা খুব সাবধানে কাগজে মুড়ে ঘরের বুক শেলফে একটা ডিকসনারিকে সরিয়ে গুঁজে রাখল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এটা স্বপ্ন। কিন্তু পাঁচশো পঞ্চান্ন নম্বরের প্যাকেট আর লাইটার এখনো পড়ে আছে টেবিলে। সে খুব মেজাজে একটা সিগারেট ধরাল। তার-পর ভাবল—এ রকম হা-ভাতের মতো আমি এতকাল বেঁচেছিলাম কী করে?

না আঁচালে বিশ্বাস নেই। সে ঝুমুরকে কিছু বলল না। কাঁপা বুক আর উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। খেতে পারল না, ঘুম হল না ভাল করে। আজ তার বারবার মনে হচ্ছিল, ঝুমুর দেখতে নিতান্তই সাদামাটা। এত সাধারণ মেয়ে নিয়ে ঘর করার কোনো মজা নেই।

পরদিন ঠিক বেলা এগারোটায় ফোন এল। প্রদীপ দত্ত বলল—মিস্টার বোস, একটা ট্যাক্সি নিয়ে এক্ষুনি চলে আসুন। আমি আপনার জন্য গড়িয়াহাটের পুব দিকের ফুটপাথে বাসস্টপে অপেক্ষা করছি। অফিস থেকে হাফ ছুটি নিন, আর ট্যাক্সি ফেয়ার আমিই দেবো।

তাই হল। যথাস্থানে প্রদীপ দত্ত অপেক্ষা করছিল, ট্যাক্সিতে

অনিকেতের পাশে উঠে বসে অতি সুগন্ধি রুমালে ঘাড়-মুখ মুছতে মুছতে বলল—খুব ভাল বাড়ি পেয়েছি, আপনার যদি পছন্দ হয় তো এ সপ্তাহেই নেগোশিয়েশন হয়ে যাবে।

অনিকেত ভ্রূ তুলে বলল—বাড়িটা কি রাতারাতি তৈরি করলেন?

প্রদীপ দত্ত হেসে ফেলে বলে—আরে না, না। মিস্টার বোস, আগের দিনে যেমন হত তেমন কি আজকালও হবে? ফাঁকা জায়গারও তো ওনার আছে। তাছাড়া রাতারাতি বাড়ি উঠলে সবাই এসে চেপে ধরবে আপনাকে; কর্পোরেশন, ট্যাক্স, সি ই এস সি, কে নয়? এখন যা হবে সব থ্রু প্রপার নেগোশিয়েশন্স। আপনাকে আমি তো বিপদে ফেলতে পারি না।

ট্যাক্সি যেখানে এসে থামল, সেটা যোধপুর পার্কের চমৎকার একটা চওড়া রাস্তা। বাড়ি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সামনে অনেকখানি লন, ফুলের বেড। অকল্পনীয় সুন্দর নক্সার টালি বসানো মেঝে। নিচের তলায় ছখানা ঘর, দোতলায় চারখানা। তিনতলায় দুই ঘরের স্টাডি, রুফ গার্ডেন।

প্রদীপ দত্ত বলল—সদ্য তৈরি হয়েছে বাড়িটা। এখনো কেউ থাকেনি। বাড়ির মালিক শেয়ারের মার্কেটে জোর মার খেয়ে বাড়ি বিক্রি করতে চাইছে।

একটু লজ্জার সঙ্গে অনিকেত বলে—কত?

—ছ লাখ। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। দ্যাটস মাই হেডেক।

তবু সংকোচ বোধ করে অনিকেত। টি ভি সেটটার কথা বলতে লজ্জা করে।

কিন্তু প্রদীপ দত্ত যেন তার মনের কথা টের পেয়েই বলল—টি ভি সেট বা মোটর গাড়ির কথা আপনার রিকোয়্যারমেন্টসে ছিল না, কিন্তু সেসব অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। এখন আপনার একটা প্রেজেন্টেবল সোর্স অব ইনকাম আর ট্যাক্স রিটার্নগুলো দেখাতে হবে। সে সমস্ত নিয়ে অবশ্য আপনাকে ভাবতে হবে না। লীভ এভরিথিং অন মি। আপনি বরং মিসেসকে নিয়ে এসে বাড়িটা দেখিয়ে দিন।

ঝুমুর! ঝুমুরের কথা অনিকেত ভুলেই গিয়েছিল। এখন অবশ্য ঝুমুরের কথা ভাবতেও তার ভাল লাগছিল না। ইদানীং ঝুমুর বড্ড মোটা হয়ে গেছে। ভীষণ রাগীও। তাছাড়া ঝুমুরের মধ্যে রহস্যও নেই আর।

অনিচ্ছার সঙ্গে অনিকেত বলল—আচ্ছা।

প্রদীপ দত্ত তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাসল, বলল—আর যদি আপনি ইন্টারেস্টেড হন তবে ডিভোর্সের মামলা লড়ার জন্য ভাল উকিলেরও অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যেতে পারে। হাই অ্যালিমনি দিলে মিসেসও খুব ঝামেলা করবেন না। যদি রাজি থাকেন তো সেসব আমিই নেগোশিয়েট করতে পারি

একটু লাল হল অনিকত। বুকটা নানা আশা-আকাঙ্ক্ষায় গুরগুর পাখির ডাক ডাকছে। মাথা নিচু করে সে বলল—তা নয়। ঝুমুরও থাক। ছেলেটাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। তবে অন্য মেয়ে—

প্রদীপ দত্ত হঠাৎ গলা নিচু করে বলল—কিরকম মেয়েছেলে চান?

অনিকেত রুমালে মুখ ঢেকে, লাল হয়ে অনেক কষ্টে তার গোপন ইচ্ছের কথা অস্ফুটে বলল—টিনএজার। সুন্দর, লাইভলি।

—ও কে।

সাতদিনের মধ্যেই জীবন পাল্টে গেল অনিকেতের।

ঝুমুর বাড়ি দেখে এত অবাক যে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। টুইন গ্যারেজে দু-দুটো দামী গাড়ি, ঘরে ঘরে ভাবা যায় না এমন সব জিনিস, চাকর, ঝি, মালি, সফারে বাড়ি গিজ গিজ। পাঁচ-সাতটা ঘর এয়ারকন্ডিশন করা। এসব কি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের কাণ্ড নাকি?

কয়েকবারই জিজ্ঞেস করেছে অনিকেতকে—এসব কি গো? কি করে হল?

—হয়েছে থ্রু প্রপার নেগোশিয়েশনস্। অনিকেত বলে—সব ট্যাক্স পেইড। চিন্তার কিছু নেই।

আর বেশি কিছু বলে না অনিকেত।

একদিন প্রদীপ দত্ত ফোন করল—মিস্টার বোস, একটু দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না। আপনার রিকোয়ারমেণ্টস অনুযায়ী একটি টিনএজার গার্ল পাওয়া গেছে। না, না, চিন্তার কিছু নেই, এসব ব্যাপারের জন্য ক্যামাক স্ট্রিটে একটা ফার্নিশড অ্যাপার্টমেণ্ট আপনার নামে কেনা হয়েছে। আজ সন্ধেবেলা চলে আসুন। দিস অ্যাপার্টমেণ্ট উইল বি ইওর প্লেজার স্পট। আপনার সফার ঠিকানা জানে।

শুনে অবধি অসম্ভব নার্ভাস লাগছিল অনিকেতের। হৃৎপিণ্ড এত জোরে ধাক্কা দিচ্ছে পাঁজরে যে সেই শব্দ নিজের কানে শুনতে পাচ্ছিল সে।

তবু গেল। তীব্র উত্তেজনা। এতদিনে সে জীবনকে উপভোগ করতে পারছে। এই তো জীবন।

সফার এক আটতলা বাড়ির সামনে নিয়ে এল অনিকেতকে। লিফ্‌টে সাততলায় উঠে কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে বিনীত হাসি-মুখে প্রদীপ দত্ত বলল—এভরিথিং সেট। আসুন স্যার।

অ্যাপার্টমেণ্টটা তার নিজের বাড়ির তুলনায় তেমন কিছু নয়। তবু এটাও চূড়ান্ত শৌখিন জায়গা। ঘরজোড়া কার্পেট, সোফা সেট, দুর্দান্ত সব আসবাব। ফ্রিজ, টি ভি সবই আছে। আর আছে ছোট্ট একটা বার, তাতে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট রকমের বিলিতি মদ।

অসামান্য সুন্দরী মেয়েটি বসে ছিল একদম ভিতরের দিকে একটা ঘরে। দরজার গা-তালায় চাবি ঢুকিয়ে প্রদীপ দত্ত দরজা খুলতে খুলতে বলল—মেয়েটা অ্যাগ্রেসিভ, ওয়াচ ইয়োর স্টেপস।

শুনে একটু চমকে যায় অনিকেত।

ঘরে ঢুকে সে আর একবার চমকায়। ঘরে একটা ডিভান, একটা ড্রেসিং টেবিল, দুটো ছোট টুল আর একটা হোয়াট-নট ছাড়া বেশি কিছু নেই। এক গোছা রজনীগন্ধা ভাঙা ফুলদানি-সহ মেঝেয় ছিটিয়ে পড়ে আছে, জলে ভিজে শপ্‌ শপ্‌ করছে কার্পেট-মোড়া মেঝে। ড্রেসিং টেবিলের আয়না চুরমার, টুলগুলোর পায়া ভাঙা, ডিভানে কালো পাতলা একটা হাউস কোট পরে মেয়েটি বসে আছে। এত সুন্দর মেয়ে অনিকেত জীবনে দেখেনি। যেমন ক্ষীণকটি, তেমনি উন্নত বুক। মুখ কে যেন ছেনি দিয়ে লক্ষ বছর ধরে কেটে কেটে তৈরি করেছে। গায়ের রঙ গোলাপী আলোয় ভরে দিয়েছে ঘর! তার চুল এলোমেলো, দুটো চোখ বাঘিনীর মতো জ্বলছে। অনিকেতের দিকে একবার রক্তজল করা চোখে তাকাল।

তারপর উঠে চকিত পায়ে দৌড়ে এল দরজার দিকে। অনিকেত যেখানে দাঁড়িয়ে ঠিক সেই দিকে। অনিকেত কিছু বুঝবারও সময় পেল না, মেয়েটা প্রচণ্ড নখে হঠাৎ চিরে ফেলতে লাগল তার মুখ। অনিকেত চিৎকার করে উঠল—প্রদীপ দত্ত! প্রদীপ দত্ত!

বন্ধ দরজা খুলে প্রদীপ দত্ত শান্ত পায়ে ঘরে আসে। একটা হাতে মেয়েটাকে তুলে নেয় অনায়াসে। ডিভানে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অনিকেতকে বলে—আমি ঠিক রিকোয়্যারমেণ্টস মতো বাছাই করে মেয়েটিকে তুলে এনেছি। কিন্তু আপনার প্রতি ওকে অ্যাট্রাকটেড করে তোলার কোনো উপায় আমার নেই। দ্যাট ইজ ইওর বিজনেস মিস্টার বোস। ট্রাই এগেন।

বলে চলে যায় প্রদীপ দত্ত।

অনিকেতের গাল ছিঁড়ে রক্ত পড়ছে, আগুনের মতো জ্বালা করছে মুখ-মেয়েটা উপুড় হয়ে ডিভানে পড়ে কাঁদছে।

অনিকেতের মাথায় আগুন জ্বলে গেল। হঠাৎ চিতাবাঘের মতো গিয়ে লাফিয়ে পড়ল ডিভানে।

প্রায় আধঘণ্টা গেল ধস্তাধস্তিতে। অনিকেত মেয়েটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারে না। মেয়েটার দুখানা লম্বা হাত, হাতে নখ, দু-খানা পায়ে হরিণের গতি, অসম্ভব দম—এসবই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বার দুই ধরতে পেরেছিল সে মেয়েটিকে, কিন্তু কিছু করার আগেই ছিটকে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। অনিকেত তীব্র পিপাসায় ছটফট করে। এমন তীব্র নারীদেহের তৃষ্ণা সে আগে কখনো টের পায়নি। কিন্তু তার বয়স প্রায় চল্লিশ, শরীর আগের মতো সতেজ নেই, দম কমে এসেছে। সে তাই হাঁফায় জিভ বের করা কুকুরের মতো।

তারপর প্রদীপ দত্ত আসে।

—সরি মিস্টার বোস।

অনিকেত মুখ তুলে তাকায়। তার একটু লজ্জা করে। সে একটু মাথা নেড়ে জানাল, সে পারেনি।

প্রদীপ দত্ত একবার 'হুঁ' বলে একটু ভাবে। তারপর হঠাৎ কোথা থেকে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জে ওষুধ জাতীয় কিছু নিয়ে আসে। মেয়েটিকে সে অনায়াসে ধরে ফেলে এক হাতে, তারপর ঝাঁকুনি দিয়ে ডিভানে শুইয়ে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে তার পিঠ, তারপর ইঞ্জেকশনের নির্দয় ছুঁচে তার হাতে ওষুধ ঢুকিয়ে দিয়ে অনিকেতকে বলে—এবার যা খুশি করুন।

মেয়েটি আর বাধা দেয় না, নিষ্ক্রিয় পুতুলের মতো শুয়ে থাকে এক ঘোর আচ্ছন্নতায়। অনিকেত তার এতকালের অতৃপ্ত সমস্ত কামনা-

বাসনা নিয়ে মেয়েটিকে গ্রহণ করার সময়ে টের পায়, মেয়েটি সম্পূর্ণ কুমারী ছিল।

অনিকেত নির্জীব হয়ে যখন উঠে এল তখন প্রদীপ দত্ত ঘরে আসে। একটু হেসে বলে—ও কে?

অনিকেত অনেক রাত পর্যন্ত মদ খেল বসে। বারংবার মেয়েটির শরীর আক্রমণ করল গিয়ে। কোনোবারই তৃপ্ত হল না। আরো আগুন জ্বলে ওঠে শরীরে। ভোর রাতে সে প্রদীপ দত্তকে ডেকে বলল—আরো মেয়ে। প্রতিদিন নতুন।

প্রদীপ দত্ত মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—ব্যবস্থা হবে মিস্টার বোস।

অনেক কাল থেকে চেপে রাখা বহু ইচ্ছে অনিকেতের চিন্তায় নানা রঙের বর্ণালি সৃষ্টি করত। প্রতিদিন চাকরিতে যাওয়ার সময়ে মনে হত—হায় রে, যদি ছুটি পেতাম অনন্ত! বড়লোকদের পাড়ায় চমৎকার সব বাড়ি দেখলে মনে হত—এরকম বাড়ি যদি আমার হত। সুন্দরী মেয়ে দেখলে ভাবত—এ যদি হত আমার প্রেমিকা! এরকম ইচ্ছে আর ইচ্ছে।

প্রায় সব ইচ্ছেই পূর্ণ হল অনিকেতের। ছুটি, বাড়ি, আর সুন্দরী মেয়েরা। অবশ্য মেয়েরা যে সবাই তার প্রেমিকা হয়েছে তা নয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বশীভূত হয়েছে। কলকাতায় অন্তত দশ বারোখানা অ্যাপার্টমেণ্ট কেনা হয়েছে অনিকেতের নামে। সেরা সুন্দরীরা সেখানে থাকে। যোধপুর পার্কের বাড়িতে বড় একটা যাওয়া হয় না অনিকেতের। এইসব অ্যাপার্টমেণ্টেই তার দিন কাটে। প্রদীপ দত্ত ছায়ার মতো তার সঙ্গে আছে, কোনো গোলমাল হলেই এসে হাজির হয়।

অনিকেত এখন কয়েকটা মস্ত মস্ত প্ল্যাণ্টের মালিক, বিরাট ব্যবসা তার। অবশ্য সেসব তাকে দেখতে হয় না, প্রদীপ দত্তই সব দেখাশোনা করে। এখন সে দেশের একজন অগ্রগণ্য লোক। অনেকগুলো সংস্থার সভাপতি, চেয়ারম্যান। বিপুল প্রতিপত্তি তার। খবরের কাগজে তার নাম ওঠে। অনিকেত কয়েকবার ঘুরে এল লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, টোকিও। গেল হাওয়াই দ্বীপে ফূর্তি করতে, মোনাকোতে গিয়ে জুয়া খেলল, প্যারিসে মহিলা-প্রেমে রইল ডুবে। জীবনটা কানায় কানায় ভরে উঠেছে তার, কোনো অভাব নেই। কেবল মনে হয়, তাকে যদি ঈশ্বর আরো একটু কামের ক্ষমতা দিতেন, আরো ক্ষুধা-তৃষ্ণা দিতেন তাহলে বড় ভাল হত। পৃথিবী

ভর্তি সুন্দরী মেয়ে, কত মহার্ঘ সুস্বাদু খাবার, কত চমৎকার পানীয়। কিন্তু একটামাত্র শরীরে আর কত ভোগ করা যাবে?

খুব ভোরবেলায় অনিকেতকে উঠতে হয়। খাটো প্যান্ট আর গেঞ্জি, শীতকাল হলে পুলওভার প'রে গাড়ি করে ময়দানে যায়। ময়দানে অনেকক্ষণ দৌড়ায় সে। ঠিক দৌড় নয়, প্রদীপ দত্ত বলে, জগিং। দৌড়তে হয় আস্তে আস্তে, অনেকক্ষণ ধরে। সঙ্গে সব সময়ে প্রদীপ দত্ত থাকে। দৌড়ে ফিরে এলেই ব্যায়াম-শিক্ষক আসে, তারপর যোগ-ব্যায়ামের শিক্ষক। ব্রেকফাস্ট। প্রদীপ দত্ত এই সময়ে অনেক কাগজপত্রে সই করায়। দশটা বাজতে না বাজতেই লোকজন আসে, কনফারেন্স থাকে, আসে খোশামুদেরা। প্ল্যান্টে যেতে হয় মাঝে মাঝে। টেলিফোনে কথা বলতে হয়। বিকেলে ক্লাব বা রেস্টুরেন্টে, কখনো বা মিটিং থাকে। সন্ধের পর থাকে মেয়েরা, ড্রিংকস, কখনো বা বন্ধুবান্ধব জাতীয় কিছু লোকের সঙ্গে থাকে পার্টি। অবশ্য এসব ফেলে রেখে অনিকেত যে-কোনো সময়ে দেশভ্রমণেও বেরিয়ে পড়তে পারে। ভারতের সব বড় শহর, স্বাস্থ্যনিবাস বা সুন্দর জায়গায় তার বাড়ি আছে। বাড়ি আছে লণ্ডন, নিউইয়র্ক বা টোকিয়োতেও। কোথাও কোনো অভাব রাখেনি প্রদীপের দৈত্য ওরফে প্রদীপ দত্ত। নিরাপদ এবং নিশ্ছিদ্র তার আরাম। যেদিন তার কথা বলতে ইচ্ছে করে না বা কাজ করতে ইচ্ছে করে না সেদিন প্রদীপ দত্তই সব সামলায়, কোথাও আটকায় না।

মাসে চারবার তার শরীরের চেক আপ হয়। ডাক্তাররা রক্তচাপ মাপে, চোখ-দাঁত দেখে, কান-নাক পরীক্ষা করে, রক্তে চিনির পরিমাপ মাপে, ই সি জি হয়, এক্স-রে হয়। কোথাও একটু খুঁত পেলেই সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করা হচ্ছে, অনিকেতের জীবন বড় নিশ্চিন্ত।

খুব ভোরে অনিকেত দৌড়োচ্ছে মাঠে। শীতকাল। একটা ভারী কুয়াশা চারদিককে ভুতুড়ে করে রেখেছে। সূর্য উঠতে অনেক দেরি। চারদিক আবছায়ায় ঘোর। গায়ে যথেষ্ট মোটা একটা পুলওভার, কান-মুখ মাফলারে ঢাকা, পায়ে দৌড়ের জুতো। বেশ লাগছিল অনিকেতের। একটু হাঁফ ধরে আসছিল বটে, কিন্তু সে গতরাতের হ্যাংওভারও হতে পারে।

দু'কদম পিছনে নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করছে প্রদীপ দত্ত। অনিকেত একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকে দেখল। হঠাৎ বলল— প্রদীপ দত্ত, আমার বয়স কত হল?

প্রদীপ দত্ত দৌড় বজায় রেখেই বলল—একচল্লিশ বছর তিন মাস তেরো দিন। আজকের দিনটা নিয়ে!

অনিকেত একটু থমকে গিয়ে বলে—চল্লিশ হয়ে গেল এর মধ্যে! কত বললে? একচল্লিশ? এই তো সেদিন আটত্রিশ ছিলাম।

প্রদীপ দত্ত হেসে বলে—ইয়েস স্যার, ম্যাট্রিকে সার্টিফিকেটে এখনো আপনার চল্লিশ হয়নি। কিন্তু আসল বয়স—

দৌড় থামিয়ে অনিকেত, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—একচল্লিশ ইজ টু মাচ।

—কিছু করার নেই মিস্টার বোস। প্রদীপ দত্ত হতাশভাবে বলে।

আজকাল অনিকেতের মাঝে মাঝে রাগ হয় প্রদীপ দত্তর ওপর। এখন ওকে সে 'তুমি' করে বলে, ধমকায়। ওর কাছে আজকাল কিছু চাইতে আর লজ্জা বোধ করে না অনিকেত। মাঝে মাঝে এমনও ভাবে সে—লোকটা কোনো কাজের নয়। সব দিচ্ছে তবু কোথায় ফাঁকি রাখছে যেন!

অনিকেত বলল—প্রদীপ দত্ত, তোমার বয়স কত?

প্রশ্ন শুনে প্রদীপ দত্ত একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলে—আমার বয়স? সে অনেক। আমি ভারচুয়ালি এজলেস্।

—তবু বলো।

প্রদীপ দত্ত একটু হেসে বলে—আমি এই পৃথিবীর সমান-বয়সী।

—মিথ্যে কথা প্রদীপ দত্ত।

—মাপ করবেন স্যার, আমার জন্ম কবে হয়েছিল আমার তা জানা নেই।

—তোমার কখনো অসুখ করে না? বুড়ো হওয়ার ভয় ধরে না তোমাকে? মৃত্যুচিন্তা হয় না?

প্রদীপ দত্ত বলল—না।

অনিকেত একটা শ্বাস ছাড়ে। তারপর শ্লথ গতিতে আবার দৌড়োয় সে। পিছনে নিঃশব্দ ছায়ার মতো প্রদীপ দত্ত। দৌড়োতে দৌড়োতে অনিকেত হঠাৎ বলে—প্রদীপ দত্ত, আমি হাঁফিয়ে পড়ছি

কেন? খুব বেশি দৌড়োইনি আজ, তবু কেন আমার হাঁফ ধরছে?

—একটু বিশ্রাম করুন, ঠিক হয়ে যাবে।

—তুমি হাঁফাওনি?

প্রদীপ দত্ত ম্লান একটু হেসে বলে—না। হাঁফিয়ে পড়লে আমার চলে না।

নিজের মার্সিডিজ বেনজ গাড়িতে ময়দান থেকে ফিরবার সময়েও অনিকেত বার বার জিজ্ঞেস করল—আমি আজ হাঁফিয়ে পড়লাম কেন বলো তো?

প্রদীপ দত্ত গম্ভীর বিনয়ের সঙ্গে বলে—কিছু না। ঠিক হয়ে যাবে।

—কল দি ডকটরস।

ডাক্তাররা এল। আগাপাশতলা পরীক্ষা করল তাকে। না, কিছু হয়নি। হার্ট ঠিক আছে, প্রেশার স্বাভাবিক, রক্তে চিনি নেই, লাংস ভাল।

—তবে? প্রশ্ন করে অনিকেত।

প্রদীপ দত্ত তার কানে কানে আস্তে করে বলে—বয়স। চল্লিশের পর একটু ডিজিনেস আসে। কিছু না। এ বয়সের যে-কোনো লোকের চেয়ে আপনার হেল্‌থ অনেক ভাল।

অবহেলার সঙ্গে একবার প্রদীপ দত্তকে দেখে নিয়ে অনিকেত বলে—দেখো, হেল্‌থ যেন আর গড়বড় না করে।

—চেষ্টা করব স্যার। সব রকম ট্রিটমেণ্টের ব্যবস্থা হবে।

অনিকেত একটু গম্ভীর হয়ে গেল। আজ কোনো কাজ করল না অনিকেত। কেবল ছাদের বাগানে ঘুরে ঘুরে অজস্র বিরল ফুলের সৌন্দর্য দেখল। তারপর এক সময়ে উত্তেজিত হয়ে ডাকল—প্রদীপ দত্ত! প্রদীপ দত্ত!

প্রদীপ দত্ত দৌড়ে উঠে আসে ছাদে।

অনিকেত একটা বসরাই গোলাপ গাছে শুকনো ফুল দেখিয়ে বলে—এটা কী? এটা এখানে কেন? জানো না আমি মরা ফুল দেখতে পারি না।

—দুঃখিত মিস্টার বোস। এক্ষুনি তুলে ফেলে দিচ্ছি।

প্রদীপ দত্ত ফুলটা তুলতে যাচ্ছিল, অনিকেত বাধা দিয়ে বলল—থাক, থাক। তুলো না।

কী কারণে যেন প্রদীপ দত্ত একটু হাসল।

অনিকেত ঘরে ফিরে আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে আপন মনে বলল—একচল্লিশ। একচল্লিশ!

আয়নায় ছায়া ফেলে প্রদীপ দত্ত কাছে এসে বলল—এমন কিছু নয় স্যার, চল্লিশে যৌবন শুরু।

অনিকেত একটু হেসে বলে—ইফ ফর্টি কামস, ক্যান ফিফ্‌টি বি ফার বিহাইণ্ড?

কী কারণে যেন প্রদীপ দত্ত আবার একটু হাসল।

কে আমাকে ভালবাসে?—হঠাৎ এই প্রশ্ন মাঝ রাতে চাবুকের মতো তার সমস্ত শরীরকে চমকে দিল। ঘুম ভেঙে উঠে বসে অনিকেত। প্রশ্নটাকে অসম্ভব জরুরী বলে মনে হয়। যে মেয়েটি তার বিছানায় শুয়ে আছে সে-ই প্রথম দিন খিমচে দিয়েছিল তার গালে। এখন ভীষণ বাধ্য হয়ে গেছে।

অনিকেত ডাকল—মিলি, মিলি!

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল মিলি। গায়ের আবরণ সরাতে সরাতে কটাক্ষ করে হাসল একটু।

অনিকেত মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। ও কি ভালবাসে আমাকে?

অনিকেত বলল—মিলি, তুমি একটু গান গাইবে?

—নিশ্চয়ই। কী গান গাইতে হবে?

—যা খুশি। আনন্দের গান গাও, প্রেমের গান।

মিলি গাইতে লাগল।

অনিকেত মাথা নেড়ে বলে—না, গান নয়। এসো দুজনে নাচি।

দুজনে নাচল। নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

—হচ্ছে না। অনিকেত বলে।

—কী?

—কিছু নয়। মিলি, আমাকে একটু জড়িয়ে ধরে থাকো, তোমার শ্বাসে আমার শ্বাস মিশে যাক, আমি তোমাকে কিছুক্ষণ অনুভব করি।

মিলি আশ্লেষে জড়িয়ে ধরল তাকে। নিঝুম হয়ে খানিকক্ষণ অনুভব করে অনিকেত। মিলিকে সে যা করতে বলে তাই করে সে। নইলে প্রদীপ দত্ত আসবে, ভয়ঙ্কর শাস্তি দেবে মিলিকে। অনিকেত মিলির বুকের হৃদ্‌স্পন্দন শুনল। জোরে চলছে হৃৎপিণ্ড। এর হৃৎপিণ্ডে ভয়ের বাস, লোভের আস্তানা।

ঘোর রাতে গাড়ি বের করতে হুকুম দিল অনিকেত। প্রদীপ দত্তকে

ডাকতে হয় না, সে আপনিই নিঃশব্দে সঙ্গ দেয়। বিভিন্ন পোষা মেয়েমানুষের কাছে ঘুরে বেড়ায়, অনিকেত, নিজের বৌ আর ছেলের কাছেও যায়। কিন্তু কোথাও যেন কোনো নিশ্চয়তা পায় না। সবাই বাধ্য, বিনীত, ভদ্র, হুকুমমাত্র যাকে দিয়ে যা খুশি তাই করাতে পারে অনিকেত। তবু কেমন এক অনিশ্চয়তা। এই গভীর রাতে সে সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে ঘুম ভাঙাল। কেউ বিরক্ত হল না, বরং তটস্থ হল, আপ্যায়ন করল, ভালবাসা প্রকাশ করল। এমন কি ঝুমুরও।

—আশ্চর্য! অনিকেত গাড়িতে ফিরে আসবার সময়ে বলল।

একটু যেন লজ্জিত হয়ে প্রদীপ দত্ত বলে—আপনি যেমন চেয়েছিলেন ঠিক তেমনিই সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট করা আছে মিস্টার বোস। আপনি কোন ত্রুটি পাচ্ছেন না তো?

—পাচ্ছি প্রদীপ দত্ত। আমি একটা মানুষকেও অর্জন করতে পারিনি।

—কেউ বেয়াদপি করেনি তো স্যার? প্রদীপ দত্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলে।

—না। আর সেইটেই তো বেয়াদপি। এরা কেউ বেয়াদপি করছে না, রাগ করছে না আমার ওপর, অভিমান করছে না, অবাধ্য হচ্ছে না। যে আমাকে ভালবাসবে সে তো কখনো কখনো একটু অবাধ্য হবে অভিমান-টান করবে প্রদীপ দত্ত? তাই না?

প্রদীপ দত্ত গম্ভীর হয়ে বলে—ওসব অ্যাবস্ট্র্যাক্ট জিনিস মিস্টার বোস। আমার এক্তিয়ারের বাইরে।

—তুমি কোনো কাজের নও। অনিকেত রেগে গিয়ে বলে।

প্রদীপ দত্ত একটু গুম হয়ে থেকে বলে—ঠিক আছে স্যার, আপনি যেমন চাইছেন ওরা এবার থেকে ঠিক সে রকমই বিহেভ করবে। আপনার রিকোয়্যারমেন্টস্‌গুলো বলুন, আমি টুকে রাখছি—বলে প্রদীপ দত্ত তার নোটবই বের করে গাড়ির ড্যাস বোর্ডের আলোয় লিখতে লিখতে আপন মনে বলে—রাগ, অভিমান, মাঝে মাঝে একটু-আধটু নন-অ্যাগ্রেসিভ অবাধ্যতা...আর কী বললেন স্যার?

অনিকেত হাত বাড়িয়ে নোটবইটা কেড়ে নিয়ে বলে—চুপ করো। আমি কিছু চাইছি না। আমি এখন একটু একা থাকতে চাই। আমার যদি কোনো ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্ট থাকে তো সেখানে আমাকে নিয়ে চলো।

—আছে স্যার। একটা দশতলা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস আপনার অর্ডার মতো কেনা হয়েছিল, তাতে কোনো ভাড়াটে নেই। আপনার আদেশ মতো বাড়িটার চল্লিশটা ফার্নিশড ফ্ল্যাট ফাঁকা পড়ে আছে।

দশতলার ফাঁকা কিন্তু চমৎকার সাজানো অ্যাপার্টমেন্টে স্বয়ংক্রিয় লিফটে উঠে এল অনিকেত। ক্লান্তভাবে একটা কৌচে বসে রইল ঝুম হয়ে।

কেউ কোথাও নেই, শুধু কপাটের আড়ালে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে প্রদীপ দত্ত।

—প্রদীপ দত্ত! অনিকেত ডাকে।

—বলুন স্যার! নিঃশব্দে সুপুরুষ দৈত্য ঘরে এসে দাঁড়ায়!

—ভগবান বলে কে একজন আছে না? আমি তার সঙ্গে আধ ঘন্টার ইন্টারভিউ চাই। অ্যারেঞ্জ করো।

প্রদীপ দত্ত ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করে বলে—অ্যাবস্ট্রাকশন। আমার এরিয়া নয় মিস্টার বোস। তবে—এই বলে প্রদীপ দত্ত পকেট থেকে একটা ট্যাবলেটের স্ট্রিপ বের করে বলে—একটা ট্যাবলেট খেয়ে নিন, নিজেকেই ভগবান বলে মনে হবে। সত্যি কথা বলতে কী আপনার ক্ষমতা ঈশ্বরের চেয়ে খুব কম নয়।

ট্যাবলেটটা হাতে নিয়ে চেয়ে থাকে অনিকেত, বলে—আর যখন এর নেশা কেটে যাবে, তখন?

—দেয়ার উইল বি মোর ট্যাবলেটস।

ট্যাবলেটটা ছুঁড়ে দিয়ে অনিকেত বলে—প্রদীপ দত্ত, তুমি অপদার্থ! তুমি আমার বয়স হওয়া ঠেকাতে পারোনি, তুমি এমন একটাও মানুষ বা মেয়েমানুষ জোগাড় করতে পারোনি যে আমাকে সত্যিকারের ভালবাসে, তুমি ভগবানের সঙ্গে মাত্র আধ ঘন্টার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যারেঞ্জ করতে পারোনি। নিজের কান ধরে দাঁড়াও প্রদীপ দত্ত।

প্রদীপ দত্ত দু'হাতে নিজের কান ধরে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

অনিকেত বলল—মানুষের সব চাহিদাই কেন তুমি পূরণ করতে পারো না? তোমার জানা উচিত এত ভোগ্য সামগ্রী উপভোগ করতে হলে মানুষের অনেক আয়ু চাই, অনেক ভালবাসা চাই, ফর সিকিউরিটি

তার একজন ভগবানও দরকার। তুমি সে সব দিতে পারোনি। কান ধরে ওঠবোস কর প্রদীপ দত্ত।

প্রদীপ দত্ত ওঠবোস করতে লাগল। করতেই লাগল। হাঁফিয়ে গেল না, ঘামল না, কোনো কষ্টের শব্দ করল না। ওর অনন্ত ওঠ-বোস দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে অনিকেত বলল—তোমার ক্লান্তি নেই? বিশ্রাম নেই?

—না।

—মৃত্যু?

—তাও নেই।

হা-হা করে হাসল অনিকেত, বলল—মিথ্যেবাদী। ঠিক আছে, ঐ জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ো প্রদীপ দত্ত। আমি তোমার শেষ দেখতে চাই।

প্রদীপ দত্ত খুব স্মার্ট পদক্ষেপে গিয়ে জানালার পাল্লা খুলে বিনা ভূমিকায় লাফ দিল নিচে। জানালার কাছে গিয়ে অনিকেত উঁকি মেরে দেখল, ফুটপাথে পড়ে আছে প্রদীপ দত্ত।

হা-হা করে ফের হাসল অনিকেত। ঘরের মধ্যে ফিরে এসে হুইস্কি নিয়ে বসল। সামান্য নেশা হল তার। একটু ভুলভাল হচ্ছিল। সেই বিভ্রমেই হঠাৎ ডাকল—প্রদীপ দত্ত! তারপর নিজের মনেই বলল—না, না, ও তো মরে গেছে।

কিন্তু নিঃশব্দে প্রদীপ দত্ত ঘরে এসে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল—ইয়েস মিস্টার বোস।

—তুমি মরোনি? অনিকেত অবাক।

প্রদীপ দত্ত মৃদু হেসে বলে—আই অ্যাম আনপেরিশেবল স্যার। ডেথলেস।

ক্লান্ত অনিকেত বলল—আজ আমার বয়স কত হল বলো তো?

প্রদীপ দত্ত বলল—একচল্লিশ বছর চার মাস দু দিন। আজকের দিনটা নিয়ে।

চমকে উঠে অনিকেত বলে—এই তো সেদিন বললে তিন মাস তেরো দিন। এর মধ্যে আরো উনিশ দিন বেড়ে গেল?

—উনিশটা দিন এর মধ্যে কেটে গেছে মিস্টার বোস।

—তোমার কাটেনি? তোমার বাড়েনি উনিশ দিনের বয়স?

—না। আমি অনন্ত-আয়ু। এজলেস।

—তবে আমার কেন বাড়বে প্রদীপ দত্ত?

—প্রকৃতির নিয়ম স্যার।

আচমকা হুইস্কির গ্লাসটা ছুঁড়ে মারে অনিকেত। প্রদীপ দত্তর মুখে গিয়ে সেটা ফটাস করে ভাঙে। কাঁচ ছড়িয়ে পড়ে চারধারে। একটুও কাটে না বা লাগে না ওর, রক্তপাত হয় না। প্রদীপ দত্ত নিচু হয়ে কাঁচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিতে থাকে।

বিপজ্জনক নিচু স্বরে অনিকেত বলে—স্কাউন্ড্রেল! ইউ স্কাউন্ড্রেল! বলে তড়িতে উঠে গিয়ে টেবিল থেকে কাগজকাটা একটা ছুরি তুলে নেয়। তারপর চকিতে এগিয়ে গিয়ে বারংবার প্রদীপ দত্তর পিঠে, বুকে, পেটে ছুরিটা বসিয়ে দিতে থাকে।

বিনীতভাবে প্রদীপ দত্ত অপেক্ষা করে। অনিকেত ক্লান্ত হয়ে গেলে প্রদীপ দত্ত ছুরিটা নিয়ে টেবিলে রেখে দেয় ফের। নরম স্বরে বলে—একটু ঘুমিয়ে থাকুন। টেক এভরিথিং ইজি।

ক্লান্ত অনিকেত বলে—চলে যাও প্রদীপ দত্ত, চিরদিনের মতো চলে যাও। আমি আর তোমাকে চাই না।

প্রদীপ দত্ত কেমন যেন একটু হাসে। অত্যন্ত ভদ্র গলায় বলে—গুড নাইট স্যার, টিল ইউ কল মি এগেন।

—আই ওনট কল ইউ বাস্টার্ড। গো অ্যাওয়ে। ডাই!

কিন্তু পরদিনই ঘুম ভেঙে অনিকেত ডাকে—প্রদীপ দত্ত! প্রদীপ দত্ত!

প্রদীপ দত্ত সামনে আসে। খুব যত্নে তাকে বিছানা থেকে তোলে। বাথরুমে পৌঁছে দেয়। বলে—সব কিছু ঠিক আছে স্যার।

বাথারুমের শার্শি দিয়ে অনিকেত দেখতে পায় নিচে একটা রেইন ট্রি থেকে হলুদ পাতা ঝরে যাচ্ছে। দৃশ্যটা সহ্য হয় না তার। একটা নতুন টুথপেস্টের টিউব আয়নার সামনে থেকে তুলে নেয় অনিকেত। নতুন টিউব, পেস্টে ভরা। অনিকেত কিছু না ভেবেই টিউবটা টিপে ধরে। সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পেস্ট বেরোতে থাকে। সারা বাথরুমের মেঝে জুড়ে অনিকেত পেস্ট ছড়ায়। পেস্ট দিয়েই সে মেঝেয় লেখে—আমি চাই অনন্ত আয়ু, আমি চাই অনন্ত ভালবাসা, হায়....পেস্ট ফুরিয়ে যায় এখানে। টিউবটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় অনিকেত। চিৎকার করে ডাকে—প্রদীপ দত্ত, কেন টিউবের পেস্ট ফুরোবে? আমি এমন টিউব চাই যার পেস্ট কখনো ফুরোবে না। যাও, নিয়ে এসো।

প্রদীপ দত্ত অনেকগুলো জায়ান্ট সাইজ টিউব এনে দেয়, কিন্তু সেগুলো আর ফিরেও দেখে না অনিকেত। সে বলে—প্রদীপ দত্ত তুমি কবে আমাকে ছেড়ে যাবে?

—আমি ছেড়ে যেতে পারি না মিস্টার বোস। আমাকে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত থাকতে হবে।

—আমার মৃত্যু কবে হবে প্রদীপ দত্ত?

—যথাসময়ে। অপেক্ষা করুন।

—কিন্তু আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। কোন নশ্বর মানুষ সহ্য করতে পারে এক মৃত্যুহীন মানুষকে? বলো প্রদীপ দত্ত, পারে কেউ?

—দুঃখিত মিস্টার বোস। কিন্তু আমি তো আপনাকে খুশি করার প্রাণপণ চেষ্টা করছি।

অনিকেত খুব ক্লান্তস্বরে বলল—আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। তুমি আমাকে আর খুশি করতে পারো না। আমাকে অনন্ত আয়ু দাও প্রদীপ দত্ত, অনন্ত কাম দাও, অনন্ত ক্ষুধা আর তৃষ্ণা দাও। একটা নশ্বর শরীর আর এক জীবনের আয়ু নিয়ে কী করে পৃথিবীতে ভোগ করা যাবে প্রদীপ দত্ত! দয়া করো।

চিন্তিত প্রদীপ দত্ত মৃদুস্বরে বলে—অ্যাবস্ট্র্যাক্ট মিস্টার বোস, আমি দুঃখিত।

—তবে এই মুহূর্তে আমাকে মৃত্যু দাও প্রদীপ দত্ত। আমি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে পারব না। যাও, আমার জন্য যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর ব্যবস্থা করো।

প্রদীপ দত্ত কেমন একরকম হাসে। বলে—মৃত্যু? মৃত্যুও অ্যাবস্ট্র্যাক্ট মিস্টার বোস। আমি তা দিতে পারি না। যথাসময়ে তা ঘটবে। আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

হতাশায় ভরে যায় অনিকেত। বলে—তবে যা দিয়েছো তা সব ফিরিয়ে নাও প্রদীপ দত্ত।

—লাভ কী? আপনি ইচ্ছে করলেই আবার সব ফিরে পাবেন।

—প্রদীপটা যদি নষ্ট করে ফেলি প্রদীপ দত্ত?

—ওটা নষ্ট হওয়ার নয়। প্রদীপটা আনপেরিশেবল, শক রেজিস্ট্যান্ট, করোশন প্রুফড, ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট অ্যাণ্ড গ্যারান্টিড ফর ইটারনিটি।

—যদি কাউকে দিয়ে দিই ?

প্রদীপ দত্ত একটু হেসে বলে—লাভ নেই মিস্টার বোস। তখন প্রদীপটার জন্য শোকে আপনি পাগল হয়ে যাবেন। যতক্ষণ এটা আপনার কাছে আছে, ততক্ষণ আপনি বুঝতে পারছেন না প্রদীপটাকে আপনার কী ভীষণ দরকার।

ঠিক। খুবই ঠিক কথা। অনিকেত বুঝল। বুঝে একটু শিউরে উঠল ভয়ে. অনিশ্চয়তায়। বলল—না, না, কাউকে দেবো না।

—সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

বলে কেমন একটু হাসল প্রদীপ দত্ত।

হাসিটা চেয়ে দেখল অনিকেত। তারপর হঠাৎ সেও ঠিক ঐ রকম একটু হাসল। খুব বুঝদারের হাসি। হাসতে হাসতে কখন হঠাৎ চোখে জল এসে গেল তার।

প্রদীপের দৈত্য বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল সামনে। পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায়।

ঝুমকোলতার স্নানের দৃশ্য ও লম্বোদরের ঘাটখরচ

ভূষণ একটু দূর থেকে তার বউ ঝুমকোলতাকে দেখছিল। ঝুমকো কুয়ো থেকে জল তুলছে। মাত্র পাঁচ দিনের পুরোনো বউ। কত কী দেখার আছে নতুন নতুন। ভূষণ কি কালও জানত যে, তার বউয়ের মাথার গড়নটা অনেকটা মাদ্রাজী নারকোলের মতো? এরকম গড়নের মাথা ভাল না মন্দ তা ভূষণ জানে না। সে ঝুমকোলতার যা দেখছে তাতেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই একটা মেয়েমানুষের মধ্যে যে নিত্যি নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করছে, পেয়ে যাচ্ছে গুপ্তধন, লাভ করছে কত না জ্ঞান। মাত্র পাঁচ দিনে।

ঝুমকো এই যে সাতসকালে বালতি বালতি জল তুলছে চান করবে বলে, এ ভূষণের ভাল লাগছে না। তার ইচ্ছে করছে হাত থেকে বালতি কেড়ে নিয়ে নিজেই জল তুলে দেয়। কিন্তু তা হওয়ার নয়। বাড়িভর্তি গুরুজন, আত্মীয়-কুটুম, হাজার জোড়া চোখ নজর রাখছে তাদের দিকে। রাখবেই। নতুন বিয়ের বর-বউ তো নজর দেওয়ারই জিনিস। তবু তার মধ্যেই ভূষণ নানা কায়দা কৌশল করে লুকিয়ে চুরিয়ে ঝুমকোলতাকে একটু আধটু দেখে নেয়। এই যে এখন উত্তর দিককার ঘরে ভূষণের কোনো কাজ নেই, তবু সে এসে ঢুকে পড়েছে। এ ঘর তুলসীজ্যাঠার। বুড়োমানুষ। দেশের কাজে গান্ধীবাবার অনুগত হয়ে জীবন উৎসর্গ করবেন বলে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে গিয়েছিলেন, তাই আর সংসারধর্ম করেননি। উড়নচণ্ডি হয়ে গাঁগঞ্জে ঘুরে বেড়াতেন, তকলি চরকা কাটতেন। বুড়ো বয়সে এসে আবার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু ততদিনে গুষ্টি বেড়েছে, ভাল ভাল ঘরগুলো বেহাত হয়েছে। উত্তরের এই ঘরে থাকে জ্বালানি কাঠ, খোল-ভুশির বস্তা, বীজধান, তারই একধার দিয়ে কোনও রকমে বুড়ো মানুষটার জন্য একটা চৌকি পাতা হয়েছে। আগে গুটিকয় ছাগলও থাকত। আজকাল থাকে না, তবু ঘরটায় কেমন ছাগল-ছাগল গন্ধ। কস্মিনকালেও ভূষণ এই ঘরে আসে না। কিন্তু ঝুমকোলতা চান করতে যাচ্ছে আঁচ পেয়েই ভূষণ হঠাৎ এ ঘরে এসে সেঁধিয়েছে। কারণ, এ ঘরের জানালার ফোকর দিয়ে কুয়োতলাটা ভারী পরিষ্কার

দেখা যায়। একটা লেবুগাছের আবডালও আছে, তাকে কেউ দেখতে পাবে না।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই তো আর জানালায় হামলে পড়া যায় না। জ্যাঠা কী বা মনে করবে। যদিও গান্ধীবাবার শিষ্য, চিরকুমার এবং বুড়ো, তবু সাবধানের মার নেই। ভূষণ ঘরে ঢুকেই চৌকির একধারটায় চেপে বসে বলল, জ্যাঠামশাই, শরীর-গতিক কেমন ?

তুলসীজ্যাঠা বুড়ো হলেও মজবুত গড়নের লোক। মাঠে ঘাটে ঘুরে ঘুরে শরীর পোক্তই হয়েছে। তার ওপর খাওয়ায় দাওয়ায় খুব সংযমী। নেশা ভাঙ নেই। এখনও নিজের কাপড় নিজে কাচেন, নিজের ঘর নিজে সাফ করেন, স্নানের জলও নিজেই তোলেন। কারও তোয়াক্কা রাখেন না।

বসে একখানা বই পড়ছিলেন। হিন্দী বই। মুখ তুলে বললেন, খারাপ থাকব কেন রে ? ভালই আছি। তোর খবর টবর কী ?

মাথা চুলকে ভূষণ বলে, এই আর কী, ঘাড়ে আবার বোঝা চাপল, বুঝতেই তো পারেন।

বোঝা বলে বোঝা ? এ একেবারে গন্ধমাদন। বলে তুলসী-জ্যাঠা একটু হাসলেন। তারপর বললেন, বউ তো আনলি, তা মেয়েটা লেখাপড়া জানে তো ?

ভূষণের নজর কুয়োতলায়। বলল, ওই আর কি। গাঁয়ের স্কুলে অল্প আম পড়েছে।

এঃ, স্ত্রী শিক্ষাটাই আমাদের দেশে হল না। তা একখানা বই দেবোখন, ভারতীয় নারীর ঐতিহ্য। বইখানা বউমাকে পড়াস।

ও বাবা, ওসব খটোমটো বই কি আর পড়বে ?

পড়বে। জোর করে পড়াস। পড়াটা অভ্যাসের ব্যাপার। প্রথম প্রথম পড়তে চাইবে না। তারপর রস পেলে হামলে পড়বে।

বুড়োমানুষরা এমনিতেই একটু ভ্যাজর ভ্যাজর করে, তার ওপর এ মানুষ আবার আদর্শবাদী, ভূষণ জানালাটার দিকে একটু চেপে বসে বাইরের দিকে চেয়ে উদ্বেগের সঙ্গে বলল, এঃ, লেবুগাছটায় দেখি পোকা লেগেছে।

তুলসীজ্যাঠা তাঁর হিন্দী বইখানা সাবধানে মুড়ে রাখলেন। তার-পর বললেন, যাই, হোমিওপ্যাথির বাক্সটা নিয়ে একটু মাঠেঘাটে পাক দিয়ে আসি।

সেই ভাল। বলে ভূষণ এ ঘরে থাকার ছুতো খুঁজতে হিন্দী বইখানাই খুলে বসল। বলল, ইঃ, বাবা এ যে দেখছি তুলসীদাসের রামচরিতমানস! অ্যাঁ! কতকাল ধরে বইখানা পড়ার ইচ্ছে।

তা পড় না, বসে বসে পড়।

তুলসীজ্যাঠা বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে ভূষণ অপলক নয়নে ঝুমকোকে দেখছে। হাতে রামচরিতমানস এলিয়ে আছে।

আচ্ছা, এই যে ভূষণ ঝুমকোলতাকে দেখছে, ঝুমকো কি তা টের পাচ্ছে? মোটেই না। ভূষণের তো মনে হয় এই পাঁচ দিনে একটা অচেনা মেয়েকে সে যেমন আষ্টেপৃষ্ঠে ভালবেসে ফেলেছে, তার সিকির সিকি ভাগও ঝুমকোলতা পারেনি। ভূষণের যেমন আনচান অবস্থা, চোখে-হারাই ভাব, তেমনটা ঝুমকোলতার কই? দিব্যি ঘুমোচ্ছে, খাচ্ছে, শ্বশুরবাড়ির নতুন সব চেনাদের সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারছে, ভূষণ বলে যে কেউ আছে তাই বোধ হয় সারাদিন মনে পড়ে না। এসব কথা নিয়ে কাল রাতেও হয়ে গেছে একচোট। কিন্তু যা কথায় কথায় কাঁদতে পারে মেয়েটা। ভূষণ শেষে পা অবধি ধরেছে।

কে একজন ছোকরামতো ঝুমকোর খুব কাছ ঘেঁসে এসে দাঁড়াল? অ্যাঁ! সাহস তো কম নয়। পিছন থেকে মুখটা দেখা যাচ্ছে না বটে। কে ও? ভূষণ একটু খর চোখেই তাকিয়ে রইল। নাঃ, পল্টু। ভূষণের ভাইপো। কাকিমার জল তুলতে কষ্ট হচ্ছে দেখে এগিয়ে এসেছে। ছেলেটা বড় ভাল। খুব হেসে হেসে গল্প করছে কাকিমার সঙ্গে।

ভূষণ মুখটা একটু আড়াল করল। পল্টুটা না আবার তাকে দেখে ফেলে। আবার সন্তর্পণে মুখ বার করে দেখতে গেল, আরো দুচারজন এসে জুটেছে কুয়োতলায়। পল্টু জল তুলছে। ঝুমকো গুলতানি মারছে। মুখটা আড়াল করতেই হয়। নইলে দেখে ফেলবে।

রামচরিতমানসখানা খুলে দু চার লাইন পড়ার চেষ্টা করল ভূষণ। হিন্দীটা তার ভাল আসে না। তাছাড়া রামচরিত পড়ার মতো মনের অবস্থাও নয়; মন এখন বড় উচাটন। বই রেখে বালিশের পাশে ডাঁই করে রাখা বইপত্র থেকে একটা খাতামতো জিনিস তুলে নেয় ভূষণ। খুলে দেখে, মুক্তোর মতো পরিষ্কার অক্ষরে ঝরঝরে বাঙলা লেখা।

"তিনি চলিয়াছেন, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে। পরনে সেই দরিদ্র ভারতবাসীর লজ্জা নিবারণের পক্ষে যৎসামান্য দুটি বস্ত্রখণ্ড। ভুলিলে চলিবে না, তাঁহার এই পোশাকও বড় উপযুক্ত, বড় দেশজ, বড়ই প্রতীকী। হাতে দীর্ঘ শীর্ণ যষ্টি। তাঁহার সহিত আকারে প্রকারে ওই যষ্টিটারও যেন সুদূর মিল রহিয়াছে। রস মরিয়া ওই যষ্টি যেমন ঋজু ও কঠিন হইয়াছে, জীবনের সমস্ত উপভোগ, আমোদ, আনন্দ ইত্যাদিকে ত্যাগ ও তপস্যার অনলে শুকাইয়া তিনিও ঋজু, রিক্ত, কঠিন। সেই কাঠিন্য কাহাকেও আঘাত করে না, কিন্তু সব আঘাতকেই অনমনীয় ভাবে প্রতিরোধ করে।

'বাবুরা, ধনিকেরা, গৃহীরা তাঁহাকে চিনে না। তাহারা শুধু মহাত্মা গান্ধীর জয় জোকার দিয়া ক্ষণিক আবেগ অনুভব করে মাত্র। মহাত্মাজী দেশের কাজ করিতেছেন, তিনিই দেশোদ্ধার করিবেন, আমাদের কিছু করিবার নাই, এইরূপ ধারণা লইয়া তাহারা বেশ নিশ্চিন্তে ইংরাজের গোলামি করিতেছে বা কালোবাজারিতে মুনাফা লুটিতেছে, ঘুস লইতেছে বা অন্যবিধ অপকর্ম করিয়া যাইতেছে। গান্ধীবাবা আছেন, ভাল কাজ তিনিই করিবেন।'

'মাঝে মাঝে ভাবি, তিনি এই দেশে জন্মগ্রহণ করিলেন, তবু কই দেশের তো কলঙ্ক ঘুচিল না। ইহাও কি সম্ভব যে তিনি এই দেশের বাতাসে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিলেন, তবু এই দেশের বায়ু পবিত্র হইল না? তাঁহার চরণরেণু মাখিয়াও এই দেশের মাটি ধন্য হইল না।'

ঝুমকোলতা বেড়া দিয়ে ঘেরা চানের জায়গাটায় ঢুকে আড়াল হল, কিন্তু তাতে কী? ঝুমকোর টুকটুকে লাল শাড়ি, রাঙা গামছা আর ধপধপে শায়া যে বেড়ার ওপর। তারও কি শোভা কম? তাতেই নেশা লেগে যায় যে।

উঁকি মেরে মুখটা আবার চট করে সরিয়ে নেয় ভূষণ। তার মেজো কাকিমা চাল ধুতে এসে এদিকপানে চেয়ে কী যেন দেখছে।

দেওয়ালের দিকে সরে বসল ভূষণ. এ বাড়িটা একেবারে হাট। এত লোক যে কেন যেখানে সেখানে হুটহাট আনাগোনা করে তা বোঝা মুস্কিল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ভূষণ ঘরখানা দেখছিল। লকড়ির মাচানের নিচে কুঁই কুঁই শব্দ শুনে ভূষণ উঁকি মেরে দেখল, গোটা চারেক কুকুরছানা দলা পাকিয়ে আছে। বাড়িতে কুকুরের অভাব নেই, তারই একটা এসে এ ঘরে বাচ্চা দিয়েছে। বাস্তবিক গান্ধীবাবার

শিষ্য ছাড়া বোধ হয় আর কারও পক্ষেই এ ঘরে বাস করা সম্ভব নয়! বস্তা বস্তা বীজধান, ভুশি, খোল আর রাজ্যের লকড়িতে ঘর পনেরো আনা বোঝাই। একটা বিটকেল গন্ধও থানা গেড়ে আছে। মাটির ভিতে নানা মাপের অজস্র ফুটো। লেপাপোঁছার বালাই নেই। এমন বুকচাপা দম-আটকানো ঘরে তুলসীজ্যাঠাই থাকতে পারে, যার জন্য লড়ার কেউ নেই।

একটু কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েছিল ভূষণ, সেই ফাঁকে কখন চানটি সেরে বেরিয়ে পড়েছে ঝুমকোলতা। বেরিয়ে সোজা সেজো-কাকির ঘরের ভিতর দিয়ে অন্দরমহল। তবে ভূষণ একেবারে বঞ্চিত হল না। উঠোনের তারে ভেজা শাড়ি মেলার জন্য মিনিট দুই দাঁড়িয়ে ছিল, তখন ভাল করে দেখে নিল।

এ বাড়ির অন্দরমহল হল রাক্ষসপুরী। একবার যাকে গ্রাস করে নেয় তাকে আর সহজে ছাড়ে না। এই যে ঝুমকোলতা অন্দরে ঢুকল এর মানে হল, সে সংসারের সামগ্রী হয়ে গেল। আর ভূষণের নিজস্ব জিনিস রইলো না। ফের সেই রাত দশটার পর ঝুমকোলতা আবার ভূষণের হবে। রাক্ষসপুরীর কথা কি আর সাধে মনে হয় ভূষণের।

আর তুলসীজ্যাঠার ঘরে বসে থেকে লাভ নেই। ভূষণ বেরিয়ে এসে দরজায় শিকল তুলে দিল।

বিয়ের মধ্যে যে আনন্দ আর রোমহর্ষ ছিল, তা বিয়ের আগে জানত কোন আহাম্মক? ভূষণ ভাবত, বিয়েটা একটা ব্যাপারই হবে বটে, কিন্তু তা যে এরকম ভাল, তা তার কল্পনাতেও ছিল না। যারা বিয়ে না করে থাকে, তাদের জীবনটাই বৃথা। এই যে তুলসীজ্যাঠা, কী নিয়ে যে বেঁচে আছে ভগবান জানে। মাঠেঘাটে ঘুরছে, হোমিওপ্যাথি করে বেড়াচ্ছে, আর দিনান্তে রামচরিতমানস বা গান্ধীর বই খুলে মুখ গুঁজে বসে আছে। অসুখ-বিসুখ হলে জলটুকু এগিয়েদেওয়ারও লোক নেই।

অসুখের কথায় ভূষণ হঠাৎ নিজেই চমকায়, তাই তো। কথাটা তো বড় জব্বর মনে পড়েছে। অ্যাঁ! এখন যদি তার অসুখ হয়, তাহলে ঝুমকো সুন্দরী কী করবে? অ্যাঁ! ধরো জ্বর উঠে গেল পাঁচ সাত ডিগ্রি, ভূষণ চোখ উল্টে গোঁ গোঁ করছে, ডাক্তার নাড়ি ধরে গম্ভীর মুখে বসে আছে আর ঘড়ি দেখছে, অ্যাঁ। তখন কী করবে ঝুমকো? বুকের ওপর পড়ে, 'ওগো, পায়ে পড়ি...' এই সব বলবে না? অ্যাঁ! কাণ্ডটা কী হবে তখন!

বেজায় শীত পড়েছে এবার। সকালের রোদটাও বড্ড ঢিমে। একটা মোটা খদ্দরের চাদর জড়িয়ে ভূষণ বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। বন্ধুবান্ধবরা আজকাল তাকে দেখলেই মুখ বেজার করছে। সেদিন ফণী তো বলেই ফেলল, উরে বাব্বা, তোর ঝুমকোলতার গল্প শুনতে শুনতে যে আঁত শুকিয়ে গেল বাপ।

তা ভূষণই বা করে কী? ঝুমকোলতার কথা ছাড়া তার যে আর কথা আসছে না গত তিন চার দিন। এখনো মেলা কথা বলার বাকি।

ছোলাক্ষেত বাঁয়ে রেখে হনহন করে হাঁটছে ভূষণ। পাশের গাঁ হল মুনসির চক। গোকুল থাকে। এমনিতে গোক্‌লোটা যাকে বলে গর্ভস্রাব। ধান বলতে কানি বোঝে। কিন্তু তার কাছে কথা বলে সুখ আছে। যাই বল না কেন, হাসি-হাসি মুখ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনবে, ফোড়ন কাটবে না, বিরক্ত হবে না, উঠি-উঠি করবে না, কাজ দেখাবে না। আজ গোক্‌লোকে পাকড়াও করতে হবে। পেটে ঝুমকোলতার গপ্প ভুড়ভুড়ি কাটছে। না বললেই নয়। এ গাঁয়ের বন্ধুগুলো বড্ড সেয়ানা হয়ে গেছে।

মনসাতলায় অশ্বত্থ গাছের নিচে বাঁধানো জায়গাটায় কয়েকজন বসে আছে গোমড়া মুখে। একজন তুলসীজ্যাঠা। তিনি ওষুধের বাক্স খুলে শিশি তুলে তুলে নাম দেখছেন ওষুধের।

ওরে ও ভূষণ, কোথা যাস?

ভূষণ জ্যাঠার ডাক শুনে একটু থমকায়। তারপর বলে, এই যাচ্ছিলাম একটু, কাজেই।

এদিকে যে লম্বোদর পরামানিকের হয়ে গেল। ঘাটখরচের জোগাড় নেই। একটু দেখবি বাবা?

ভূষণ একটু গরম হল। লম্বোদরের কী হল, বৃকোদরের কী হবে, দামোদরের কী হচ্ছে, এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকারটাই বা কী আছে, তাই সে বোঝে না। যে যার মতো বেঁচে থাকছে, মরে যাচ্ছে, খাবি খাচ্ছে, দুনিয়ার তাই নিয়ম। থাক, যাক, থাক, তাতে তার কী?

তবু ভূষণ দাঁড়িয়ে গেল। যত যাই হোক, এই পাগল লোকটার তো বউ নেই, জীবনের স্বাদই পায়নি, মায়া হল ভূষণের।

—কী করতে হবে জ্যাঠা?

করার অনেক আছে। চারটে ছেলেপুলে, একটা মুখ্যু বউ, ঘরে

দানাপানির জোগাড় নেই। তা সে না হয় পরে ভাবা যাবে। আগে ঘাটখরচা তো তোলা লাগে। এই এরা সব বসে আছে ওষুধের জন্যে, আমি নড়তে পারছি না। একটু গাঁয়ের ঘরে ঘরে ঘুরে খরচটা তুলে দিবি বাবা?

সে কী কথা? ঘুরব কেন? ঘাটখরচ নয় পকেট থেকেই দিয়ে দিচ্ছি।

তুলসীজ্যাঠা একগাল হাসলেন, দূর পাগল। ও বাহাদুরি কদিন? আজ লম্বোদর গেছে, কাল বিধু নস্কর যাবে, পরশু বিনোদ হাতি মরবে, কারোর ঘরে মামলোত নেই। কজনেরটা দিতে পারবি? তার চেয়ে ঘরে ঘরে ঘোরা ভাল। পাঁচজনকে সমাজ-সচেতনও করা যায়, দশের কাজে নামানো যায়। যাবি বাবা?

ভূষণ তত্ত্বতা বুঝল না। তবে একটু আঁচ করল। কথাটা খুব মন্দ নয়। একটু মাথা চুলকোলো সে। তারপর বলল, আচ্ছা দেখছি।

যা বাবা, তুই পারবি।

দোনোমনো করে ভূষণ গাঁয়ের দিকে ফিরল। কাজটা খুব শক্ত নয়। সবাই তাকে চেনে। চাইলে দেবে।

দিলও। বেলা দশটা নাগাদ শুরু করেছিল ভূষণ। সাড়ে এগারোটার মধ্যে শ আড়াই টাকা উঠে গেল। পাঁচ টাকা কম ছিল, সেটা নিজে পূরণ করে দিল।

লম্বোদর যখন মাচানে চেপে শ্মশানে রওনা দিল, তখন পড়ন্ত বেলা। চারটে ছেলেমেয়ে আর বউ কিছুটা শোকে, কিছুটা খিদেয় আর কিছুটা ভবিষ্যতের ভয়ে কাঁদছে লুটোপুটি খেয়ে।

দৃশ্যটা বেশিক্ষণ দেখতে পারল না ভূষণ। ঘরদোরের যা চেহারা, তাতে বোঝা যায়, এদের নুন পান্তা জুটলে সেদিন ভোজ।

ফেরার সময় তুলসীজ্যাঠা ছাতাটা মেলে ধরে বলল, আয় ছাতার নিচে আয়। মুখটা রাঙা হয়ে গেছে তোর।

জ্যাঠার এত কাছাকাছি কখনো হয়নি ভূষণ। আজ তার বড় জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল, কিসের আনন্দে বেঁচে আছেন আপনি? কী সুখ পেয়েছেন জীবনে?

কিন্তু কথাটা সরল না মুখে।

আনন্দেরও তো কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কে যে কী থেকে আনন্দ পায়। কখনো ঝুমকোলতার স্নানের দৃশ্যে, কখনো লম্বোদরের ঘাটখরচ জোগাড়ে।

আমেরিকা

আমেরিকায় নামবার আগে ভাল করে দাঁত মেজে নিও। কারণ তোমার দাঁতে প্রাচ্যদেশীয় বীজাণু থাকতে পারে। হাতঘড়ির সময়টাও মিলিয়ে নাও। কারণ আমেরিকায় সবকিছু ঘড়ি ধরে চলে। তোমার জুতোর তলায় রয়েছে প্রাচ্যদেশীয় ধুলো-ময়লা। রুমালে সেগুলো সাবধানে মুছে নাও। আমেরিকাকে নোংরা কোরো না। এবার প্রস্তুত হও। সিট-বেল্ট বাঁধো। সিগারেট নিভিয়ে ফেল। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা কেনেডি এয়ারপোর্টে নামছি।

এসব আমার জানাই ছিল। অনেক আগেই আমি দাঁত মেজে, হাতঘড়ি মিলিয়ে এবং জুতো পরিষ্কার করে বসে আছি। আমার পাশে বসা একটা খুনখুনে তিব্বতি বুড়ি ভাঙা হিন্দীতে বিড়বিড় করে আমাকে বলল, আমার দাঁত নেই, হাতঘড়ি নেই, রুমাল নেই! বাঁচলাম। নিচে ওই যে জঙ্গলের মতো দেখা যাচ্ছে, মস্ত মস্ত উঁচু গাছ অথচ ডালপালা নেই ওটা কী জায়গা বলো তো?

চুপ চুপ। আমি চাপা গলায় বলি, ওটাই নিউ ইয়র্ক।

নিউ ইয়র্ক! বুড়ি চোখ কপালে তুলে বলল, কিন্তু কারপেটটা দেখতে পাচ্ছি না কেন বলো তো! আমার ছেলে নিউ ইয়র্ক থেকে লিখেছিল গোটা আমেরিকাই একটা মস্ত কারপেট দিয়ে মোড়া।

আমিও শুনেছি!

শুনেছো। যাক বাঁচালে। বলে বুড়ি বিড়বিড় করতে করতে তার পোঁটলাপুটলি গোছাতে লাগল।।

প্লেন নামল। থামল। দরজা খুলে হোসটেস বলল, প্রাচ্যবাসিগণ, তোমাদের সামনে স্বর্গের দরজা খোলা। এখানে সব কিছুই অফুরন্ত। ডলার, মেয়ে, ফরেন গুডস, যাও কয়েকদিন লুটেপুটে খাওগে। ইউরোপীয়গণ, আমেরিকা তোমাদের কাছে স্বর্গ না হলেও চমৎকার এক চারণভূমি। যাও দ্বিতীয় এই স্বদেশকে বারবার আবিষ্কার করো। আমেরিকানগণ, তোমাদের কাছে আমেরিকা সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। এই সেই নরক, যেখানে মরতে তোমাদের ফিরে আসতে হয়।

আমি নামলাম। এবং নেমেই তাজ্জব হয়ে গেলাম। আমেরিকায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমেরিকা আমাকে তার কোলে তুলে নিল। আদর করে কানে কানে বলল, বাছা রে, গরিবের ঘরে-পথে ধুলো-কাদা ঘেঁটে বড় হয়েছিস। ভাল জিনিস চোখে দেখিসনি, জিবে ঠেকাসনি, ভোগ করিসনি। আয় বাছা, কদিন ভোগ-সুখ করে যা।

কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল এল। আমি গোপনে রুমালে চোখের জল মুছে নিলাম। আমেরিকায় কাঁদা বারণ। তবে আমেরিকা সম্পর্কে আমি যা যা শুনেছিলাম, তা সবই সত্যি। দেশটা আগাগোড়া মহার্ঘ কারপেটে মোড়া। সেই কারপেটের ওপর কোথাও ঘাস এবং কোথাও কংক্রিট বসানো। এক অতি উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে এখানকার আকাশকে আরও একটু বেশি নীল করা হয়েছে। প্রাচ্যের সংবাদপত্রগুলো ঠিকই বলে, আমেরিকার মাধ্যাকর্ষণে বল কিছু কম। ফুরফুর করে হাঁটা যায়, কষ্ট হয় না। এখানকার বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণও বেশি। পানীয় জল জীবাণুমুক্ত এবং ভিটামিনযুক্ত।

একশ আশি তলা উঁচু একটা হোটেলের একশ সত্তর তলার একটা ঘরে ঢুকে আমি দেখলাম, একটা লোক একটা হেলিকপটারে বসে বাইরে থেকে আমার ঘরের জানালার শার্সি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করছে!

ঘরের মধ্যেও চমৎকার ব্যবস্থা। রঙিন টি ভি, ফ্রিজ, রাজকীয় বিছানা ও সুন্দরী রমণী সবই প্রস্তুত! ব্যবহারের অপেক্ষা মাত্র।

টেলিফোন তুলে আমি প্রেসিডেনটের সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম।

একটু বাদেই টেলিফোনে মারকিন প্রেসিডেনটের গমগমে এবং আহ্লাদিত গলা পাওয়া গেল, বলো বন্ধু, বলো!

আমি এক ভারতীয় পর্যটক, মাননীয় প্রেসিডেনট।

ভারতীয়! ভারতীয়! প্রেসিডেনট একটু স্মরণ করতে সময় নিলেন। তারপর উচ্চকিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, ওঃ! ভারত! হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি। ভারত হল পৃথিবীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্র। সেখানে তাজমহল আছে। তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ মাননীয় প্রেসিডেনট। স্বাগতম ভারতীয় পর্যটক। আমাদের দেশ সর্বদাই ভারতীয় পর্যটকদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে। প্রকৃতপক্ষে আমরা সব দেশের লোককেই শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকি, যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত শ্রদ্ধার যোগ্য নয়।

আমেরিকা অতীব মহান দেশ মাননীয় প্রেসিডেনট।

ধন্যবাদ ভারতীয় পর্যটক, তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো!

না মাননীয় প্রেসিডেনট। এই হোটেলের ঘরে রঙিন টি ভি থেকে সুন্দরী রমণী সবই আছে।

চমৎকার। তুমি নিশ্চয়ই ওসব জিনিসের ব্যবহার জানো। আমি তো শুনেছি, ভারতে ট্রেন চলে এবং কোথাও কোথাও এরোপ্লেনও নামা-ওঠা করে। দিল্লিতে টেলিফোনও আছে আমি জানি। ভারত যে গত কয়েক বছরে দুর্দান্ত অগ্রগতি করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ধন্যবাদ মাননীয় প্রেসিডেনট। আমি শুনেছি গোটা আমেরিকাই কার্পেটে মোড়া। মাননীয় প্রেসিডেনট, এরকম মহান কীর্তি আর কোনো দেশের নেই।

ধন্যবাদ ভারতীয় পর্যটক। আমরা যথাসাধ্য দেশটাকে সুন্দর করার চেষ্টা করছি মাত্র। তোমার ভাল লাগলেই খুশি হবো।

মাননীয় প্রেসিডেনট আমি শুধু পর্যটন করতেই আসিনি। আমি দুজন মৃত আমেরিকান নাগরিক সম্পর্কে খোঁজ-খবরও করতে এসেছি। একজন সোনি লিস্টন, আর একজন উইলিয়াম হোলডেন।

তারা কারা?

দুজনেই বিশ্ববিখ্যাত লোক।

প্রেসিডেনট অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই বললেন, অধিকাংশ আমেরিকান নাগরিকই বিশ্ববিখ্যাত মানুষ। তাদের সকলকে মনে রাখা মুস্কিল। তবে তুমি যে কোনো জীবিত বা মৃত আমেরিকান সম্পর্কেই খোঁজ-খবর নিতে পার। কোনও বাধা নেই।

ধন্যবাদ মাননীয় প্রেসিডেনট।

তোমার সফর আনন্দময় হোক ভারতীয় পর্যটক।

টেলিফোন রেখে আমি জানালার কাছে যাই। হেলিকপটারে বসা লোকটা অখণ্ড মনোযোগে শার্সি পরিষ্কার করে যাচ্ছে। ঠোঁট থেকে ঝুলছে আধপোড়া সিগারেট।

আমি জানালার একটা শার্সি ফাঁক করে বললাম, শুভ সন্ধ্যা।

শুভ সন্ধ্যা।

আমি একজন ভারতীয় পর্যটক।

ইনডিয়ান? ইনডিয়ানদের তো আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি।

আমি রেড ইনডিয়ান নই।

খুব ভাল। রেড ইনডিয়ান হওয়াটা কাজের কথা নয়।

তোমার দেশ খুব ভাল লাগছে।

লাগারই কথা। আমিও শুনেছি আমেরিকা খুব ভাল দেশ।

এই দেশটার বৈশিষ্ট্য কী বলতে পারো?

পারি। এখানে মেলা কাঁচের শার্সি। এত শার্সি তুমি অন্য কোনও দেশে পাবে না। আমি দিনে প্রায় দু'তিন হাজার শার্সি পরিষ্কার করি।

তাহলে তোমার রোজগার ভালই?

কী যে বলো। এদেশে এখন মিলিওনেয়ারদেরই গরিব বলে ধরা হয়। এই জানালা থেকে তুমি যদি নিচের রাস্তায় এলোপাথাড়ি গুলি চালাও, তাহলে যে কটা লোক মারা পড়বে তাদের অধিকাংশই মিলি-ওনেয়ার, বিলিওনেয়ার বা ট্রিলিওনেয়ার। আমার আয় তো দিনে মোটে দু'তিন শো ডলার। তাও সকাল থেকে সন্ধে অবধি খাটতে হয়। পুরোনো হেলিকপটারটা বেচে নতুন একটা মডেল কেনার ইচ্ছে বহু দিনের, পেরে উঠছি না। তবে সুখের কথা এখানে শার্সি বাড়ছে। আরও বাড়বে।

আমেরিকায় কাচের শার্সি ছাড়া আর কী আছে?

অনেক কিছুই আছে। নায়েগ্রা প্রপাত, ডিজনিল্যানড, স্ট্যাচু অব লিবারটি।

দেখেছো?

দেখেছি। তবে ওসব হল ট্যুরিস্টদের জন্য। আসল আমেরিকাকে আবিষ্কার করতে চাও তো আমার মত হেলিকপ্টার কিনে তাতে উঠে পড়ো। কাচের শার্সি পরিষ্কার করার কাজ নাও। তখন দেখবে তোমার সামনে আসল আমেরিকার বুক ও নিতম্ব অনাবৃত হয়ে পড়ছে।

সেটা কী করে সম্ভব?

কাচ স্বচ্ছ জিনিস এবং সব ঘরেই তো পর্দা টানা থাকে না। শার্সিতে চোখ রাখলে ঘরে ঘরে আমেরিকার বিচিত্র রূপ দেখতে পাবে।

ধন্যবাদ। বলে আমি জানালা বন্ধ করে দিই।

ঘরের মেয়েটি আপনমনে আয়নার সামনে বসে সাজছিল। খুবই সুন্দরী সে। লম্বা, স্বাস্থ্যবতী। ফর্সা রঙের কথা আর কী বলব।

আমি জানালা বন্ধ করার পর সে আমার দিকে চেয়ে বলল, ভার-তীয় পর্যটক, মহিলাদের সম্বন্ধে তোমার পূর্ব ধারণা কীরকম?

খুব পরিষ্কার নয়। আচ্ছা, তোমাদের দেশের নিগ্রোদের সম্পর্কে তোমার ধারণা কী রকম?

খুব পরিষ্কার নয়। তবে শুনেছি ওরা ভীষণ দুষ্টু। মারপিট করে, রেপ করে।

করে? আমি চোখ কপালে তুলি।

হ্যাঁ, আমি রেপ জিনিসটা একদম পছন্দ করি না। সেক্স খুব ভাল। কিন্তু রেপ ভীষণ খারাপ।

আমি মাথা নেড়ে বলি, আমারও সেই মত। আমি শুনেছি গোটা আমেরিকাই একটা চমৎকার কারপেটে ঢাকা। কথাটা কি সত্যি?

নিশ্চয়ই।

তাহলে তোমাদের চাষবাস কোথায় হয়?

কেন কারপেটটা তো ভীষণ উর্বর। খুব গভীরও। আমরা কারপেটের ওপরেই চাষ করি।

বাঃ বাঃ, আমেরিকা প্রযুক্তিবিদ্যায় তো বহুদূর এগিয়ে গেছে।

বহুদূর।

কারপেটের তলায় কী আছে জানো?

না। আমরা জন্ম থেকেই কারপেটটা দেখেছি। সম্ভবত কারপেটটার তলায় আছে প্রিমিটিভ আমেরিকা। কিন্তু কথা অনেক হয়েছে। এবার এসো খানিকটা সেক্সের চর্চা করা যাক।

হবে হবে। কিন্তু আমেরিকার বৈশিষ্ট্য কী তা বলতে পারো?

পারি। আমেরিকা মানেই হচ্ছে বিছানা। এত সুন্দর নকশাদার ও নরম বিছানা তুমি কোথাও পাবে না। সুখে বা দুঃখে তুমি কেবল বিছানায় ডুবে থাকতে পারো। তুলো, ফোম রবার এবং পালকের এমন বিচিত্র ও সমানুপাতিক সংমিশ্রণ আজও পৃথিবীর কোথাও কেউ ঘটাতে পারেনি। এসো, শুয়ে দেখ।

আমি এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলি, হবে হবে। আমার আরও কিছু জানার আছে।

মদির চোখে আমার দিকে চেয়ে মেয়েটি বলে, প্রাচ্যের ভীরু পুরুষ, কেন সংকোচ? কেন দ্বিধা? দেখ ওই যে উঁচু সটান সব স্কাই-স্ক্র্যাপার এগুলো কিসের প্রতীক জানো?

না তো।

আমেরিকানরা সেক্সকে কত মর্যাদা দেয় তা বুঝতে পারবে যদি

ভাল করে ওগুলো প্রত্যক্ষ কর। তোমাদের দেশের শিবলিঙ্গ যেমন সৃষ্টির প্রতীক, আমেরিকান স্কাইস্ক্র্যাপারও তেমনি এক প্রতীক। এদেশে লজ্জার স্থান নেই। এসো এসো ···

আমি আর্তনাদ করে বলি, দাঁড়াও। আমার কয়েকটা কথা জানবার আছে।

মেয়েটা হাই তুলে বলল, কিন্তু এখন আমার একটু গরম বিছানা দরকার। আমি বরং অন্য ঘরে যাই।

মেয়েটা চলে গেলে আমি লিফটে নিচে নেমে আসি। সামনেই একটি চমৎকার পার্ক। একটি নিরিবিলি বেঞ্চিতে ভবঘুরে চেহারার একজন লোক বসে ঢুলছে। টুপিটা চোখের ওপর নামানো।

আমি তার কানে কানে বললাম, কারপেটটা একটু তুলে দেখাতে পারো?

সে কিছুমাত্র নড়ল না। শুধু ডান হাতটা বাড়িয়ে মৃদুস্বরে বলল, পাঁচ ডলার।

আমি পাঁচটা ডলার তার হাতে দিতেই বুড়ো লোকটা টুপি সরিয়ে আমার দিকে চাইল। একটা শ্বাস ফেলে উঠতে উঠতে বলল, এসো। পার্কের ওই কোনায় কারপেটটা সবচেয়ে পাতলা।

খুব বেশি মেহনত করতে হল না। পার্কের নির্দিষ্ট কোণে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে লোকটা একটা পকেট-ছুরি বের করে কুচ কুচ করে ঘাস—মাটির একটা অংশ কেটে চাড় দিয়ে কারপেটটা তুলে ফেলল, বলল, যাও।

নিচে একটা গর্ভগৃহ। ভয়ের কিছু নেই। নামবার সিঁড়িও আছে। আমি নেমে গেলাম। এত বড় গর্ভগৃহ আমি জীবনে দেখিনি। এ-মুড়ো ও-মুড়ো দেখা যায় না। একটু ঝুঁঝকো অন্ধকার ভাব। টেবিল পাতা। এক একটায় এক একজন লোক বিমর্ষভাবে বসে আছে। শব্দহীন। শুধু একটা চাপা "হায় হায়" ধ্বনি সেখানকার বদ্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। অনেকগুলো দীর্ঘশ্বাস যেন একযোগে বলছিল, একা, বড়ো একা।

খুব বেশি খুঁজতে হল না। একটা টেবিলে সোনি লিস্টন বসেছিল। মড়ার মতো ফ্যাকাসে মুখ। চোখের দৃষ্টি দীপ্তিহীন। সেই বিশাল শরীরটা কোনও ক্রমে টেবিলে ধরে নিজেকে সামলে রেখেছে।

মিস্টার লিস্টন, কিছু বলুন।

কী বলব ? একা, বড়ো একা।

মৃত্যুর সময়টা আপনার কেমন লেগেছিল ?

ওঃ বোলো না। বাড়িতে কেউ ছিল না। একা। বড়ো একা।

একা ?

একদম একা।

কেন ?

তা তো জানি না। স্ত্রী বাইরে কোথায় যেন গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। ছেলেপুলেরা কাছে থাকত না। আমি ছিলাম। আর বাড়িটা আমাকে গ্রাস করতে আসছিল। বুকে প্রচণ্ড ব্যথা। কত ডেকেছি, চেঁচিয়েছি। কেউ শুনতে পায়নি।

তারপর ?

আমি ঢলে পড়ে গেলাম। মেঝেয়। দমের জন্য আঁকুপাঁকু করছিলাম আর মানুষের মুখ দেখতে চাইছিলাম।

আপনি খুব ভাল মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। বিশ্ব চ্যামপিয়ন। কত টাকা ছিল আপনার। কত গুণমুগ্ধ। তবু একা ?

তবু একা, ওঃ বোলো না।

তারপর কী হল ?

একটা প্রেত হঠাৎ আমেরিকার বিখ্যাত কারপেটটা তুলে আমাকে বলল, ঢুকে পড়ো, ঢুকে পড়ো। আমি ঢুকে পড়লাম। এইখানে।

আমি উঠে ধীরে ধীরে খুঁজে খুঁজে উইলিয়াম হোলডেনকেও পেয়ে যাই। এই সেই চিত্তচাঞ্চল্যকর চলচ্চিত্রাভিনেতা। বিশ্বাস হয় না। হাড়গোড় বেরিয়ে পড়েছে। মুখের হনু দুটো উঁচু হয়ে আছে।

মিস্টার হোলডেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি শুধু জানতে চাই, মৃত্যুর সময় আপনি কেন একা ছিলেন ?

আমিও পাল্টা প্রশ্ন করতে চাই, মৃত্যুর সময় অধিকাংশ আমেরিকানই কেন একা থাকে ?

আমি বোকার মতো তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি মৃদু একটু হেসে বললেন, প্রতিটি আমেরিকানই একা। সঙ্গী বা আত্মীয়হীন। আমেরিকানদের কেউ থাকে না কেন বলো তো ?

আপনার কেউ ছিল না ? অত টাকা ! অত খ্যাতি ! অত মেয়েছেলে !

হোলডেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, তবু কেন উইলিয়ম হোলডেন একা মরে? কেন তার মৃত্যুর পাঁচ দিন পর তার লাশ বাড়ি থেকে বের করে পুলিশ?

সেটাই আমার প্রশ্ন।

আমারও প্রশ্ন। এখন যাও, বিরক্ত কোরো না।

আমি আবার উপরে ফিরে আসি।

আমেরিকার প্রেসিডেনটকে আবার ফোনে পেয়ে যাই আমি।

মাননীয় প্রেসিডেনট।

বলো ভারতীয় পর্যটক।

আমি এক জায়গায় কারপেটটা তুলে আমেরিকার ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলাম।

অভিনন্দন ভারতীয় পর্যটক। কী দেখলে?

অনেক কিছু। আমি জানতে চাই মাননীয় প্রেসিডেনট, কেন সোনি লিস্টন এবং উইলিয়ম হোলডেন ফাঁকা ঘরে মারা গিয়েছিল?

গিয়েছিল নাকি?

হ্যাঁ, মাননীয় প্রেসিডেনট। সংবাদপত্রে তার অকাট্য প্রমাণ আছে।

ভারতীয় পর্যটক, আমি এইমাত্র খবর পেলাম ভারত প্রযুক্তিবিদ্যায় আরও এগিয়ে গেছে। সে মোটরগাড়ি এবং লরি তৈরি করতে পারে। তুমি এ কথাটা আমাকে জানাওনি।

কিন্তু মাননীয় প্রেসিডেনট, আপনি কি দেখেছেন, অধিকাংশ আমেরিকানই বুড়ো বয়সে খুব একা হয়ে পড়ে! তাদের স্ত্রী কাছে থাকে না বা ছেড়ে চলে যায়। ছেলেমেয়েরা ভিন্ন হয়ে যায়। মৃত্যুর সময় হলে···

ভারতীয় পর্যটক, তুমি এখনও হিউস্টন দেখনি, এমপায়ার স্টেট বিল্ডিংসে ওঠোনি, লাশ ভেগাসে জুয়ার আড্ডায় যাওনি, এমন কি এখনও একটিও মারকিন মেয়েকে চুমু খাওনি! এটা কেমন কথা?

কিন্তু মাননীয় প্রেসিডেনট, একাকিত্বের কথাটা আমাকে শেষ করতে দিন। আমি আমেরিকার অভ্যন্তরে ঢুকে—

কারপেটটা আবার আমরা নতুন করে পাতব ভারতীয় পর্যটক। এবার সেটা এত সুন্দর হবে যে তার তলায় কী আছে তা আর কারও দেখতে ইচ্ছেও করবে না।

খানাতল্লাস

আসুন ইনস্পেকটর, আসুন।

বলতে কী, একটা জীবন আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করেছি। আপনি আসবেন, খানাতল্লাসিতে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যাবেন আমার সযত্নে সাজানো সংসার, আপনি এবং আপনার সেপাইদের বুটের আওয়াজে চমকে উঠবে আমার শিশু ছেলের ঘুম, আমার বৌ আর বোন কোণে লুকিয়ে কাঁপবে থরথর করে, আমার বুড়ো মা-বাপ ইষ্ট-নাম জপ করবে, আমার ভাই অকারণ গ্রেফতারের ভয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালাবে। দৃশ্যটা আমি দেখতে চেয়েছিলাম। জানিই তো ইনস্পেকটর একদিন আসবেনই তার দলবল নিয়ে। বড় উৎকণ্ঠা ছিল, বড় ভয়। এই স্থায়ী ভয় থেকে পরিত্রাণ করতে আজ আপনি এলেন। যতদূর সম্ভব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যান আমার সংসার। এর-পর আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব। সুখীও।

আপনি লম্বা লোক, মাথাটা একটু নিচু করে আসুন। আমরা কেউ লম্বা নই বলে দরজাটা খুব উঁচু করে তৈরি করা হয়নি। জানেনই তো আমরা সব সাধারণ মানুষ, বেঁটেখাটো, আমাদের বড় দরজার দরকার হয় না।

এক মিনিট ইনস্পেকটর, আমার আগফা ক্লিক ক্যামেরায় আপনার একটা ছবি তুলে নিই।

না? নিয়ম নেই? তাহলে থাক। ক্যামেরাটা নিন, নিয়ে দেখুন, এর ভিতরে লুকোনো বোমা পিস্তল বা বিস্ফোরক নেই। ক্যামেরাই। তবে ফিলম আছে কিনা বলতে পারব না। ক্যামেরাটা 'আমার' বলে উল্লেখ করলাম, না? আসলে তা নয়। এটা আমার এক মাসতুতো বোনের। সে খুব বড়লোকের বৌ ছিল। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনি-বনা ছিল না। তার স্বামীর আবার অন্য মেয়েছেলে ছিল। বিয়ের পর থেকেই আমার সেই বোন দুঃখী। বড় কান্নাকাটি করত। সেই বোনই একবার নিমন্ত্রণে এ বাড়িতে এসে ক্যামেরাটা ফেলে যায় অন্য-মনস্কতাবশত। সেই রাতে ফিরে গিয়েই টিক-কুড়ি খেয়ে আত্মহত্যা

করে। ক্যামেরাটা কেউ ফেরত নিতে আসেনি, আমরাও দিইনি। রয়ে গেছে। দিশি জিনিস, ভাল করে এর ট্রেডমার্কটা পরীক্ষা করতে পারেন। অন্তত এটা চোরাই আমদানি নয়।

আঃ, কী বিশাল চেহারা আপনার। আপনি যে রাজকর্মচারী তা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। ঠিক এরকমটাই আমি আশা করছিলাম। এরকম না হলে কি ইনস্পেকটরকে মানায়? আপনি যেমন লম্বা, তেমনি বিশাল আপনার কাঁধ, কী অসাধারণ আপনার দুটি দীর্ঘ ও সবল হাত! কী গম্ভীর আপনার পদক্ষেপ! আর কী অদ্ভুত তীব্রতা আপনার চোখে।

হ্যাঁ ইনস্পেকটর, এটাকেই বলতে পারেন আমাদের বাইরের ঘর। আপনি তো নিশ্চয়ই খবর রাখেন যে এটা আমার নিজের বাড়ি নয়? আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাড়া: একশ ত্রিশ টাকা, আর ইলেকট্রিক।

না, না, আপনি ভুল বুঝেছেন। আমরা খুব লম্বা নই বলে দরজাটা উঁচু করে তৈরি করা হয়নি—এ কথার দ্বারা আমি কিন্তু এমন ইঙ্গিত করিনি যে বাড়িটা আমার বা আমাদের তৈরি। তা নয়। এখানে আমরা অর্থে আমরা সবাই। আমরা সবাই আজকাল বেঁটে মানুষ। যেমন আমি, তেমনি এ বাড়ির মালিক, তেমনি সব বাড়ির সবাই। ঢুকবার বা বেরোবার জন্য খুব বড় দরজার দরকার হয় না আমাদের। আপনার মতো দীর্ঘকায় অতিথিও তো বড় একটা আসে না আমাদের বাড়িতে।

হ্যাঁ, এটাই বাইরের ঘর। তবু বলি, মাত্র দু'খানা ঘর বলে এ ঘরটাকে আমরা এক্সক্লুসিভ করতে পারিনি। একাধারে ঐ যে চৌকি দেখছেন, ওখানে আমার বাবা আর মা শোয়। মেঝেতে আমার বোন। না, ভাই শোওয়ার জায়গা পায় না। সে রাত্রিবেলা এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে থাকে। ভিতরের ঘরটায় আমরা স্বামী-স্ত্রী, একটা ছোট্ট ছেলে। তবু এই ঘরটাই আমাদের বাইরের ঘর, কেউ এলে ঐ যে সব তুচ্ছ চেয়ার দেখছেন, ওগুলোয় বসে, গল্প-টল্প করে। এটাকে ড্রইংরুম বলা কি অপরাধ ইনস্পেক্টর?

ফুলদানির মধ্যে কী খুঁজছেন ইনস্পেক্টর? ফুলগুলো? হা-হা। না, ওসব ফুল আমি রোজ কিনি না। কী করে কিনি বলুন? হ্যাঁ, এখনো টাটকা তাজা ও সৌরভে ভরপুর ঐ রজনীগন্ধা দেখে মোটেই ভাববেন না যে আমার রোজ ফুল কেনার পয়সা জোটে। বাড়তি

পয়সা আমার মোটেই নেই। চুপি চুপি বলি ইনস্‌পেক্টর, গতকাল আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী গেছে। না না, ওসব বিবাহ বার্ষিকী-টার্ষিকি পালন করা আমাদের হয় না। কাউকে নিমন্ত্রণ করিনি, ফালতু উপহার কিনে পয়সাও নষ্ট করিনি, কেবল মায়াবশে স্মৃতিবিভ্রমে, ভাবপ্রবণতার দরুন একডজন ফুল কিনেছি। হে মহান ইনস্‌পেক্টর, ক্ষমা করুন আমার এই হৃদয়দৌর্বল্য। না, সত্যিই আমাকে এসব মানায় না। ফুল দিয়ে কী হয়? কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। এ ফুল কেবল আমোদের বোকামির প্রতীক।

কিছু পেলেন ফুলদানির ভিতরে? না? আমিও জানতাম, কিছুই পাবেন না। ফুলগুলো ফেলে দিয়েছেন ছুঁড়ে। জল ঢেলে ফেলেছেন মেঝেয়, শূন্য ফুলদানিটা আছড়ে ফেলার জন্য হাত উদ্যত করেছেন, হে বৃহৎ, আপনাকেই এসব মানায়। চমৎকার। ফেলে দিন, লণ্ডভণ্ড করুন। আমি দেখি।

ঐ কৌটোটা? না ইনস্পেকটর, ওর মধ্যে কালো অন্ধকারে যা লুকোনো আছে তা নয় বুলেট বা বারুদ। ও হচ্ছে আমার মায়ের নামজপের মালা। দোহাই ইনস্পেকটর। বেডকভারটা তুলবেন না। ওর নিচে ছেঁড়া চাদর, তেলচিটে বালিশ।

তুললেন? হায় ঈশ্বর, আমি বরং দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকি। কী লজ্জা! ইনস্পেকটর, আপনি কি চাদর তুলে তোষকটাও দেখবেন? হায়। তবে আর লজ্জার কিছুই বাকি থাকবে না। কী করে তবে গোপন করব, ঐ প্রায় চল্লিশ বছরের পুরোনো তোষকটাকে? ওর তুলোগুলো চাপ বেঁধে থাপে থাপে স্তূপ হয়ে আছে, ছেঁড়া টিকিনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে তুলো, ওর সারা দেহে চন্দ্রদেহের মতো খানাখন্দ।

না মহান, আমি কাঁদছি না। তবে আপনি বড় নিষ্ঠুর। কেন দেখলেন ওসব?

ঐ বাক্সটা? হা হা। না, ওটা নয় বেঁটে বন্দুক বা লম্বা পিস্তল। হাসির কথা, আমার বাবা এক সময়ে বেহালা বাজাতেন। আপনি কি কখনো বেহালার বাক্স দেখেননি? না, আমরা কেউ বেহালা বাজাতে জানি না। ওটা এমনি পড়ে আছে। দেখুন, ভাল করে দেখে নিন।

ফরেন মেড? আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বটে। তবে ওটাও তো পঞ্চাশ বছর আগে বৃটিশ আমলে কেনা। তখনকার দিনে ওসব শৌখিন

জিনিস বিদেশ থেকেই আসত। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ ক্ষুরটাও। বাবা ওটা দিয়ে দাড়ি কামান। অন্য কোনো কাজে লাগে না, বিশ্বাস করুন। না, এসব চোরাই চালানের নয়, স্মাগলিঙেরও নয়।

কালো টাকা?

হে বৃহৎ, হে প্রকাণ্ড, টেবিলের টানায় রাখা ঐ সাঁইত্রিশ টাকা ষাট পয়সার কথা জিজ্ঞেস করছেন তো? না ধর্মাবতার, ওটা কালো টাকা নয়, বরং ভীষণ রকমের সাদা টাক। এত সাদা যে ওকে রক্তহীন ফ্যাকাশে টাকাও বলা যায়। মাসের আরো ছ'দিন বাকি মহাত্মন, ও টাকার আয়ু আর কতক্ষণ? সেই অন্তিম মুহূর্তের ভয়ে ওরা ফ্যাকাশে হয়ে আছে, দেখছেন না?

ঘট? আজ্ঞে হ্যাঁ, ওর মধ্যে আমার স্ত্রী খুচরো পয়সা জমান। ভাঙুন ইনসপেক্টর, ভাঙুন। আমার স্ত্রী কোনোদিন আমাকে তার মাটির ঘট ছুঁতে দেয় না। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো চালাকি চলবে না। হে সর্বশক্তিমান, আপনি ঘটটা ভেঙে দেখুন তো কত জমিয়েছে আমার বৌ!

না, না, আপনাকে কষ্ট করে ঐ দুই তিন নয়া পয়সার খুচরো গুনতে হবে না। আন্দাজ করছি দু তিন টাকার বেশি নেই। তা এই দু-তিন টাকার মধ্যে একটা কালো টাকার ছায়া আছে। এটা প্রায় চুরির টাকা। ওটা আপনি বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।

এই নিন লোহার আলমারির চাবি। হা-হা মশাই, আলমারিটা আমার কিনা জিজ্ঞেস করছেন? না মহান, এই একটিমাত্র সত্যি-কারের দামী জিনিস যা আমি বিয়েতে পেয়েছিলাম। এই স্টিলের আলমারি দিতে নারাজ হয়েছিলেন আমার গরিব শ্বশুর, তার ফলে আমার বিয়ে ভেঙে যায় আর কি। হা-হা। না, অবশেষে তিনি আলমারি দিতে রাজি হয়েছিলেন, বিয়েটাও হয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

এই আমার আর আমার স্ত্রীর ঘর। কী দেখছেন শ্রদ্ধাস্পদ? প্লিজ, প্লিজ, ঐ বাঁশের চ্যাঙারিটা দেখবেন না। দোহাই আপনার, আমাদের মতো সামান্য মানুষেরও কিছু গুপ্ত জিনিস থাকে। বিপজ্জনক নয় মহাত্মন, লজ্জাজনক। পায়ে পড়ি, দেখবেন না।

লজ্জা ইনস্পেকটর, কী লজ্জা। ঐ বাঁশের চ্যাঙারির মধ্যে থাকে কনট্রাসেপটিভ। শ্রদ্ধাস্পদ, আমি আর আমার স্ত্রী যে উপগত হই—

এটা কি লজ্জাজনক নয়? সবাই জানে, তবু কী লজ্জার। কেন দেখলেন ইনস্পেকটর? কেন দেখলেন? লজ্জায় আমি যে চোখ তুলতে পারছি না। ক্ষমা করুন মহাত্মন, আমাদের এই গোপনীয়তা-টুকুর জন্য। আপনি তো ঈশ্বরের সমতুল, আমরা মানুষ মাত্র। জানি, আপনি একটুকু ক্ষমা করবেন। গরিবের অপরাধ।

আসছি ইনস্পেকটর, এক মিনিট। না, না, আমি স্ত্রীর সঙ্গে কোনো ষড়যন্ত্র করছি না। আমি তাকে বলেছি, সে আপনার জন্য একটু চা করুক। করার দরকার নেই? যেমন আপনার আদেশ।

আলমারিতে সোনা পেয়েছেন ইনস্পেকটর? আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার অনুমান যথার্থ, ওগুলো সোনার গয়নাই বটে। মোট পাঁচ ভরি। হার, দুল, আংটি, বোতাম মিলে মোট পাঁচ ভরি। এ ছাড়া আরো কয়েক ভরি মায়ের বাক্সে, সেসব মায়ের গয়না। আমাদের বাড়িতে মোট প্রায় দশ ভরি সোনার জিনিস আছে। হ্যাঁ ইনস্পেকটর আমি অপরাধী। জানি মহাত্মন, ভারতবর্ষের শতকরা সত্তর ভাগ লোকেরই ঘরে দশ ভরি সোনা নেই। আমি সেই দুর্লভ শতকরা ত্রিশজনের একজন, যার ঘরে দশ ভরি—হ্যাঁ মহাত্মন—দশ ভরি সোনা আছে। বাজেয়াপ্ত করবেন ইনস্পেকটর? না? ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।

আমার স্ত্রীকে দেখছেন ইনস্পেকটর? দেখুন, দেখুন। ওকে বহুকাল কেউ দেখে না। চেহারা এমনিতেও দেখনসই ছিল না, এখন আরো ভেঙে গেছে। না, বয়স খুব বেশি নয়। তবু ঐরকম। খুব সাদামাটা, রোগাভোগা। রাস্তায় বেরোলে কেউ তেমন লক্ষ করে না। বহুকাল পরে আপনিই এক পরপুরুষ যিনি ওকে লক্ষ করছেন। ও বড় ভয় পেয়েছে, কাঁপছে। এমনিতে খুব কুঁদুলি, আমার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করে। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো চালাকি নয়। আপনি যে মহান, শক্তিমান ভয়ঙ্কর। আপনার সামনে আমরা আমাদের অস্তিত্ব কার্পেটের মতো পেতে দিয়েছি ধুলায়।

ইনস্পেকটর, সাবধান! আমার এক বছর বয়সের ছেলের ঘুম ভেঙেছে। ঐ প্রচণ্ড হামা দিয়ে আসছে আপনার দিকে। কী সাহস! আপনার ভয়ঙ্কর স্তম্ভের মতো জানু ধরে ঐ ও উঠে দাঁড়াল। ইনস্পেকটর, ও যে আপনার কোমরের খাপে ভরা রিভলভারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে! ক্ষমা করুন, ইনস্পেকটর, ক্ষমা করুন। এ সাহস ওকে মানায় না। ন্যালা-ভোলা ছেলে। ক্ষমা করুন।

করেছেন? বাঁচা গেল।

না শ্রদ্ধাস্পদ, ঐ চিঠির বাণ্ডিলটা কোনো গুপ্ত কাগজপত্র নয়। তবে গোপনীয় বটে। বাচ্চা হতে আমার স্ত্রী কিছুকাল বাপের বাড়ি গিয়েছিল। তখন লিখেছিল। দেখবেন? হা-হা। দেখুন, আপনার কাছে লজ্জা কী? না দাদা, না। চিঠিতে যা লেখা আছে তা হল আবেগের কথা, বিশ্বাসের কথা, কিন্তু সত্যিই কি তাই? যেমন ধরুন এই লাইনটা—তোমাকেই যেন জন্ম-জন্মান্তরে স্বামী পাই—এ কথাটা কি সত্যি হতে পারে? পাগল। আমি তো ভেবেই পাই না, আমার মতো এত সাদামাটা অসফল লোককে আমার স্ত্রী বার বার কেন স্বামী হিসেবে চাইবে! এ তো যুক্তিতে আসে না শ্রদ্ধাস্পদ! ও সবই বানানো কথা। বলতে হয় বলে বলা, লিখবার রেওয়াজ আছে বলে লেখা। তবে, আমি মাঝে মাঝে বের করে পড়ি। বেশ লাগে। মনে হয়, সত্যিই বুঝি।

হ্যাঁ, এই যুবতী মেয়েটাই আমার বোন। না, সুন্দরী নয়। কোত্থেকে সুন্দরী হবে? সুন্দরের ঘরেই সুন্দর জন্মায়। আমরা অতি সাধারণ। তাই ও সুন্দরী নয় বটে। তবে যুবতী। ইচ্ছে হলে আপনি একটু তাকিয়ে থাকুন ওর দিকে। ও ধন্য হোক।

কিছু কি পেলেন শ্রদ্ধাস্পদ? আপনার ভ্রূ কোঁচকানো, মুখশ্রী গম্ভীর এবং চিন্তান্বিত। কিন্তু কী পেলেন মহান? ঐ তো ভাঙা ঘটের মাটির চাড়া ছড়িয়ে আছে খুচরো পয়সার সঙ্গে। ঐ পড়ে আছে ফুল, জল আর ফুলদানি। বিছানা ওলটানো বলে, বাক্স আলমারি খোলা বলে আমাদের সব ঢেকে রাখা ছেঁড়া আর ময়লা বেরিয়ে পড়েছে। প্রকট হয়েছে আমাদের তুচ্ছতা। তবু বলুন, কী পেলেন অবশেষে? কোন জিনিস বাজেয়াপ্ত করবেন ইনস্পেকটর?

আমার বুড়ো মা-বাবার ঘোলা চোখের মধ্যে তাকিয়ে কী খুঁজছেন আপনি? কী আছে ওখানে? কী খুঁজছেন আমার স্ত্রী আর বোনের চোখে? ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে যাচ্ছে যে? আমার ছেলের চোখেই বা কী আছে শ্রদ্ধাস্পদ? আমার চোখেও? বলুন ইনস্পেকটর। বলুন।

আপনি ঘন শ্বাস ফেলে আপন মনে বললেন—পেয়েছি। শুনে আমার বুকের ভিতরটা কুয়োর মত ফাঁকা হয়ে গেল। দোহাই, আমাকে আর রহস্যের মধ্যে রাখবেন না।

পেয়েছেন? ও হরি ও তো সকলেরই থাকে শ্রদ্ধাস্পদ। আপনি পেয়েছেন আমাদের চোখের মধ্যে লুকিয়ে রাখা স্বপ্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা। শ্রদ্ধাস্পদ, আমাদের যে আর কিছু নেই। এ সবই অবশ্য অবান্তর, বাজে জিনিস। এ সব তো বাজেয়াপ্ত করার উপযুক্তও নয়।

ইনস্পেকটর, ইনস্পেকটর, হে শ্রদ্ধাস্পদ, সর্বশক্তিমান, আমাদের এটুকু কেড়ে নেবেন না। আমাদের আর সব নিয়ে যান, বাজেয়াপ্ত করুন। আমাদের ভিখারির পোশাকে বের করে দিন রাস্তায়। দোহাই, আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের ওটুকু বাজেয়াপ্ত করবেন না। ইনস্পেকটর, ইনস্পেকটর....

গঞ্জের মানুষ

রাজা ফকিরচাঁদের ঢিবির ওপর দিনটা শেষ হয়ে গেল। একটা একা শিরিষ গাছ সিকি মাইল লম্বা ছায়া ফেলেছিল। সেই ছায়াটাকে গিলে ফেলল আঁধার রাতের বিশাল পাখির ছায়া। ফকিরচাঁদের সাত ঘড়া মোহর আর বিস্তর সোনাদানা, হীরে-জহরত সব ঐ ঢিবির ভিতরে পোঁতা আছে। আর আছে ফকিরচাঁদের আস্ত বসতবাড়িটা। ঢিবির ওপাশ দিয়ে রেল লাইন, এপাশ দিয়ে রাস্তা। পাথরকুচি ছড়ানো, গাছ-গাছালির ছায়ায় ভরা। এখন একটু অন্ধকার মতো হয়ে এসেছে, শীতের থম-ধরা বিকেলে একটু ধোঁয়াটে মতো চারধার। রাস্তার পাথর-কুচিতে চটি ঘসটানোর শব্দ উঠছে। রবারের হাওয়াই চটি, এ পর্যন্ত সাতবার ছিঁড়েছে। তবু ফেলে দেয়নি নদীয়াকুমার।

তো এই সন্ধের ঝোঁকে আলো-আঁধারে নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায় তা ঠাহর করা মুশকিল। ভেলুরামের চোখে ছানি আসছে। নাতি খেলারাম বীরপাড়া গেছে তাগাদায়। সে এখনো ফেরেনি দেখে চৌপথিতে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে দেখে এল ভেলু। বীরপাড়ার একটা বাস এসে ছেড়ে গেল। এ গাড়িতেও আসেনি। আরো খানিক দাঁড়িয়ে থাকলে হত। নাতিটার জন্য বড্ড চিন্তাভাবনা তার। কিন্তু ভেলুরাম দোকান ছেড়ে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে ভরসা পায় না। তার ছেলে শোভারাম চোর-চোট্টা বদমাশ হয়ে গেছে। এক নম্বরের হেক্কোড়। নেশাভাঙ আর আউরাত নিয়ে কারবার করে। বহুকাল আগে শোভা-রামের বউ পালিয়ে গেছে। ভেলু কেবল নাতিটাকে রেখে শোভারামকেও ঘরের বার করেছে। কিন্তু ছেলে মহা হেক্কোড়, দুনিয়ায় কাউকে ভয় খায় না। দরকার পড়লেই এসে ভেলুর দোকানে হামলা করে মালকড়ি ঝেঁকে নিয়ে যায়। তাই চৌপথি থেকে পা চালিয়ে ফিরছিল ভেলু। রবারের চটির আওয়াজে দাঁড়িয়ে গেল।

নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায়? মুশকিল হল, নদীয়ার বউ আজকাল মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে, পিরান গায়ে দেয়, চুলও ছেঁটে ফেলেছে। কে বলবে মেয়েমানুষ? হাতে চুড়ি-বালা, সিঁথের সিঁদুর কিছু নেই। রাতবিরেতে লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার ধারণা হয়েছে

যে, সে পুরুষমানুষ, আর কালীসাধক। অবশ্য কালীর ভরও হয় তার ওপর। শুধু ভেলু কেন, গঞ্জে সবাই নদীয়ার বউকে ভয় খায়। নদীয়া নিজেও।

ভেলু শেষবেলার আকাশের খয়াটে আলোকটুকুও চোখে সহ্য করতে পারে না। চোখে হাত আড়াল দিয়ে দেখে বুঝে ভয়ে ভয়ে বলে—কে নদীয়া নাকি?

—হয়। নদীয়া উত্তর দিল।

—কোন বাগে যাচ্ছো?

—বাজারের দিকেই।

—চলো, এক সঙ্গে যাই।

—চলো।

দুজনে এক সঙ্গে হাঁটে। ফেলুরামের নাগরা জুতোর ঠনাঠন্ শব্দ হচ্ছে ফ্যাসফ্যাস করছে নদীয়ার চটি। ভারী দুঃখী মানুষ এই নদীয়া। বউ যদি পুরুষছেলে হয়ে যায় তো পুরুষমানুষের দুঃখ ঝুড়িভরা। কিন্তু ঐ সাত জায়গায় ডিম-সুতোর বাঁধনওলা হাওয়াই চটি দেখে যদি কেউ নদীয়ার দুঃখ বুঝবার চেষ্টা করে তো সে আহাম্মক। নদীয়ার দুঃখ ঐ চটি জুতোয় নয় মোটেই। দু'দুটো মন্দ হালুইকর নদীয়ার শ্রীশ্রী-সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে দু'বেলা খাটে। গঞ্জে বলতে গেলে ঐ একটাই মিষ্টির দোকান। আরো কয়েকটা নদীয়ার ভাত মারবার জন্য গজিয়েছে বটে, তবু নদীয়ার বিক্রিবাটাই সবচেয়ে বেশি। দোষের মধ্যে লোকটা কৃপণ। জামাটা জুতোটা কিনবে না, পকেটে পয়সা নিয়ে বেরোবে না। চটি ছিঁড়লে সেলাই করে পরবে। বউ কি সাধে পুরুষ সাজে!

যে যার নিজের জ্বালায় মরে। নদীয়া যেতে যেতে কাঁদুনি গাইতে লাগল—সামনের অমাবস্যায় আমার বাড়িতে মচ্ছব লাগবে, বুঝেছো? আমার বউ নিজের হাতে পাঁঠা কাটবে। শুনেছো কখনো মেয়েছেলে পাঁঠা কাটে?

দেহাতি ভেলুরামের তিন পুরুষের বাস এই গঞ্জে। সে পুরো বাঙালী হয়ে গেছে, তবু মাঝে মাঝে অভ্যাস রাখার জন্য সে দু' চারটে হিন্দী কথা ভেজাল দিয়ে নির্ভুল বাংলা বলে। যেমন এখন বলল—নদীয়া ভাই, আউরাত তোমার কোথায়? ও তো ব্যাটাছেলে হয়ে গেছে। সোচো মত্।

—তুমি তো বলবেই। আমি মরি স্বখাত সলিলে, তোমরা মাগনার মজা দেখছো।

ভেলুরাম নাগরার শব্দে যথেষ্ট পৌরুষ ফুটিয়ে বলল—ও মেয়েছেলেকে সোজা রাখতে হলে চার জুতি লাগাতে হয়।

বলে থেমে গিয়ে নিজের একখানা পা তুলে পায়ের নাগরা নদীয়াকুমারকে দেখিয়ে বলল—এইসন জুতি চাই। কিন্তু তুমি জুতি লাগাবে কি, তোমার তো একজোড়া ভাল জুতিই নেই। ঐরকম কুত্তার কানের মতো লটরপটর হওয়াই চটি দিয়ে কি জুতো মারা যায়।

—রাখো রাখো! নদীয়া ধমকে ওঠে—শোভারামের মা যখন নোড়া তুলে তাড়া করেছিল তখন তো বাপু ন্যাজ দেখিয়েছিলে, বুড়ো ভাম কোথাকার!

ভেলুরাম খুব হাসে। শোভারামের মা এখন আর বেঁচে নেই। নোড়া নিয়ে তাড়া করার সেই সুখস্মৃতিতে ভারী আহলাদ আসে মনে। এত আহলাদ যে চোখে জল এসে যায় ভেলুরামের।

আনাচে-কানাচে শোভারাম কুকুর-বেড়ালের মতো ঘুরঘুর করে। এমন অবস্থা ছিল না যখন মা গন্ধেশ্বরী জীবিত ছিল। তখনো বাপটা খড়মটা হুড়কোটা দিয়ে পেটাত বটে, কিন্তু তবু সংসারের বার করতে সাহস পেত না। মা গন্ধেশ্বরীকে ভূত-প্রেত পর্যন্ত ভয় পেত, কাবুলিওয়ালা কি দারোগা পুলিসকেও গ্রাহ্য করত না গন্ধেশ্বরী। ভেলুরাম তো সেই তুলনায় ছারপোকা। সেই গন্ধেশ্বরী ছিল শোভারামের সহায়। তখন শোভারামের মনখানা সব সময়ে এই গান গাইত—লুট পড়েছে, লুটের বাহার, লুটে নে রে তোরা। তাই বটে। বাপ ভেলুরামের পাইকারি মসলাপাতি, মনোহারি জিনিস, পাট, তামাকপাতা, তেলের বীজ ইত্যাদির কারবার থেকে সে মনের আনন্দে লুট করত। বখা ছেলেদের সঙ্গে বিড়ি খেতে শিখেছিল ইস্কুলের প্রথম দিকটায়। ক্লাস থ্রিতে উঠলে লেখাপড়া সাঙ্গ হল। মাস্টাররা মারে বলে মা গন্ধেশ্বরী ইস্কুল থেকে ছাড়ান করাল। বাপের সঙ্গে কিছুদিন কারবার বুঝবার চেষ্টায় লেগেছিল। ভাল লাগত না। বাপটা পারেও বটে। দু' পয়সা চার পয়সার হিসেব নিয়ে পর্যন্ত মাথা গরম করত। শোভারামের এ সব পোশায় না। বয়সকালে বউকে গাওনা করে দেহাত থেকে আনাল মা। কিন্তু সে বউয়েরও কী বা ছিল। শোভারাম ইতিমধ্যে বখাটেদের

সঙ্গে ভিড়ে বিস্তর মেয়েমানুষের স্বাদ সংগ্রহ করেছে। দেহাতি মেয়ে বড্ড নোনতা। ভারী ঝাঁঝ তাদের হাবেভাবে। সেটা অপছন্দ ছিল না শোভারামের। কিন্তু বউয়েরও তো পছন্দ বলে কিছু আছে! শোভারাম নেশার ঘোরে পড়ে গেছে, গাঁজা ভাঙ তো আছেই, বোতলের নেশাও ধরে ফেলেছে কবে। মেয়েমানুষটা টিকটিক করত। খেলারাম হওয়ার পর থেকেই বাড়িতে দাঙ্গাহাঙ্গামার উপক্রম। মা গন্ধেশ্বরী তখনো সহায়। ছেলের বউয়ের তেজ দেখে উদুখলের কোঁৎকাটা দিয়ে আচ্ছাসে ঝেড়ে দিল। সেই পেটানো দেখে শোভারাম মুগ্ধ। মায়ের পায়ের ধুলো জিভে ঠেকিয়েছিল সেদিন। বছরখানেকের খেলারামকে ফেলে বউ ভেগে গেল ছ'মাস পর। বাপ ভেলু অবশ্য বরাবরই শোভার বিপক্ষে। তক্কে তক্কে ছিল, কবে গন্ধেশ্বরী মরে। সেই ইচ্ছা পূরণ করে শোভারামকে জগৎসংসারে একেবারে দিগদারির দরিয়ায় ছেড়ে, গেল বছর মা গন্ধেশ্বরী সধবা মরল। গন্ধেশ্বরীর শ্রাদ্ধের দিন পার হতে না হতেই ভেলুরাম মহা হাঙ্গামা বাধায়। শোভারাম কিছু প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু বাপ ভেলুরাম মহকুমায় গিয়ে এস, ডি, ও সাহেবের কাছে পর্যন্ত ছেলের বিরুদ্ধে দরবার করে। লজ্জায়-ঘেন্নায় শোভারাম গৃহত্যাগ করে।

কিন্তু ঘর ছাড়লেই কী! তিরপাইয়ের বস্তিতে জগনের ঘরে একরকম আদরেই আছে শোভারাম। কিন্তু সে আদরে তো মালকড়ি আসে না। নেশাভাঙ আর কাঁহাতক ভিক্ষেসিক্ষে করে চলে! কাজবাজ বলতে কিছু নেই, রোজগারপাতি ঢুঢু, চুরি-চামারিও বড় সহজ নয়। মহকুমার সদরে গিয়ে অনেক ঘুর ঘুর করেছে সে, কেউ কাজ দেয় না। তিন চার বাড়িতে চাকর খেটেছিল, চুরি করে মারধর খেয়ে পালিয়ে এসেছে, পুলিসেও খোঁজখবর করছে। বড় অব্যবস্থা চারদিকে। চুরির লাইনে পাকাপাকিভাবে ঢুকে পড়ার বাসনা ছিল। কিন্তু নেশা-ভাঙ করে শরীরে আর রস নেই, হাতটাত কাঁপে, বুক ধড়ফড় করে, মাথা গুলিয়ে যায়। মদনা চোরকে দেখে বুঝেছে যে চুরিও বড় সহজ কাজ নয়! সংযম চাই, ত্যাগ চাই, আত্মবিশ্বাস আর বুদ্ধি চাই। মদনা রোজ সকালে ব্যায়াম করে, ঘোড়ার মতো ছোলা খায়, নেশাটেশাও বুঝে-সমঝে করে। তা ছাড়া সে নানান মন্ত্র জানে। ভূতপ্রেত তাড়ানোর মন্ত্র, কুকুরের মুখবন্ধন, ঘুমপাড়ানি মন্ত্র। মদনা যে আজ বড় চোর হয়েছে সেও মাগনা নয়। যে দিকেই বড় হতে চাও কিছু গুণ থাকাই লাগবে। শোভারামের কিছু নেই।

তাই শেষ পর্যন্ত ফের ভেলুরামের গদিতেই তাকে মাঝে মাঝে চড়াও হতে হয়। কাকুতি-মিনতিতে আজকাল কাজ হয় না, চোখ রাঙালেও না। ভেলুরাম তার ধাত বুঝে গেছে। খেলারামও বাপকে দূর-দূর করে। একটা বিলিতি কুত্তা রেখেছে, সেইটেকে লেলিয়ে দেয়। তবু দু' পাঁচ টাকা ঐ বাপ কি ছেলেই ছুঁড়ে দেয় শোভারামকে আজও। সেই অপমানের পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে আসে শোভারাম। চোখে জল আসে। তারই বাপ, তারই ছেলে, পয়সাও হক্কের, তবু ভিক্ষে করে আনতে হয়।

আজও গদির চারধারে ঘুরঘুর করে বাতাস শুঁকছিল শোভারাম। মসলাপাতির একটা ঝাঁঝালো গন্ধ এখানে। বাজারের পিছন সারির দোকান আর গুদামের জায়গাটা খুব নির্জন। খেলারামের কুকুরটা কাঠের দোতলার বারান্দা থেকে তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচাচ্ছে। শোভারাম মুখ তুলে কুকুরটাকে দেখল। ভীষণ কুকুর। বলল— কুত্তার বাচ্চা কোথাকার!

গদিতে খেলা বা ভেলু কেউ নেই। শুধু বুড়ো কর্মচারী বসে হিসেবের লাল খাতা খুলে শক্ত যোগ অঙ্ক কষছে। দু'চারজন খদ্দের মশা তাড়াচ্ছে। আর খেলারামের মাস্টার শ্রীপতি কর্মকার বসে আছে উদাসভাবে। শ্রীপতি মাস্টার লোকটি বড় ভাল। সারাদিন বসে কী যেন ভাবে। লোকে বলে, গঞ্জে শ্রীপতির মতো এত লেখাপড়া জানা লোক আর নেই। কিন্তু লেখাপড়া শিখে যে জীবনে কিছু হয় না, ঐ শ্রীপতি মাস্টারই তার প্রমাণ। মাইনর স্কুলে সামান্য বেতনের মাস্টারি করে, আর গোমুখ্যু ভেলুরামের নাতি, গজমুখ্যু শোভারামের ছেলে আকাটমুখ্যু খেলারামকে রোজ সন্ধেবেলা দু'ঘণ্টা পড়িয়ে মাস-কাবারে বুঝি পঞ্চাশ টাকা পায়। আর ঐ দু' ঘণ্টায় ভেলুরাম গদিতে বসে না হোক শতখানেক টাকা নাফা রোজ ঘরে তুলছে।

—রাম রাম মাস্টারজী। বলে শোভারাম গদির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভাবখানা এমন যে তারই গদি, রোজই সে এখানে যাতায়াত করে। কর্মচারীটা একবার খুব গম্ভীর করে তাকাল। হাতের কাছেই ক্যাশবাক্স, কিন্তু ওতে কিছু নেই, শোভা জানে। থাকলেও ক্যাশবাক্স তালা-দেওয়া, আসল মালকড়ি লম্বা গেঁজের মধ্যে ভেলু-রামের কোমরে প্যাঁচানো থাকে।

শ্রীপতি মাস্টার চিনতে পারল না, অন্যমনস্ক মানুষ। চুলগুলো

সব উলোঝুলো, গায়ে ইস্ত্রি-ছাড়া জামা, ময়লা ধুতি। উদাস চোখে চেয়ে বলল—কোন হ্যায় আপ্?

শ্রীপতি দারুণ হিন্দী বলে। প্রথম দিন খেলারামকে পড়াতে এসে সে বড় বিপদে ফেলেছিল ভেলুরামকে। খটাখট উর্দু মেশানো চোস্ত হিন্দীতে কথা বলে যাচ্ছে, ভেলু হাঁ করে চেয়ে আছে, কিছু বুঝতে পারছে না। তিন পুরুষ বাংলাদেশে থেকে আর বাঙালীর সঙ্গে কারবার করে করে হিন্দী-মিন্দি ভুলে গেছে কবে! উত্তরপ্রদেশে সেই কবে দেশ ছিল। মা গন্ধেশ্বরী কিছু কিছু বলতে পারত। খেলারাম এখন ইস্কুলে হিন্দী শেখে।

শ্রীপতির হিন্দী শুনে ভয় খেয়ে শোভারাম বলে—আমি খেলারামের বাপ মাস্টারজী। আমার কথা ভুলে গেলেন আপনি?

—ও। বলে বিরস মুখে বসে থাকে শ্রীপতি। গঞ্জে থেকে তার জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। এমন কি সে যে এত ভাল হিন্দী জানে সেটুকু পর্যন্ত অভ্যাস রাখতে পারছে না, এমন লোকই নেই যার সঙ্গে দুটো হিন্দী বলবে। আর যা সব জ্ঞান আছে তার, সেগুলো তো গেলই চর্চার অভাবে। গবেট খেলারাম এমনই ছাত্র যে বাঁ বলতে ডান বোঝে। পড়তে বসে দশবার উঠে গিয়ে দোকানদারি করে আসছে। প্রতি ক্লাসে একবার দু'বার ঠেক খেয়ে ক্লাস নাইনে উঠেছে। এর পরের চড়াই ঠেলে পার করা খুবই মুশকিল। তবু তার দাদু ভেলুরামের বড় ইচ্ছে যে খেলারাম বি-কম পাস করে হিসেবের ব্যাপারটায় পাকা হয়ে আসুক। তাই শ্রীপতি মাঝে মাঝে ঠেস দিয়ে বলে, বুদ্ধি কম হলে কি আর বি-কম হওয়া যায়?

শোভারাম খুব বিনীতভাবে প্রশ্ন করে—একা বসে আছেন, খেলাটা গেল কোথায়?

শ্রীপতি মুখটাকে খাট্টা করে বলে—কোথায় আর যাবে, বাকি বকেয়ার তাগাদায় বীরপাড়া না কোথায় গেছে শুনছি। আমার আটটা পর্যন্ত টাইম, ততক্ষণ বসে উঠে যাবো।

—সে তো ঠিক কথা! বলে শোভারাম একটু বাপগিরি ফলিয়ে বলে—খেলারামটা লেখাপড়ায় কেমন মাস্টারজী?

শ্রীপতি বলে—কিছু হবে না।

শোভারাম শুনে খুশিই হয়। বলে—আমিও তাই বলি। ঝুটমুট ওর পিছনে পয়সা গচ্চা যাচ্ছে।

বলতে বলতে শোভারাম চারদিকে নজর করছে। হাতের কাছে সরাবার মতো কিছু নেই। শোভা তাই হাতের কাছে ক্যাশ বাক্সটায় একটু তেরে কেটে তাক বাজায় অন্যমনে। বয়স কম হল না তার। পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। খেলারামেরও না হোক বাইশ-চব্বিশ হবে! এত বয়স পর্যন্ত এই গদিতেই কেটেছে তার। কাঠের দোতলার ওপর সে জন্মেছিল বিন্দি ধাইয়ের হাতে। এই বাজারের ধুলোয় পড়ে বড় হয়েছে। ভিতরবাগে একটা উঠোন আছে, সেখানে মা গন্ধেশ্বরী আচার রোদে দিত, পাঁপড় শুকিয়ে নিত। কিন্তু এখন সে এই গদিতে বাইরের লোক। বাপ যে এত অনাত্মীয় হতে পারে কে জানত।

সন্ধে পার হয়ে গেল। ইঁটখোলার দিক থেকে পশ্চিমা গানের আওয়াজ আসছে। সাঁঝবাজারে কিছু লোক নদীর মাছ কিনতে এসে বকবক করছে। তাছাড়া বাজারটা এখন বেশ চুপচাপ। শীতটা সদ্য এসেছে, এবার জোর শীত পড়বে মনে হয়। গায়ের মোটা সুতির চাদরটা খুলে আবার ভাল করে জড়ায় শোভারাম। এইসব গায়ের বস্ত্র দিয়ে শীত আটকানোয় সে বিশ্বাসী নয়। শীত ঝেড়ে ফেলতে এক নম্বরির চাপানের মতো আর কী আছে! না হয় একটা ছিলিম বোমভোলানাথ বলে টেনে বসে থাকো, মা গন্ধেশ্বরীর হাতে ঠেঙা খেয়ে চোর বেড়াল লাফিয়ে পালাত, শীতও তেমনি পালাবে।

বাপ ভেলুরামের নাগরা জুতোর শব্দ আধ মাইল দূর থেকে শোনা যায়। সেটা শুনতে পেয়েই উঠে পড়ল শোভারাম। টালুমালু অসহায় চোখে চারদিকে আর একবার তাকায়। কিছুই হাতাবার নেই। পাথরপোতার এক ব্যাপারি বাংলা সাবান কিনতে এসে বসে ঢুলছিল। জুতো জোড়া ছেড়ে রেখেছে বেঞ্চির সামনে। বেশ জুতো—ঝা চকচকে নতুন, না হোক ত্রিশ টাকা জোড়া হবে।

শোভারাম নিজের টায়ারের চটি আর পায়ে দিল না। দেখি না দেখি না ভাব করে ব্যাপারির জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এল। একটা কাঠের বড় মুখ খোলা বাক্সে বিস্তর নোনতা বিস্কুটভরা প্লাস্টিকের প্যাকেট। যাওয়ার সময়ে হাতছিপ্পু করে দু' প্যাকেট তুলে চাদরের তলায় ভরে ফেলল। সেই সঙ্গে এক মুঠো তেজপাতা আর এক গোলা বাংলা সাবানও। যা পাওয়া যায়।

বাপ ভেলুরামের সঙ্গে মুখোমুখি পড়ে যেত শোভা। কিন্তু একটুর জন্য বেঁচে গেল। ভেলু এখন সব্জিবাজারের কাছে দাঁড়িয়ে

নদীয়ার সঙ্গে কথা বলছে। জবুথবু কয়েকজন সব্‌জিওয়ালা টেমি জ্বেলে নিঝুম বসে আছে আলু-কপি-বেগুন সাজিয়ে। ব্যবসা মানেই হচ্ছে বসে থাকা। তাই শোভারাম মানুষের ব্যবসা করা দু' চোক্ষে দেখতে পারে না। নতুন জুতো জোড়া বেশ টাইট মারছে। কয়েক কদম হাঁটলেই ফোসকা পড়ে যাবে। শোভারাম খুঁড়িয়ে মেছোবাজারের দিকে অন্ধকারে সরে যায়।

চটিজোড়া এই নিয়ে আটবার ছিঁড়ল। বাজারের ও-প্রান্তে দোকান, এখনো বেশ খানিকটা দূর। নদীয়া ডানপায়ের চটিটা তুলে সব্‌জিওয়ালার টেমির আলোয় দেখল। নতুন করে ছেঁড়েনি, রবারের নলি দুটো যেখানে ডিমসুতোয় বাঁধা ছিল সেই বাঁধনটাই ছিঁড়েছে। সুতোওয়ালারা আজকাল চোরের হদ্দ, এমন সব পচা সুতো ছেড়েছে বাজারে যে, বাতাসের ভর সয় না। চটিটা আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নদীয়া। নাঃ, গোড়ালিটা ক্ষয়ে গেছে আদ্দেক। আর এক জোড়া না কিনলেই নয়। জুতো চটির যা দাম হয়েছে আজকাল! চটিটা ছেঁড়ায় ফের নিজেকে ভারী দুঃখী মানুষ বলে মনে হয় নদীয়ার। এ গঞ্জে তার মতো দুঃখী আর কে?

চামার সীতারামের দোকানটা সব্‌জিবাজারের শেষে। দোকান না বলে সেটাকে গর্ত বলাই ভাল। একধারে লোহার আড়ত, অন্য ধারে ভুশি মালের দোকান। তার মাঝখানে বারান্দার নিচের দিকে একটা গর্ত মতো জায়গায় সীতারাম মুচির দোকান ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পুরোনো। ছোট চৌখুপিটার মধ্যে চারধারে কেবল জুতো আর জুতো। সবই পুরোনো জুতো। সামনের দিকে বাহার করার জন্য আবার জুতোর সারি ঝুলিয়ে রেখেছে সীতুয়া। তার বউ নেই, বালবাচ্চার কথাও ওঠে না। আছে কেবল পুরোনো জুতো। সেই জুতোর মধ্যেই সে দিনরাত শোয়-বসে, সেখানেই রান্না করে খায়। পেল্লায় বুড়ো হয়ে গেছে সীতুয়া, তবু এখনো গর্তের ভিতর থেকে শকুনের মতো তাকিয়ে খদ্দেরদের দেখে নেয়।

ছেঁড়া চটিটা নিয়ে দোকানের মধ্যে কুঁজো হয়ে মুখ বাড়াতে গিয়ে কপালে ঝুলন্ত কার-না-কার পুরোনো জুতোর একটা ধাক্কা খেল নদীয়া। এমন কপালে জুতোই মারতে হয়। ইচ্ছে করেই নদীয়া কপাল দিয়ে আর একবার ধাক্কা মারে ঝুলন্ত জুতোয়!

সীতুয়া ছেনির মতো যন্ত্র দিয়ে চামড়া কাটছে। কাঠের একটা ক্ষয়া টুকরোয় খস্‌খস্‌ করে দু' চারবার ঘসে নিচ্ছে ছেনিটা। মুখ তুলতেই নদীয়া বলে—দ্যাখ বাবা, চটিটার একটা বন্দোবস্ত করতে পারিস কিনা।

নদীয়াকুমার ভাল খদ্দের নয়, সীতারাম জানে। তাই গম্ভীরভাবে হাতের কাজ শেষ করে একবার খইনির থুক ফেলে হাওয়াইটা হাতে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলে—এ তো ভিখমাঙ্গাদের চটি, আপনি কোথায় পেলেন এটা?

নদীয়া রেগে গিয়ে বলে—বড্ড বকিস বলেই চিরকাল এমন রয়ে গেলি সীতুয়া। দে দুটো সুতোর টান মেরে।

সীতারাম মাথা নেড়ে বলে— ফুটো হবে কোথায়? বিলকুল পচে গেছে রবার। ফিকে ফেলে দেন। নতুন কিনে নেন একজোড়া।

নদীয়া পকেটে হাত দিয়ে দেখল। জানা কথা পয়সা নেই। পকেটে থাকেও না কোনোদিন। খরচের ভয়ে নদীয়া পয়সা নিয়ে বেরোয় না। মিনতি করে বলল—দে বাবা সারিয়ে, দোকানে গিয়ে পাঁচটা পয়সা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সীতুয়া তার যন্ত্র দিয়ে চটির রবার ফুঁড়ে সুতোর টান দিয়ে বলল—দেখবেন নদীয়াবাবু, জুতো মাথায়-মুখে লেগে যাবে! অত ঝুঁকবেন না।

—লাগবে কি, লেগেছে। নদীয়া বিরস মুখে বলে।

সীতুয়া মোষের শিঙের ফুটোয় যন্ত্রটা ঢুকিয়ে বের করে এনে ভুস্‌ভুসে রবার ফুটো করতে করতে বলে—বাবুলোকেরা মাথা নিচু করতে জানে না তো, তাই ওই সব জুতো তাঁদের কপালে লাগে।

—এঃ, ব্যাটা ফিলজফার। বলে নদীয়া।

তারপর চটি পরে ফটাফট কাপ্তানের মতো হাঁটে।

দিনটাই খারাপ। খড়-কাটাই কলের সামনে নদীয়ার বউ দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটা আগে সহ্য হত না। আজকাল সয়ে গেছে। বউয়ের চেহারা দেখলে ভিরমি খেতে হয়। মাথায় টেরিকাটা পুরুষমানুষের চুল, পরনে পাঞ্জাবি-ধুতি, পায়ে চপ্পল, বাঁ হাতে ঘড়ি। দাড়িগোঁফ নেই বলে খুবই ডেঁপো ছোকরার মতো দেখতে লাগে। চেহারাটা মন্দ ছিল না মেয়েমানুষ থাকার কালে। বুকটা ন্যাকড়া জড়িয়ে চেপে বেঁধে রাখে, তাই এখন আর মেয়েমানুষির চিহ্ন কিছু বোঝা যায় না।

বউকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নদীয়া। মুখটা অন্য পারে ঘুরিয়ে নেয়। সেই ঘটনার পর বছর ঘুরে গেছে। একদিন মাঝ-রাতে দুঃস্বপ্ন দেখছিল নদীয়া। সময় খারাপ পড়লে মানুষ স্বপ্নটাও ভাল দেখে না। তো সেই দুঃস্বপ্নের মধ্যেই একটা লাথি খেয়ে জেগে উঠে বসে হাঁ করে রইল। তার বউ মন্দাকিনী তার নাম ধরে ডাকছে—ওঠ, ওঠ রে নদীয়া! নদীয়ার মুখের মধ্যে একটা মশা ঢুকে পিনপিন করছিল, সেটাকে গিলে ফেলে নদীয়া ফের হাঁ করে থাকে। দেখে, বউ মন্দাকিনী মস্ত কাঁচি দিয়ে চুল সব মুড়িয়ে কেটে ফেলেছে, ঘরের মেঝেময় মস্ত মস্ত লম্বা সাপের মতো চুলের গুছি পড়ে আছে। নদীয়ার ধুতি পরেছে মালকোঁচা মেরে, গায়ে গেঞ্জি। তাকে জেগে উঠতে দেখে হাতের কাঁচিটা নেড়ে বলল—খবরদার আজ থেকে আর আমাকে মেয়েমানুষ ভাববি না। মা কালী স্বপ্ন দিয়েছে, আজ থেকে আমি তাঁর সাধক। নদীয়া তেড়ে উঠে বউয়ের চুলের মুঠি ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু সে আর ধরা হল না। চুল পাবে কোথায় ধরার মতো? তা ছাড়া বড় কাঁচিটা এমনধারা ঘোরাচ্ছিল যে খুব কাছে যেতে নদীয়ার সাহস হয়নি। সেই থেকে তার বউ মন্দাকিনী পুরুষমানুষ মেরে গেল। বাড়িতে থাকে, নদীয়ার পয়সাতেই খায় পরে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কিছুমাত্র নেই! পড়শিরা ডাক্তার কবিরাজ করতে বলেছিল। সে অনেক খরচের ব্যাপার, তবু নদীয়া শশধর হোমিওপ্যাথকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু ওষুধ খাবে কে? সেই বড় কাঁচিটা অস্ত্র হিসেবে সব সময় কাছে কাছে রাখে মন্দাকিনী। কাছে যেতে গেলেই সেইটে তুলে তাড়া করে। এখন ঐ যে খড়-কাটাই কলটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, এখনো ওর কোমরে পাঞ্জাবির আড়ালে কাঁচিটা গোঁজা আছে, নদীয়া জানে।

ব্যাটাছেলে মন্দাকিনীর দিকে যতদূর সম্ভব না তাকিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যাচ্ছিল নদীয়া। সময়টা খারাপ পড়েছে। সীতুয়া চামার পাঁচটা পয়সার খয়রাতিতে ফেলে দিল। এখন এই হাওয়াইটা যদি ফেলে দিতেই হয়, আর নতুন একজোড়া কিনতেই হয়, তো এ পাঁচটা পয়সা না-হক খরচা হল।

—এই নদীয়া! বউ ডাকল।

নদীয়া এক পলক তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল তবু! মন্দাকিনী ফের হেঁকে বলল—শুনে যা বলছি, নইলে কুরুক্ষেত্র করব।

মেয়েমানুষের স্বভাব যাবে কোথায়! ঝগড়ার ভয় দেখাচ্ছে। তবু নদীয়া কান পাততে উৎসাহ পায় না। ফকিরচাঁদের ঢিবির ওপর নাকি মায়ের মন্দির তুলে দিতে হবে, মায়ের স্বপ্নাদেশ হয়েছে। প্রায়ই হয়। এসব কথা কানে তোলে কোন আহাম্মক!

মন্দাকিনী পিছন থেকে এসে পিরান টেনে ধরল, ঘন ঘন শ্বাস ফেলে বলল—তোরটা খাবে কে শুনি! ছেলে নেই, পুলে নেই, নির্বংশ হারামজাদা, কবে থেকে মায়ের মন্দিরের জন্য দশ হাজার টাকা চেয়ে রেখেছি। রক্তবমি হয়ে মরবি যে।

ফস করে নদীয়ার মাথায় বুদ্ধি আসে। বাঁই করে ঘুরে মুখোমুখি তাকিয়ে বলে—ছেলেপুলে নেই তো কী! হবে।

—হবে? ভারী অবাক হয় মন্দাকিনী। কাঁচির জন্যই বুঝি কোমরে হাত চালিয়ে দেয়।

—আলবাত হবে। সদরে মেয়ে দেখে এসেছি। বৈশাখে বিয়ে করব। দেখিস তখন হয় কি না হয়! তোর মতো বাঁজা কিনা সবাই!

এত অবাক হয় মন্দাকিনী যে আর বলার নয়। কাঁচিটা টেনে বার করতে পর্যন্ত পারে না। তার মুঠি আলগা হয়ে নদীয়ার পিরানের কোণটা খসে যায়। আর নদীয়া চটি ফটফটিয়ে হাঁটে।

না, নদীয়ার মতো দুঃখী আর নেই। দোকানে এসে দেখে ভেলুর অপদার্থ ছেলে শোভারাম চায়ের ভাঁড় হাতে বসে আছে। দৃশ্যটা দেখেই নিজের দুঃখের ব্যাপকতা বুঝতে পারে নদীয়া। ঐ যে চায়ের ভাঁড় ওর দাম কখনো উসুল হবে না। গঞ্জের একনম্বর হেক্কোড় হল ঐ শোভারাম। খাবে, খাতায়ও লেখাবে, কিন্তু কোনোদিন দাম শুধবে না। বেশি কিছু বলাও যায় না, কবে রাত-বিরেতে এসে দল-বল নিয়ে চড়াও হয়।

বাবাকেলে পুরোনো তুষের চাদরটা গা থেকে খুলে সযত্নে ভাঁজ করে রাখল নদীয়া। পা ধুয়ে এসে ছোট্ট চৌকির ওপর বিছানায় ক্যাশবাক্স নিয়ে বসল। টিকে ধরিয়ে পেতলের ধূপদানিতে ধোঁয়া করে অনেকক্ষণ গণেশবাবাকে প্রণাম ঠুকল। দুনিয়ার সব মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি হোক বাবা।

শীতে খদ্দের বেশি ভেড়ে না। দোকান ফাঁকাই।

নদীয়া ভারী দুঃখী মানুষ। ঠাকুর পেন্নাম ভাল করে শেষও হয়নি,

শোভারামটা চটির খোঁটা দিল—ই কী গো, নদীয়াদা ! তোমাব চটির হালটা এরকম হল কবে ? এ পরে বেড়াও নাকি ? খবর্দার রবারের চটি পরো না, চোখ খারাপ হয় । আর ঐ কুকুরে-খাওয়া চটি ভদ্রলোকে পরে ?

শোভারামের পায়ে নতুন জুতো । নদীয়া আড়চোখে দেখে । বেশ বাহারী জুতো । চামড়ার ওপরে মাছের আঁশের মতো নকশা তোলা । রঙটাও ভাল । নদীয়ারই সময় খারাপ পড়ে গেছে । শ্বাস ফেলে বলে—নতুন কিনলি বুঝি জুতো জোড়া ?

শোভারাম বিস্তর রঙ-ঢং দেখিয়ে বলে—ঠিক কেনা নয় বটে ! শোভারাম ভেবে-চিন্তেই বলে । কারণ সে নিজের পয়সায় জুতো কিনেছে এটা নদীয়া বিশ্বাস নাও করতে পারে ।

নদীয়া রসিকতা করে বলে—কিনিসনি ! তবে কি শ্বশুরবাড়ি থেকে পেলি ? নাকি শেষ অবধি জুতো চুরি পর্যন্ত শুরু করেছিস ।

অপমানটা হজম করে শোভারাম । কিন্তু লোক চরিয়েই সে খায়, খামোখা চটে লাভ কী ? ভালমানুষের মতো বলে—না গো নদীয়াদা, সে সব নয় । গেল হপ্তায় বৈরাগী মণ্ডলের হয়ে সদরে একটা সাক্ষী দিয়ে এলাম । টায়ারের চটিটা ফেঁসে গিয়েছিল হোঁচট খেয়ে । তো বৈরাগী মণ্ডল জুতো জোড়া কিনে দিল । কিন্তু তখন তাড়াহুড়োয় খেয়াল করিনি, মনে হচ্ছে এক সাইজ ছোটো কিনে ফেলেছি । বেদম টাইট হচ্ছে । দেখ তো, তোমার পায়ে লাগে কিনা—

বলে শোভা জুতো খুলে এগিয়ে দেয় । নদীয়া উদাস হয়ে বলে—লাগলেই কী ! ওসব বাবুগিরি কি আমাদের পোশায় ।

শোভারাম অভিমানভরে বলে—তুমি চিরকালটা একরকম রয়ে গেল নদীয়াদা । তাই তো তোমার বউ ওরকম ধারা ব্যাটাছেলে হয়ে গেল । নাও তো, পরে দেখ । পায়ে লাগলে এমনিই দিয়ে দেবো । ত্রিশ টাকায় কেনা, তা সে কত টাকা জলে যায় । পরে দেখ ।

নদীয়া এবার একটু নড়ে । বলে—কত টাকা বললি ?

শোভারাম হাসে, বলে—ত্রিশ টাকা । মূর্ছা যেও না শুনে । ওর কমে আজকাল জুতো হয় না ।

নদীয়া উঠে এসে জুতো জোড়া পায়ে দিল । পাম্প-শুর মতোই । কিন্তু ঠিক পাম্পশু নয় । বেশ নরম চামড়া । দু-চার পা হেঁটে দেখল নদীয়া ! আরে বা ! দিব্যি ফিট করছে তো ! এই শীতে পায়ে বড়

কষ্ট। চামড়া ফেটে হাঁ করে থাকে, ভিতরে ঘা, তাতে ধুলোময়লা ঢুকে কষ্ট হয়। তা ছাড়া পাথরকুচির রাস্তায়, অসমান জমিতে পা পড়লে হাওয়াই চটিতে কিছু আটকায় না, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। এই জুতোজোড়া পরেই নদীয়া টের পেল আরাম কাকে বলে। পায়ে গলিয়ে নিলেই পা দু'খানা ঘরবন্দী হয়ে গেল। ধুলো-ময়লা পাথরকুচি কিংবা শীত কিছুই করতে পারবে না।

শোভারাম খুশি হয়ে বলে—বাঃ গো নদীয়াদা, জুতোজোড়া যেন তোমার জন্যই জন্মেছিল। আমাদের ছোটোলোকি পায়ে কি আর ও-সব পোশায়! তুমিই রেখে দাও! আমি না হয় একজোড়া টায়ারের চটি কিনে নেবো। বাজারের ওদিকে মহিন্দির টায়ারের চটির পাহাড় নিয়ে বসে আছে।

নদীয়া একটু দ্বিধা করে বললে—টায়ারের চটি কি সস্তা নাকিরে? হলে বরং আমিও একজোড়া—

—আরে না না! শোভারাম মাথা নেড়ে বলে—সে বড় শক্ত জিনিস। তোমরা পায়ে দিলে ফোস্কা পড়ে কেলেঙ্কারি হবে। কড়া আর জীবনে সারবে না। ওসব কুলিমজুরের জিনিস। তুমি এটাই রেখে দাও। যা হোক, দশ বিশ টাকা দিয়ে দিও, তোমার ধর্মে যা সয়।

সঙ্গে সঙ্গে নদীয়া জুতোজোড়া খুলে ফেলে বলে—ও বাবা, বলিস কি সব্বোনেশে কথা, ডাকাত কোথাকার! দশ বিশ টাকা পায়ের পিছনে খরচ। আমি আট টাকার ধুতি পরি।

শোভারাম অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে নদীয়ার দিকে। তার-পর খুব ধীরে বলে—তোমার লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে নদীয়াদা। ফৌত হয়ে যাওয়ার আগে নিজের আত্মাটাকে একটু ঠাণ্ডা করো। খাও না, পরো না, ও কীরকম ধারা রুগী তুমি? দুনিয়ার কত কী আরামের জিনিস চমকাচ্ছে—তুমিই কেবল নিভে যাচ্ছো।

নদীয়া না-না করে। আবার জুতোটা তার বড্ড ভালও লেগে গেছে। ফের ছাড়া জুতো পায়ে পরে দেখে। বড় বাহার। আরামও কম কী! সেই কবে ছেলেবেলায় বাবা জুতো কিনে দিত, তখন পরেছে। নিজে রোজগার করতে নেমে আর বাবুগিরি হয়নি! বলল—দশ টাকা যে বড্ড বেজায় দাম চাইছিস রে।

—দশ কী বলছ? বিশ টাকা, না হয় পনেরোই দিও। সেও মাগনাই হল প্রায়। নেহাত জুতোজোড়া আমার ছোটো হয়, আর

তোমারও ফিট করে গেল। নইলে এখনো বাজার ঘুরলে বিশ পঁচিশ টাকায় বেচতে পারি।

—বারো টাকা দেব। ঐ শেষ কথা। যা. ও মাসে নিবি।

হ্যা–হ্যা করে হাসে শোভারাম। বলে—বারো? তার চেয়ে এমনিই নাও না। ভেলুরামের ব্যাটা অনেক টাকা দেখেছে, বুঝলে নদীয়াদা।

সবশেষে তেরো টাকায় রফা হল। তাতে অবশ্য শোভারামের এক তিলও ক্ষতি নেই। যত তাড়াতাড়ি মাল পাচার করা যায়। নইলে বাংলা সাবান কিনতে আসা দোকানদারটা বাজারময় হাল্লাচিল্লা ফেলে দেবে। নগদ তেরো টাকা নিয়ে শোভারাম অন্ধকারে সাঁত করে মিলিয়ে গেল।

নদীয়া জুতোজোড়া লুকিয়ে ফেলল চৌকির পাশের ছায়ায়। বলা যায় না, শোভারাম শালা চোরাই মাল যদি গছিয়ে দিয়ে থাকে তো ফ্যাসাদ হতে পারে। থাক একটু লুকোনো, নদীয়ার পায়ে দেখলে কেউ আর পরে সন্দেহ করতে পারবে না। দোকানের কর্মচারীটা ওদিকে বসে আগুন পোহাচ্ছিল, সব শুনেছে কিনা কে জানে। নদীয়ার কোনো কাজই তো সহজপথে হয় না। সবই যেন কেমন রাহুগ্রস্ত। তার মতো দুঃখী, নদীয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আড়চোখে একবার জুতোজোড়া দেখে নেয়। মিটমিটিয়ে একটু হাসে। খুব দাঁও মারা গেছে। তবু তেরোটা টাকা....ভাবা যায় না। কর্মচারীটা আবার জুতো কেনার সাক্ষী থাকল না তো!

দুটো গেঁয়ো লোক এই সময়ে উত্তেজিতভাবে এসে দোকানে ঢুকল। রাজভোগ সিঙাড়া আর চায়ের অর্ডার দিয়ে খুব গরম স্বরে কথা বলতে লাগল। দুজনের একজনের জুতো চুরি গেছে ভেলুরামের গদি থেকে; তাই নিয়ে আলোচনা। যার জুতো চুরি গেছে তার পায়ে শোভারামের নোংরা টায়ারের চটিটা। কান খাড়া করে শুনছিল নদীয়া। যা ভেবেছিল তাই।

নদীয়ার মতো দুঃখী কমই আছে দুনিয়ায়। সে একটা শ্বাস ফেলে আড়চোখে জুতোজোড়া দেখে নিল। আছে।

শ্রীপতি সাড়ে সাতটায় উঠতে যাচ্ছিল, এ সময়ে দেখে, অন্ধকার ফুঁড়ে গরিলাটা গদিতে উঠে আসছে। বাইশ তেইশ বছরের আই জোয়ান

চেহারা, যেমন মাথায় উঁচু তেমনি পেল্লায় শরীর। এই হল তার ছাত্র খেলারাম।

চেহারা পেল্লায় হলে কী হবে, ইঁদুর যেমন বেড়ালকে ডরায়, তেমনি মাস্টারজীকে ভয় খায় খেলা। মাস্টারজী সটাং ফটাং ইংরিজি বোলি ছাড়ে, কষাকষ হিন্দী বলে, খেলা তার কিছু বোঝে না।

গরিলাটাকে দেখে ভারী বিরক্ত হয় শ্রীপতি। ঘড়ি দেখে বলে—মাই টাইম ইজ আপ খেলারাম। গুড নাইট।

গরিলাটা ভ্যাবলার মতো মুখ করে বলে—আজ্ঞে।

শ্রীপতি সন্দেহবশত বলে—কী বললাম বল তো।

খেলারাম গলার কম্ফর্টারটা খুলে ফেলে অসহায়ভাবে দাদুর দিকে তাকায়! ভেলুরাম গদির ওপর বসে ছানিপড়া চোখে নাতির দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে বলে—বল।

খেলারাম ঘামতে থাকে।

শ্রীপতি আনমনে বলে—কিছু হবে না।

গরিলাটার বাবা একটু আগে চোখের সামনে দিয়ে একজোড়া জুতো চুরি করে পালিয়ে গেল। একই তো রক্ত। মাথা নেড়ে শ্রীপতি বাজারের মধ্যে শীতের কুয়াশায় নেমে গেল! তার ভিতরে কত বিদ্যে গিজগিজ করছে, কাউকে দেওয়ার নেই।

আসতে আসতেই শুনল, দাদু ভেলুরাম নাতি খেলারামকে খুব ডাঁটছে—কোথায় সারাটা দিন লেগেছিলি চুহা কোথাকার! বীরপাড়া থেকে আসতে এত দেরি হয়। পঞ্চাশ টাকার মাস্টার বসে বসে থেকে চলে গেল। জুতোচোরের ব্যাটা।

বাজারটা এখন নিঝুম কুয়াশায় মাখা। একটু ক্ষয়াটে জ্যোৎস্নাও উঠেছে। বাতাসে একটু আঁশটে গন্ধ পায় শ্রীপতি মেছো-বাজার পেরোবার সময়ে। তখনো কিছু লোক নদীর টাটকা মাছ নিয়ে বেচবার জন্য বসে আছে কুপি জ্বালিয়ে। এই সব লোকেরা শেলি-কীটস পড়েনি, শেক্‌সপিয়রের নামও জানে না। ডাস ক্যাপিটাল কিংবা রবি ঠাকুর কী বস্তু তা জানা নেই। আশ্চর্য, তবু বেশ বেঁচেবর্তে আছে। তবে কি ওসবই জীবনের বাহুল্য শৌখিনতা মাত্র। না হলেও চলে? সত্য বটে, একবার একজন অধ্যাপক শ্রীপতিকে বলেছিলেন—ইনফর্মেশন মানেই কিন্তু জ্ঞান নয়! যে লোকটা টকাটক নানা ইনফর্মেশন দিতে

পারে তাকেই জ্ঞানী মনে কোরো না, যার উপলব্ধি নেই, দর্শন নেই, সে বিদ্যের বোঝা বয় বলদের মতো।

উপলব্ধির ব্যাপারটায় একটু কোথায় খাঁকতি আছে শ্রীপতির, এটা সে নিজেও টের পায়। এই যে গঞ্জের পরিবেশ, ঐ ম্লান একটু কুয়াশা মাখা জ্যোৎস্না কিংবা ফটিকচাঁদের ঢিবিতে একা শিরিষের যে সৌন্দর্য এসব থেকে সে কোনো মানসাঙ্ক কষতে পারে না। বাইরের জগৎটা থেকে সে রস আহরণ করতে পারে না বটে মৌমাছির মতো, তবে সে বইয়ের জগতের তালেবর লোক। বিস্তর পড়াশোনা তার। তাকে টেক্কা দেওয়ার মতো কেউ জন্মায়নি এখানে। লোকে তাকে ভয়ও খায়। তবু কি একটা খাঁকতি থেকেই যাচ্ছে। সে কি ঐ উপলব্ধি বা দর্শনের?

বাজার পার হয়ে নিরিবিলি ফাঁকা জায়গা দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, একটু উপলব্ধির ব্যায়াম করা দরকার। সে জেদ ধরে দাঁড়িয়ে গোঁয়ারের মতো চারধারের জ্যোৎস্নামাখা শীতার্ত প্রকৃতি থেকে সেই উপলব্ধির গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করল।

হচ্ছে না। মনের পর্দায় কিছুই ভেসে ওঠে না যে!

পাঁচ-সাতটা লোক হাল্লা-চিল্লা করতে করতে কাছে এসে পড়ল। সব কটা মাতাল। শ্রীপতি কিছু বুঝবার আগেই দলটা থেকে খেলারামের বাপ দৌড়ে এসে পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলতে লাগল—রাম রাম মাস্টারজী, আমার খেলারামকে জুতো চুরির ব্যাপারটা বলবেন না। বাপকে তাহলে নিচু-নজরে দেখবে খেলারাম। অনেক পড়িলিখিওলা ব্যাটা আমার, আমি মুখ্যুর ঢিবি—

—আহা, ছাড়ো ছাড়ো! বলে শ্রীপতি পা টেনে পিছিয়ে আসে।

বাতাস দূষিত করে মদের গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে দাঁড়িয়ে উঠে শোভারাম বলে—এভাবে বাঁচা যায় মাস্টারজী? আমার বাপকে আর খেলারামকে একটু বলবেন, আমি সাফ-সুতেরো হয়ে গেছি। ভাল লোকের মতো থাকব, যদি আমাকে ফিরিয়ে নেয়।

নাকে রুমাল চেপে শ্রীপতি ঘাড় নাড়ল। পৃথিবীটা বড়ই পচা। দুর্গন্ধময়। এই পৃথিবী থেকে উপলব্ধি বা দর্শনের কিছু ছেঁকে নেওয়ার নেই। পুঁথিপত্রের মধ্যেই রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর জগৎ।

লোকগুলো কোদাল গাঁইতি নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ে শোভারাম হাতজোড় করে বলল—আশীর্বাদ করবেন মাস্টারজী। ফটিকচাঁদের ঢিবি খুঁড়তে যাচ্ছি আমরা, যেন কিছু পাই।

গম্ভীরভাবে শ্রীপতি বলে হুঁ।

আজ পর্যন্ত বিস্তর হাঘরে ফটিকচাঁদের ঢিবিতে খোঁড়াখুড়ি করেছে। সকলেরই আশা, সাতঘড়া মোহর আর বিস্তর হীরে-জহরৎ একদিন ওখান থেকে বেরোবেই। পেল্লায় ঢিবি, খুঁড়ে শেষ হয় না। আজ পর্যন্ত সাপ ব্যাঙ আর ইঁট পাথর ছাড়া কিছুই বেরোয়নি। তবু অভাব পড়লেই কিছু লোক গিয়ে ঢিবিটা খুঁড়তে লেগে যায়।

নদীয়াকুমার তার দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে দোকানের ঝাঁপ ফেলে ফিরছিল। নতুন জুতোজোড়া পুরোনো খবরের কাগজে জড়িয়ে র‍্যাপারের তলায় বগলসই করে নিয়েছে। পায়ের পুরোনো হাওয়াই চটাস-পটাস শব্দ করে বোধহয় নদীয়াকে গালমন্দ করছিল। করবেই। সময় খারাপ পড়লে সবাই করে ওরকম।

খুব একটা সাদাটে ভাব চারদিকে। কুয়াশার জ্যোৎস্নায় যেন দুধে-মুড়িতে মাখামাখি হয়ে আছে। পাকা মর্তমানের মতো চাঁদ ঝুলছে আকাশে। পায়ের ফাটা জায়গাগুলোয় শীত সেঁধোচ্ছে। বাবাকেলে তুষের চাদরটায় মাথামুখে ঢেকে হাঁটছিল নদীয়াকুমার। চৌপথির কাছে বাড়ি, মাঝপথে ফটিকচাঁদের ঢিবিতে কারা যেন গোপনে কী সব করছে। দুচারটে ছায়া ছায়া লোকজন দেখা গেল। নদীয়া কদমের জোর বাড়ায়। কোমরের গেঁজেতে বিক্রিবাটার টাকা রয়েছে। দিনকাল ভাল নয়। কপালটাও খারাপ যাচ্ছে। কেবল মাঝে মাঝে নতুন জুতো জোড়ার কথা ভেবে এত দুঃখেও ফুক ফাক করে সুখের হাসি হেসে ফেলছে নদীয়া। বেশ হয়েছে জুতোজোড়া। দিন দশ বাদ দিয়ে পরবে। চোরাই জুতো এর মধ্যে যদি খোঁজখবর হয় তো গেল তেরটা টাকা। দামটা বেশিই পড়ে গেল। তবু জুতো একজোড়া দরকার। ভেলুরাম বলছিল বটে, বউকে জুতোতে হলেও তো একজোড়া জুতো লাগে। ছেঁড়া হাওয়াই চটি দিয়ে কি আর জুতোনো যায়?

বাড়ির দরজায় পৌঁছে ভয়ে আঁতকে ওঠে নদীয়াকুমার। কে একটা মেয়েছেলে ঘোমটা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের জবা গাছটার তলায়! মেয়েছেলে, নাকি ভূত-প্রেত? তার বাড়িতে আবার মেয়ে-ছেলে কে আসবে?

নদীয়া বলল—রাম রাম, কে?

—আমি।

নদীয়া ফের আঁতকে উঠে বলে—কে আমি ?

—আহা। বলে মেয়েছেলেটা এগিয়ে আসে তার কাছে। মুখে জ্যোৎস্না পড়েছে, উর্ধ্বমুখে তার পানে তাকাতেই ঘোমটা খসে গেল। পুরুষমানুষের মতো চুলওলা মাথাটা বেরিয়ে পড়ল।

আঁ, আঁ, করে ওঠে নদীয়াকুমার। এ যে মন্দাকিনী !

—তোমার এই সাজ ? ভারী অবাক হয় নদীয়া।

মন্দাকিনী জ্যোৎস্নায় চোখের বিদ্যুৎ খেলিয়ে বলে—কেন, আমি মেয়েমানুষ সাজলে তোমার খুব অসুবিধে হয় বুঝি ! সদরের কোন ডাইনীকে পছন্দ করে এসেছো, তাকে বৈশাখে ঘরে এনে সংস্থাপনা করবে—তাতে বুঝি ছাই দিলাম। ঝ্যাঁটা মারি—

এই সব বলতে বলতে মন্দাকিনী প্রায় নদীয়ার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে আর কি টেনে হিঁচড়ে। কিন্তু তাতে নদীয়া কিছু মনে করে না। কপালটা কি তবে ফিরল। নতুন জুতো। বউ।

গহিন রাতে মন্দাকিনী শান্ত হয়ে কাঁদতে বসল। তার আগে পর্যন্ত বিস্তর বাসন আছড়ে, বিছানা ছুঁড়ে, জামাকাপড় ফেলে রাগ দেখিয়েছে। নদীয়া খুব আহ্লাদের সঙ্গে দেখেছে। বছরটাক আগে তো এরকমই ছিল মন্দাকিনী। এই রকমই অশান্তি করত।

মন্দাকিনী কাঁদছে দেখে নদীয়া বলে—কাঁদো কেন ? ঝাল তো অনেক ঝাড়লে। আমি বড় দুঃখী লোক, কেঁদো না।

মন্দাকিনী জলভরা চোখে কটাক্ষ হেনে বলে—আমি এখন চুল পাবো কোথায়। কত লম্বা চুল ছিল আমার। তুমি কি এখন আর আমাকে ভালবাসবে চুল ছাড়া।

—দূর মাগী ! নদীয়া আদর করে বলে—চুলে কী যায় আসে।

ভোর রাত পর্যন্ত সাত মাতালে ঢিবি খুঁড়ে পেল্লায় হাঁ বের করে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কার কোদাল যেন ঠং করে লাগল পেতলের কলসী বা ঘড়ার গায়ে। দ্বিগুণ উদ্যমে সবাই খুঁড়তে লাগে আরো। হ্যাঁ, সকলের কোদালেই ঠনাঠন ধাতুখণ্ডের আওয়াজ বেরোচ্ছে। জয় মা কালী। জয় মা দুর্গা। জয় দুর্গতিনাশিনী।

সাত মাতালের বুকের ভিতরে জ্যোৎস্নার ভাসাভাসি। সাত মাতাল এলোপাতাড়ি কোদাল, গাঁইতি আর শাবল চালিয়ে যেতে লাগল। ভোর

হতে আর দেরি নেই। শোভারাম আর তার স্যাঙাতদের রাতও বুঝি কেটে গেল।

বেরোচ্ছে। বেরোচ্ছে। অল্প অল্প মাটি সরে আর বস্তুটা বেরোয়। কী এটা? অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না। তবে ঘড়া বা কলসী নয়, তার চেয়ে ঢের ঢের বড় জিনিস। ফটিকচাঁদের বসত বাড়িটা নাকি?

খোঁড়াখুঁড়ি চলতেই থাকে। হাতে ফোসকা, গায়ে এই শীতেও সপসপে ঘাম। কেউ জিরোতে চাইছে না। নেশা কেটে গিয়ে অন্য রকম নেশা ধরে গেছে।

ভোরের আবছা আলোয় অবশেষে বস্তুটা দেখা গেল স্পস্ট। সাত মাতাল চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখে—একটা কবেকার পুরোনো রেলের মালগাড়ির পাঁজর আধখানা জেগে আছে মাটির ওপর, কবে বুঝি ডিরেইলড হয়ে পড়ে ছিল এইখানে। জংধরা লোহা, হলদে রঙ ধরেছে।

কেউ কোনা কথা বলল না। হেদিয়ে পড়েছে।

খুব ভোরে খেলারামকে তুলে পড়তে বসিয়েছে ভেলুরাম।

খেলা দুলে দুলে ইংরিজি পড়ছে।

গদির পাশ দিয়ে হা-ক্লান্ত, মাটিমাখা সাত মাতাল ফিরে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন শোভারাম, একটু দাঁড়িয়ে খেলারামের ইংরিজি পড়া শুনল। খুব জোর পড়ছে খেলা। ব্যাটা বোধহয় ভদ্রলোক হবে একটা।

ভেবে এত দুঃখের মধ্যেও ফিক করে একটু হেসে ফেলল শোভারাম।

শেষবেলায়

নেত্য, নেত্যগোপাল সামন্তর বাড়িটা এদিকে কোথায় জানেন? ও মশায়—

রকে এক বুড়ো বসে। একটা তেলচিটে তুলোর কম্বল থেকে মুখখানা জেগে ওঠে। বড় বেশি খানা-খোঁদল মুখে, আর নারকেল ছোবড়ার মতো রুখু দাড়ি গোঁফ। শিরা-উপশিরা সব ভেসে উঠেছে। মরকুটে বুড়ো। চোখের কোণে মাখনের মতো পিঁচুটি জমছে।

—নেত্য?

—নেত্যগোপাল।

—সামন্ত বাড়ি? কী বললে?

—তাই বলছি। নেত্য সামন্ত। দালাল।

—হবে।

—সে থাকে কোথা?

বুড়োটা ঘোলাটে চোখে একটু চেয়ে থাকতেই কপালের চামড়ার নিচে বান মাছের মতো একটা রগ সরে গেল একটু পিছলে। মরবে! পিত্ত কফ শ্লেষ্মা তিনটেই প্রবল। গলার ঘড়ঘড়টা সামলাতে পারছেন না। বুকে বাতাস ডাকছে।

—শেলেশশা। বুঝলে?

—বুঝেছি।

—অনেক নতুন নতুন লোক বসেছে নিশ্চিন্দায়। নতুন কালের মানুষ সব। সবাইকে কি চিনি?

হরেন চৌধুরী বুঝল, হবে না, বলল—কিন্তু খুব নামডাকের লোক। তিনচার রকমের দালালি।

—রাখো তোমার দালালি। দালাল নয় কে? কী নাম বললে? নেত্যগোপাল? নেত্যগোপাল। সামন্ত বাড়ি—

—এই বাড়িটাই দেখিয়ে দিল একজন।

এই-বাড়ি? বলে মাথা নাড়ে বুড়োটা—কিছু ঠাহর পাই না। এই মনে পড়ে। ভুলে যাই। ঝুরঝুস্ হয়ে বসে গেছি বাপ, কে আর দেখে আমাকে। জাড়টাও বাড়ল খুব এবার।

হরেন হাসে—জাড় কোথা খুড়ো মশাই? দিব্যি বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে।

—তোমার তো দিবেই। যার মাথায় হাত তার জাড়। শরীরে সেই কোন সকালে শীত ঢুকে বসে আছে। তাড়াই কত। যায় না।

—তো নেত্য সামন্তর খোঁজ পাই কী করে? বাড়িতে কে আছে?

—আছে অনেক। জ্ঞাতিগুষ্টি কি কম? তিষ্টোতে পারি না বাপ্, বড্ড জ্বালায় ছেলেগুলো। নিত্যগোপালের ছেলে, আমার নাতি—

হরেন ঝুঁকে সাগ্রহে বলে—কী নাম বললেন? আপনার ছেলে নিত্যগোপাল?

বুড়ো হতচকিত চোখে চায়—তবে কার ছেলে? ভুল বললুম নাকি?

—তাহলে তো এইটেই নিত্যগোপালের বাড়ি।

—এইটাই।

—চেনেন না বললেন যে?

—চিনি। আমার ছেলে। ভুল হয়ে যায় বাপ। আমি হচ্ছি গয়েশ সামন্ত। বলে বুড়ো মাড়ি আর মুখের ফোকর দেখিয়ে হাসে—এইবার মনে পড়েছে। সব হিসেবে ঠিকঠাক। সামন্ত বাড়ি, নেত্য।

—নেত্যকে আমার দরকার।

—যাও না ভেতরে। এটা কি সকাল বাপ? ক'টা বাজল?

—বিকেল। চারটে। এ সময়ে থাকার কথা।

—আছে বোধ হয়। এখানেই থাকে। গয়েশ সামন্তর ছেলে হল নেত্যগোপাল, নেত্যগোপাল।

—ছেলেপুলে তো কাউকে দেখছি না। কাকে দিয়ে ডাকাই! অচেনা লোক হুট করে ঢুকে পড়াটা কি ঠিক হবে?

—ছেলেপুলে? নেত্যর? তারা সব গর্ভস্রাব।

গালাগালটা হরেনের শোনা। বাবা দেয়।

—বলল ছেলেগুলো জ্বালায় নাকি?

—কিছু রাখে না। এক পুরিয়া চিনি লুকিয়েছি তোষকের তলায়। লোপাট। কিছু রাখে না। বড় এলাচ খেলে বুক ভাল থাকে, চিত্ত এনে দিয়েছিল এক মুঠো। কড়মড় করে চিবিয়ে খেল। বৌমারা সব যে পেটে এগুলো কী ধরেছিল, ছিঃ ছিঃ।

হরেন চৌধুরী দরজায় উঠে 'নেত্যবাবু' বলে ডাকতে লাগে।

—ভেতরে শোনা যায় না। বুড়োটা বলে।

—কেন ?

—সব অনেক ভেতরে থাকে। ছেলেগুলো সর্বক্ষণ খাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, কিচ্ছু শোনা যায় না, ঢুকে যাও।

—মেয়েছেলে রয়েছেন, যদি কেউ কিছু মনে করেন। উটকো লোক।

—পর্দানশিন তো নয়। যখন গাল পাড়ে তখন তো ইয়ের কাপড় মাথায় উঠে যায়। মেয়েছেলে ? যাও। সর্বক্ষণ লোক আসছে, এ বাড়ি হচ্ছে হাট।

তা হরেন চৌধুরী কিছুক্ষণ দোনোমোনো করে ঢুকেই পড়ে। রক পেরিয়ে দরজা। ভিতরে একটা বাঁধানো জায়গা, বারান্দামতো। তারপর মস্ত উঠোন। বাড়িটার কোনো প্ল্যান ছিল না নাকি ? যেখান সেখান দিয়ে ঘর-বারান্দা সব গজিয়েছে। দেয়ালে প্লাস্টারের বালাই নেই, ইঁট বেরিয়ে আছে। এক পাশে ভারা বাঁধা, রাজমিস্ত্রির কাজ চলছে বোধ হয়। কাণ্ডটা প্রকাণ্ডই। উঠোনের চার ধারেই ঘর, ঘরের ওপর ঘর উঠেছে কোথাও। একটাই বাড়ির খানিকটা একতলা, খানিকটা দোতলা, তেতলাও আছে। উঠোনের মাঝখানে কুয়ো, কুয়োর পাশেই আবার টিউবওয়েল। বিস্তর বাচ্চা-কাচ্চা, আর কয়েকটা মেয়েছেলে দেখা যায়। কুয়োপাড়ে বাসনের ডাঁই মাজতে বসেছে কুঁজো চেহারার কালো এক মেয়েছেলে। মাজতে মাজতে বকবক করছে। তার কাঁকালের ফাঁক দিয়ে বাঁদরের বাচ্চার মতো একটা বছর দেড়েক মেয়ে ঝুলে আছে, তার মাথাটা বুকের মধ্যে সেঁধানো। মেয়েমানুষেরা পারেও ! ভেবে একটু শিউরেও ওঠে হরেন।

হেঁকেই জিজ্ঞেস করে—নেত্যগোপালবাবুর বাড়ি তো এটা ?

কেউ তাকালও না ! উঠোন জুড়ে চিল-চেঁচানি। খাপড়া ছুঁড়ে গুটি সাতেক ছেলেমেয়ে গঙ্গাযমুনা খেলছে। তাদের মধ্যে একজন এক ঠ্যাঙে লাফিয়ে তিন ঘর পেরিয়ে গেল, সবাই চেঁচাচ্ছে তাই !

এই হচ্ছে জয়েন্ট ফ্যামিলির ছবি। হরেনের চোখ দুটো করকর করে উঠল। দুঃখে। এক সময়ে সে এরকম একটা পরিবারে মানুষ হয়েছিল। সে সব ইতিহাস। আজ সামন্তমশাইয়ের কাছে এসেছে ছোট্ট একটা প্লট বা বাড়ির সন্ধানে। লোকটার হাতে বিস্তর জমির খোঁজ। কলকাতায় আর জমি নেই। যাও বা ছিল ঢাকুরে, যাদবপুর,

বেহালা বা গড়িয়ায়—তাও টপটাপ ফুরিয়ে এল বলে। এরপর কলকাতার জমি বিক্রি হবে ঝুড়িতে। মানুষ তাই কিনে ঘরে সাজিয়ে রাখবে। দেখবার মতো জিনিস হবে একটা। তা সেই দুর্লভ জমি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই হরেন এক মুঠো চায়। ছোট্ট প্লট হলেই তার চলে যাবে। সংসার বড়ো নয়। বৌ আর দুটো ছেলে, দুটো মেয়ে। কাঠা খানেক কি দেড়েক হলেই তিনতলা তুলবে। সুবিধেমতো জায়গায় হলে একতলাটা হবে দোকানঘর, দোতলায় ভাড়াটে, তিনতলায় তাদের ছোট সংসার।

ছোট পরিবারই সুখী পরিবার বলে বটে, কিন্তু হরেনের মনে ধন্দটা যায়নি। সামন্তমশাইয়ের বাড়ির দৃশ্যটা দেখে কী জানি কেন হরেনের বুকটায় মেঘ জমে ওঠে। এইরকম একটা হাটখোলায় সে মানুষ হয়েছিল। সুখে নয়, আবার তেমন সুখ আর পাবেও না।

দীর্ঘশ্বাস চেপে সে দু কদম এগোলো। বারান্দার নিচে নর্দমা, তাতে একটা নীল বল পড়ে আছে। উঠোনে ফাটা বেলুনের রবার ন্যাতার মতো, একটা ছাগল ঘাস থেকে মুখ তুলে হরেনের চোখে চোখ রাখে। কোন বিধবার রোদে-দেওয়া কাপড় অশুচি করেছে হতচ্ছাড়া কাক, বুড়ি দোতলার রেলিং ধরে ঝুঁকে চেঁচাচেছ—বলি নেন্তি, কাকে ছোঁয়া কাপড় মা, রাঁড়ি বলে তো আর মানুষের বাইরে যাইনি, তখন থেকে বলছি, ধো না হয় গঙ্গাজলের ছিটে দে…

হরেন নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে।

বোঝা যায় যে, এ বাড়িতে লোকের যাতায়াত বিস্তর। সে যে ঢুকে এসে দাঁড়িয়ে আছে কেউ গ্রাহ্যই করে না। যেন বা বাড়ির লোক। জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বাড়ির লোক আর বাইরের লোক চেনা ভারী মুস্কিল। কেউ অচেনা এসে দাঁড়ালে ছোটবৌ ভাবে বড় বৌয়ের কাছে এসেছে, বাপ ভাবে ছেলের কাছে এসেছে, ভাই ভাবে দাদার কাছে এসেছে। কেউ গা করে না।

গলা খাঁকারি দিয়ে দিয়ে গলায় ব্যথা। বাচ্চাগুলোকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা বৃথা। তারা আরো ব্যস্ত।

মিনিট দশেক ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে একটা চলতি বাচ্চাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করতে হদিস পাওয়া গেল। নেত্য থাকে দোতলার ঘরে। 'ওই সিঁড়ি বেয়ে উঠে যান, ঘর খোলা আছে, কাকামশাই এ সময়ে অঙ্ক কষেন।' বলে বাচ্চাটা উঠোনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সিঁড়ি চটা-ওঠা। হয় সিমেন্ট পায়ে পায়ে উঠে গেছে, নয়তো লাগানোই হয়নি। গোয়াল সকলের, ধোঁয়া দেবে কে।

দোতলার ঘরে নেত্য সামন্তর অফিস কাম বেডরুম। ঘরটায় তক্তপোশ আছে, টেবিল-চেয়ারও। কিন্তু দলিল-দস্তাবেজ, মুসাবিদা আর মামলার কাগজে ছয়লাপ। টেবিল চেয়ারে ডাঁই, বিছানাও অর্ধেক দখল নিয়েছে কাগজেরা। থলথলে চেহারার কালো মতো নেত্যগোপাল মেঝেয় বসে চৌকির ওপর গ্রীবা তুলে জিরাফের ভঙ্গিতে—হ্যাঁ—অঙ্কই কষছে বটে। আসলে ফর্দ। কিসের ফর্দ তা অবশ্য দেখার চেষ্টা করে না হরেন।

—কী চাই আজ্ঞে?

—নেত্যগোপাল সামন্তমশাই কি আপনি?

—আজ্ঞে।

—এসেছিলাম একটু বিষয় ব্যাপারে—

নিত্য ব্য নেত্যগোপাল ঘাবড়ায় না। নিত্যকর্ম। ফর্দটা মুড়ে রেখে বলে—আসুন।

—বসুন। বলে নেত্যগোপাল বিড়ি ধরায়। তারপর বলে—বলুন।

—একটু বাস্তুজমি।

—জমি?

—আজ্ঞে। হুবহু নেত্যগোপালের অনুকরণ করে হরেন বলে।

—খরচাপাতি কীরকম? এলাকা? তৈরি বা পুরোনো বাড়ি চলবে না?

—চলবে, তবে তিনতলার ভিত হওয়া চাই।

নেত্যগোপাল হাসল। হাতের বিড়িটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল একটু। তারপর বলল—যারা বাড়ি করে তারা তিন বা চারতলার ভিতই গাঁথে, সে একতলা বাড়ি করলেও। শেষ পর্যন্ত আর তিন চারতলা হয়ে ওঠে না। বেশির ভাগই টাকার অভাবে য-তলার ভিত তার আদ্দেক উঠে ফুরিয়ে যায়। মাটির তলায় বৃথা টাকা খরচ।

হরেন চুপ করে রইল। তিনতলাটা তার চাই-ই।

—আমাদের বাড়িরই সেই দশা। মাটির নিচে হাজার পনেরো বিশ টাকা ওপরে তে-ঠেঙে ভূতে-পাওয়া বাড়ি। বলে হাসল নেত্যগোপাল।

হরেনও হাসল। কারণ নেই। তারপর হঠাৎ, দালালের সামনে বেশি হাসা উচিত নয় ভেবে গম্ভীর হয়ে বলল—তবে বাড়ির চেয়ে জমিই ভাল। পছন্দমতো করা যাবে।

—কীরকম করতে চান?

—একতলায় দুটো দোকানের প্রভিশন থাকবে, আর গ্যারেজ। দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট, তিনতলাটা আমার। ওটা—

নেত্য বা নিত্যগোপাল বিড়িটা মন দিয়ে দেখে। চোখ ছোটো, কপালে লম্বা কোঁচকানো দাগ।

—শুনছেন? হরেন সন্দেহবশত জিজ্ঞেস করে।

—শুনছি। বলে নেত্যগোপাল।

—তিনতলাটায় চতুর্দিকে বারান্দা টারান্দা হবে, চিলেকোঠার পাশে চারতলায় হবে ঠাকুরঘর।

নেত্যগোপাল শ্বাস ছাড়ল।

কথাবার্তায় আরো সময় গেল খানিক। আগামগত্তর করতে হল কিছু। পেয়ে যাবে হরেন। বর্ষার আগেই ভিত গেঁথে ফেলতে পারবে। নেত্যগোপালের দু হাতের দশটা আঙুলের নখে নখে কলকাতার মাটি লেগে আছে। কলকাতার জমি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই এক খামচা তুলে নিতে পারবে বলে ভরসা হয় হরেনের। একতলার দুটো দোকানঘরের একটাতে বসাবে গবেট বড় ছেলেটাকে। গ্যারেজটা অবিশ্যি খালিই পড়ে থাকবে এখন. যদি ভগবান কখনো সুদিন দেন…। গরু পুষবার বড় শখ ছিল তার। হবে না। গরু, সব্‌জিক্ষেত, হাঁস-মুর্গি এ সবের জন্য মফঃস্বলের দিকে কাদালো জায়গাই পছন্দ ছিল তার, কিন্তু গিন্নির শখ কলকাতায় থাকবে। থাকো তাই। হরেনের গরু তাই বাদ গেল। একটা শ্বাস পড়ে যায়। বাপ-দাদার সঙ্গে চির-কালের মতো ছাড়ান-কাটান হয়ে যাচ্ছে। যাক। এজমালি সংসারের লোভা মুখখানার হাঁ আর বন্ধই হয় না। বাবা গত এগারো বছর বসে আছে, দাদা হাইকোর্টে ফোলিও টাইপ করে বুড়ো হয়ে গেল। পরের ভাই মোটরমিস্ত্রি, তার ওপর লাভ-ম্যারেজের দজ্জাল বৌ। থাকা যায় না এক সঙ্গে। পয়সাকড়িতে রোজগারে, ওর মধ্যে হরেনেরই যা হোক একটু চিকিমিকি! বৌ তাই রোজই সাবধান করে—এই বেলা ভেন্ন হও, নইলে সব তোমার ঘাড়েই হামলে থাকবে।

বুড়োটা নিচের বারান্দায় খেতে বসেছে। বাটিতে চিঁড়ের জাউ

কিংবা সাগু—কিছু একটা হবে। সপ্‌সপে জিনিসটা হাতের কোষে তুলে ভয়ঙ্কর মুখখানা হাঁ করে সড়াত টেনে নিচ্ছে। এই বয়সে খাওয়া বাড়ে। বাড়লেই বুঝতে হয়, দিন শেষ হয়ে আসছে। হরেন মুখটা ফিরিয়ে নেয়।

প্রশ্নটা এসে পড়ে মুখে, সামলাতে পারে না হরেন। জিজ্ঞেস করে —তা সামন্তমশাই তো ইচ্ছে করলেই নিজের মতো একখানা বাড়ি করে ভিন্ন থাকতে পারেন। এই ক্যাঁচকেঁচির মধ্যে থাকা—

নেত্য বা নিত্যগোপাল হাত রসিদটায় চোষ কাগজ চেপে বলে— ভাবি মাঝে মাঝে বুঝলেন। সাত ভাইয়ের সংসার, ছেলেপুলে মিলে একটা পুরো পল্টন। পয়লা তিন ভাইয়ের বিয়ে দেখেশুনে হয়েছিল, পরের চারজন কোথা থেকে একে একে সব বৌ নিয়ে এসে পটাপট ঢুকিয়ে দিল বাড়িটায়। গুষ্টি বাড়ছে। ভাবি বুঝলেন!

—আপনি ইচ্ছে করলেই তো হয়।

—হয়। এক সদ্যবিধবার জমি পেয়েছিলাম সুবিধামতো। বায়না-টায়নাও হয়ে গেল। ঝপ করে দর পেয়ে ছেড়ে দিলাম। দালালি করার ঐ অসুবিধে। দামটা সব সময়ে মাথায় বিঁধে থাকে, নিজের জন্য আর আমি ভাবতেই পারি না। কয়েকবার চেষ্টাও করে দেখেছি। ভাবি, চলে যাচ্ছে যখন যাক। তবে ভাবি মাঝে মাঝে বুঝলেন! ভাবনাটা আছেই। বলে খুব হাসে নেত্য বা নিত্যগোপাল।

—আজকাল আর জয়েণ্ট ফ্যামিলি চলে না—

—সে তো বটেই। একা থাকার যুগ পড়ে গেল। ছোট সংসার, সুপ্‌সাপ ঘরদোর, ছোটো হাঁড়ি, ছোটো পাতিল। এসবই চল হয়েছে। ইচ্ছেও করে খুব।

বুড়োটা হড়হড়ে পদার্থটা তল করে গোটা দুই বুটি গুড় আর জল দিয়ে মাখছে। দাঁত নেই, তবু জলে গুলে খাবে। খাওয়াটা এই বয়সেই বাড়ে। হরেনের বাবারও বেড়েছে। দিনরাত খাওয়ার গল্প। হরেনের বৌ করে খুব বুড়োর জন্য। আলাদা হয়ে উঠে গেলে কষ্ট হবে উভয়তই। বাবাকে কি নিজের কাছে নিয়ে যাবে হরেন? ভেবে আপন মনেই মাথা নাড়ে। নেওয়াটা ঠিক হবে না। কেন ঠিক হবে না তা অবশ্য ভেবে পায় না সে। নিজস্ব ঘরবাড়ি, তার মায়া বড় সাংঘাতিক। বুড়ো মানুষ ঘরে হাগবে মুতবে। তাছাড়া হরেনের বৌ-ই একটা জীবন করে গেল হরেনের বাপের জন্য। এবার অন্য ভাইয়ের

বৌরাও করুক। এসব ভেবেই হরেন আপন মনে মাথা নাড়ে।

নেত্য বা নিত্যগোপাল রসিদখানা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে—কথা তখনই পাকা হয় যখন জায়গাটা হয়ে গেল। ভাববেন না চৌধুরীমশাই, টাকা যখন আগাম বায়না নিয়েছি ভাবনা এবার আমার।

হরেন ওঠে। উঠতে উঠতেই বলে—পরের ভাবনা তো ভাবলেনই। আমি ভাবছি আপনার কথা। কত জমি আপনার তাঁবে। লাখোপতি থেকে আমার মতো অভাজন ধর্না দেয়। সকলেরই জোতজমি করে দেন আপনি। অথচ নিজের বেলায়—

নেত্য বা নিত্যগোপাল ভ্রূ কোঁচকায়। অমায়িক মুখে বলে—আমিও ভাবি। ভেবে ভেবে কেটে যাক জীবনটা। আলাদা বাড়ি, আলাদা সংসার তার স্বাদই আলাদা। বৌও বলে, খুব বলে। জলে জলে হাত পা হেজে মজে যায়, জায়েদের ছেলেপুলে টেনে কাঁখে ব্যথা, প্রলয় উনুনের ওপর বিশাল কুম্ভীপাকে রান্না করে করে মাথাধরার ব্যামো, অম্বল। সবই বুঝি মশাই। কিন্তু মাথার মধ্যে এমন এক দাঁও মারার মতলব বাসা বেঁধেছে যে কী বলব।

আরো দু চারটে কথা বলে হরেন চৌধুরী বেরোয়।

রকে এসে আবার মুড়িসুড়ি দিয়ে বসেছে বুড়ো। হাতে বিড়ি। তাকে দেখে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে—কটা বাজে বাপ্?

হরেন হাসে। ঘড়ি ঘড়ি টাইম জানা চাই, যেন কত অফিস বা সিনেমার বেলা বয়ে যাচ্ছে! ঠাট্টা করে বলে—টাইম জেনে কী হবে খুড়োমশাই? ইষ্টচিন্তা করুন।

—সময় কি ফুরিয়েছে বাপ্?

হরেন হাসিটা গিলে বলে—বেলা তো ফুরিয়েই এল খুড়োমশাই!

—বেলা ফুরিয়েছে? বলে খুড়ো একটু থমকে চেয়ে থাকে। মুখখানা তুবড়ে অদ্ভুত দেখতে হয়। ঠোঁট দুটো ফোকলা হাঁয়ের মধ্যে কচ্ছপের মুখের মতো ঢুকে বেরিয়ে আসে। বুড়ো বলে—এটা কি বিকেল?

—তাই বটে।

—তবে যে মেজ বৌমা বড় চিঁড়ের জাউ খাওয়ালে? অ্যাঁ! জাউ তো আমি সকালে খাই। বৈকেলে আজ হালুয়া খাবো বলেছিলাম যে? অ্যাঁ!

হরেনের একটু কষ্ট হয় বুকের মাঝখানটায়। বলে—খাবেন. তায় কী? খাওয়া কি একদিনের?

—চিত্ত সুজি এনে রেখেছিল, আমি নিজের চোখে দেখেছি। সে তাহলে ঐ গর্ভস্রাবগুলোকে খাইয়েছে। বাপ্ ঝুব্বুস হয়ে বসে আছি, এখন কে আর দেখে আমাকে! চিড়ের জাউ আমার বেহান বেলায় খাওয়ার কথা—নেত্যর বৌ কিছু খেয়াল রাখে না বাপ। সাত সাতটা বৌ ইয়ের কাপড় মাথায় তুলে দিন রাত্তির ছেলেগুলোকে গেলাচ্ছে। বিড়িটা ধরিয়ে দাও তো বাপ্, হাত বড্ড কাঁপে—

হরেন চৌধুরী গয়েশের বিড়িটা ধরিয়ে দেয় যত্ন করে। একটু হেসে বলে—হিসেব সব মেলে খুড়োমশাই?

—হিসেব! কোন্ হিসেবের কথা বলছ?

এই যে আপনি গয়েশ সামন্ত, আপনার সাতটা ছেলে, সাত বৌ, কত নাতি-নাতনি, তারপর এটা বেহান বেলা না সাঁজবেলা—এসব হিসেব?

বুড়ো বিড়িটা টেনে কাশতে কাশতে গয়ের তোলে গলায়। হাঁপির টান। বিড়ি খাওয়া বারণ নিশ্চয়ই, লুকিয়ে চুরিয়ে খায়। খাওয়াটা আসল।

—মেলে না বাপ্, ভুল পড়ে যায়। এই একটু আগে একজন কার খোঁজ করছিল।

আমিই।

—হবে। বলে বিড়বিড় করে কথা বলতে থাকে। হরেন কান পেতে শোনে। বুড়ো হিসেব মেলাচ্ছে—আমি হলুম গে গয়েশ সামন্ত··· সামন্ত বাড়ি....বড় ছেলে চিত্ত, মেজো নিত্য, আরো কতকগুলো···

হরেন ঘড়িটা দেখে নিয়ে হাঁটা দেয়। রেল লাইন-বরাবর হেঁটে প্ল্যাটফর্মে ওঠে। পাঁচটা পাঁচে ট্রেন। সিগন্যাল দেয়নি এখনো। প্ল্যাটফর্মে কালো কালো কিছু মেয়ে পুরুষ আর বাচ্চা সংসার পেতে আছে। পোঁটলা-পুঁটলি, ইঁটের উনুন, কৌটোর মগ ছত্রাকার। উকুন বাছছে, ছেলে ঠেঙাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। বিশ-ত্রিশখানা রুটি রোদে শুকোতে দিয়ে একটা মেয়ে বসে কাক তাড়াচ্ছে। কেন যে রুটি শুকোয় এরা কে জানে! একটা বাচ্চা হামা দিয়ে এসে হরেনের জুতো ধরে ফেলেছে। হরেন ঠ্যাং টেনে নেয়। সংসারটার দিকে একটু চেয়ে

থাকে। ভারী নিশ্চিন্ত হাবভাব, দুনিয়াজোড়া জমি ওদের। যেখানে সেখানে বসে যায়।

শীতের বেলা। রোদ মরে গিয়ে এ সময়টা বাতাসটা ভারী হয়ে ওঠে। মাটির ভাপ না ধোঁয়া মেঘের মতো গড়ায় মাটির ওপর। ওর ভারী বাতাস। দুঃখের শ্বাসের মতো জমে আছে পৃথিবীর ওপর।

সামন্তমশাই পাকা লোক। জমি একটা পেয়েই যাবে সুবিধে মতো। বর্ষার আগেই ভিত গেঁথে ফেলবে। ভারী একটা আনন্দ হয় হরেনের।

আবার কী জানি কেন রোদমরা বিকেলটার দিকে চেয়ে বুকটা হঠাৎ ঝাঁত করে ওঠে। কী একটা যেন মনে হয়, একটু ভয়-ভয় করে। বুকটায় বগড়ি পাখির মতো কী একটা গুড়গুড় করে ডাকে। পেটটা পাকিয়ে ওঠে।

ভিখিরিদের সংসার, প্ল্যাটফর্মের কৃষ্ণচূড়া গাছ, দূরের সিগন্যাল—এ সবের উপর দিয়ে আকাশ আর জমির মাঝ-বরাবর একটা অদ্ভুত আলা-আঁধারি ঘনিয়ে আসছে। ট্রেন রেল-পুল পেরিয়ে আসছে। হরেন চৌধুরী গাড়ির শব্দটা ঠিক শুনতে পায় না। সেই আলো-আঁধারিটার দিকে অন্য মনে চেয়ে থাকে।

সম্পূর্ণতা

ঠিক পুরুষের মতো গলায় একজন বয়স্কা নার্স চেঁচিয়ে ডাকছিল।

—অমিতাভ গাঙ্গুলি কে? অমিতাভ গাঙ্গুলি?

বাবার মুখ নোয়ানো। হাতের ওপর থুতনি রেখে বোধ হয় চোখ বুজে আছে। ডান গালে স্টিকিং প্লাস্টারে সাঁটা তুলোর ঢিবি। ডাক শুনে মুখ তুলে শমীকের দিকে তাকাল। শমীক উঠে দু'পা এগিয়ে থতমত গলায় বলে—এই যে এখানে।

নার্স হাতের কাগজটার দিকে চোখ রেখেই বলে—ক্যানসার। থার্ড স্টেজ। কিছু করার নেই।

—তাহলে? শমীক প্রশ্ন করে।

উত্তর অবশ্য পায় না। নার্স পরের নাম ধরে ডাকছে—নওল-কিশোর ওঝা—

বাবা ওঠে।

—কী বলল?

শমীক যথার্থ বুদ্ধিমানের মতো বলে—কত ভুলভাল বলে ওরা। এর রোগ ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।

—থার্ড স্টেজ না কী যেন বলছিল। বাবা ধীরে ধীরে বলে।

—রোগটা প্রাইমারি স্টেজে আছে আর কি। ওষুধ পড়লেই সারবে।

হাসপাতালের বাইরে এসে শমীক বলে—ট্যাক্সি নেবো বাবা?

—ট্যাক্সি কেন আবার? তিন নম্বরে উঠে শেয়ালদা চলে যাবো।

শেয়ালদার হোটেলে ফিরে বাবা তার প্যাণ্ট-ক্রিজ ঠিক রেখে যত্নে ভাঁজ করল। হ্যাঙারে টাঙাল জামা। লুঙ্গি পরতে পরতে বলল—থার্ড স্টেজ মানে কি প্রাইমারি স্টেজ?

হ্যাঁ।

—তবে যে বলছিলি, ওরা ভুলভাল বলছিল।

শমীক অত বুদ্ধি রাখে না। তাছাড়া তার নিজেরও বুকের ভিতরে একটা কী যেন উথলে পড়ছে। তিনটে বোন বিয়ের বাকি। দুই ভাই ইস্কুলে পড়ে। আর নিজের বি-এ পাশ করতে এখনো এক বছর। যদি আদৌ পাশ করে। এবং এই অবস্থায় বাবাজি বোধহয় চললেন।

দুই গাল রবারের মতো টেনে হাসল শমীক। বলল—না না। থার্ড স্টেজই বলেছে। তার মানে—

বাবা বিশ্বাস করেছে। কোঁচকানো কপাল হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল, বিছানায় পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বলল—যদি প্রাইমারি স্টেজই হয় তবে হোটেলের টাকা গুনে এখানে থাকি কেন? আমাদের চা বাগানে ফিরে যাই চল। দরকারমতো জলপাইগুড়ি কি কুচবিহারে গিয়ে চিকিৎসা করলেই হবে।

—ডাক্তারকে বলে নিই।

—কালই বল। আমি বরং শিয়ালদায় আজই খোঁজ নিই যদি পরশুর রিজার্ভেশন পাওয়া যায়।

—তাড়াহুড়োর কী আছে। এসেছি যখন ট্রিটমেণ্টটা করিয়েই যাবো। কলকাতার মতো ব্যবস্থা কি মফস্বলে হবে?

বাবা ডান গালের তুলোটা একটু চেপে ধরল। শমীক জানে, তুলোয় ঢাকা আছে একটি ঘা। ঘায়ের ভিতর দিয়ে পচন। ক্রমশ গালের মাংস খসে খসে পড়বে। প্রথম ব্যাপারটা সন্দেহ করেছিল একজন ডেন্টিস্ট। বাবার কসের অকেজো দাঁতটা উপড়ে ফেলে শমীককে আড়ালে ডেকে বলল—দাঁতটা তুলে বোধ হয় ভাল করলাম না। দেয়ার ইজ সাম পিকিউলিয়ার সোর। একবার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাবেন।

শমীক জিজ্ঞেস করল—কেন?

—সন্দেহ হচ্ছে ক্যানসার।

জলপাইগুড়ির বড় ডাক্তারও সেই একই কথা বলে—কলকাতায় নিয়ে যান। না হলে সিওর হওয়া যাবে না।

গাঙ্গুটিয়া চা বাগান থেকে শমীক তার বাবাকে নিয়ে কলকাতায় এসেছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

আজ নিশ্চিত হওয়া গেল। থার্ড স্টেজ মানে প্রাইমারি স্টেজ নয়। শমীক জানে। বাবা জানে না।

পরদিন বাবাকে হোটেলে রেখে একা হাসপাতালে গেল শমীক। বহু কষ্টে দেখা করল ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তার সব শুনে হাসলেন।

—হাসপাতালে রেখে লাভ কী? সারবার হলে নিশ্চয়ই রাখবার চেষ্টা করতাম। যে কয়দিন বাঁচেন আপনার বাবাকে আপনাদের কাছেই রাখুন। যা খেতে চান দিন, যা যা করতে চান সব করতে

বলুন। মেক হিম হ্যাপি। হাসপাতালের লোনলিনেস আর ড্রাজারিতে শেষ কটা দিন কেন কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখবেন? আমাদের কিছু করার নেই।

—আপনি সিওর যে এটা ক্যানসার?

ডাক্তার হাসলেন—ইচ্ছে করলে আপনি আর কাউকে কনসাল্ট করতে পারেন। ডক্টর মিত্রকে দেখান, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। অবশ্য দেখানোটা সান্ত্বনামাত্র।

রাতে খাওয়ার সময় বাবা অনুযোগ করতে থাকে—এরা একেই বিচ্ছিরি খাবার দিচ্ছে, তাও তুই মাছটা ফেলে রাখছিস। ভাত তো কিছুই খেলি না। এখানে এসে সাত দিনে কত রোগা হয়ে গেছিস। ভাল করে খা।

—বাবা, কাল একজন স্পেশালিস্টের কাছে যাবো।

—কেন?

—ডক্টর মিত্রের খুব নাম। দেখি কী হয়।

—প্রাইমারি স্টেজ যখন, অত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে?

—দেখানো ভাল।

—অসুখটা ওরা কী বলছে? নালি ঘা তো?

—তাই।

—ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

বাবা তার গলা ভাত আর ঝোল দিয়ে চটকানো কাঁথের বাটিতে চুমুক দিয়ে বলে—কী খারাপ রান্না এদের। কিচ্ছু গেলা যায় না। তোর মা যে সেদ্ধঝোল রাঁধে তারও কেমন ভাল স্বাদ।

বাবা শমীকের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে—কাল তোকে রামদুলাল স্ট্রীটের সেই দোকানটায় নিয়ে যাবো। কখনো তো খাসনি, দেখিস কেমন ভাল সন্দেশ করে ওরা! আমরা ছাত্র-জীবনে দল বেঁধে গিয়ে খেয়ে আসতাম।

গতকাল নার্সটা চেঁচিয়ে বলেছিল 'ক্যানসার'। বাবা কি সেটা শুনতে পায়নি? বায়োপসি কেন করানো হল, তাও কি বাবা জানে না? না কি সব জেনে-বুঝে বাবাও অভিনয় করে যাচ্ছে।

পরদিন সন্ধেবেলা ডক্টর মিত্রের বিশাল বাইরের ঘরে বাপ-ব্যাটায় বসে আছে। ডাক্তার টেনিস খেলতে গেছেন। আসবেন। শ্লিপে নাম লিখে বেয়ারার কাছে দিয়ে বসে অপেক্ষা করছে আরো দশ-বারোজন

লোক। বত্রিশ টাকা ফি দিতে পারে এমন কয়েকজন। শমীক বাইরে একবার সিগারেট খেতে বেরিয়েছিল। কী সুন্দর বাড়ি। সিনেমায় এ রকম দেখা যায়। সামনে লন, গাড়িবারান্দা, লবি। পেতলের ভাসে সব অদ্ভুত গাছ। লনের ঘাস এদেশের ঘাসই নয়। সিগারেট ধরিয়ে চারদিকটা দেখছিল। সফলতা একেই বলে। কত লোক কত বেশি সুখে আছে।

গায়ের ঘাম তখনো মরেনি, অল্পবয়সী সুন্দর চেহারার এবং হাস্যমুখ ডাক্তারটি চটপটে পায়ে রুগির ঘরে ঢুকে ভিতর দিকের চেম্বারে চলে যেতে যেতে একবার রুগিদের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হেসে গেলেন। হাসিতে বরাভয়, এবং আত্মবিশ্বাস। শমীকের বুকটা ভরে ওঠে। বাবাকে সে ঠিক জায়গাটিতে নিয়ে এসেছে। এ তো আর হাসপাতালের বাজারি ব্যাপার নয়। এখানে ঠিকমতো পরীক্ষা হবে, বিচক্ষণ ডাক্তার ঘা পরীক্ষা করেই হেসে উঠে বলবেন—আরে দূর। এ তো সেপটিক কেস।

ব্যাপারটা ঠিক সে রকম হল না। ডাক্তারের চিঠিটা পড়ে মিত্র বাবাকে পরীক্ষা করলেন। বায়োপসির রিপোর্টটাও দেখলেন। মুখে হাসিটা ছিলই, আত্মবিশ্বাসও ছিল। বাবাকে বললেন—বয়স কত ?

—পঞ্চান্ন।

—ছেলেমেয়ে ?

—তিন ছেলে, তিন মেয়ে। এইটি বড়।

ডাক্তার শমীকের দিকে তাকিয়ে হাসলেন—কী করেন ?

—পড়ি। বি-এ।

—আর্টস। আমারও খুব ঝোঁক ছিল আর্টস পড়ার। আমার বাবা প্রায় জোর করে ডাক্তারি পড়িয়েছিলেন।

এই সব কথা বললেন ডাক্তার। একটা ছোট্ট চিঠি লিখে দিলেন হাসপাতালের ডাক্তারকে। বললেন—এটা ডক্টর সেনকে দেবেন। প্রেস-ক্রিপসন যা আছে তাই চলবে।

কিছু করার নেই ? খুব আস্তে, প্রায় ডাক্তারের কানে কানে বলে শমীক। ডাক্তার হাসলেন।

রাস্তায় একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় চিঠিটা খুলে দেখল শমীক। লেখা—ডিয়ার ডাঃ সেন, দি কেস ইজ হোপলেস। প্লিজ হেলপ দিস ম্যান। মিত্র।

বাবা শমীকের কাঁধের ওপর দিয়ে চিঠিটা দেখছিল—কী লিখে দিল রে ? হোপলেস ! হোপলেস ব্যাপারটা কী ?

চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে শমীক বলে—হোপলেস নয়। লিখেছে হেলপলেস। কলকাতায় আমরা তো কিছু জানি না, তাই লিখেছে। অসহায়।

—ও। বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বলে—বত্রিশটা টাকা নিল, কোনো প্রেসক্রিপসন দিল না ?

—ওই ওষুধই চলবে।

—আর বেশি ছোটাছুটি করিস না। হাসপাতাল, ডাক্তার, এত কিছু করছিস কেন ?

—অসুখ-বিসুখে এ সব একটু করতেই হয়।

—আমার আর ভাল লাগছে না। যা হবার হবে, চল বাগানে ফিরে যাই।

শমীক মাথা নেড়ে বলে—তাই হবে।

বাবা উজ্জ্বল মুখে বলে—ঠিক তো ?

—কাল রিজার্ভেশনের চেষ্টা করব।

বাসরাস্তায় এসে বাবা বলে—এখন কোথায় যাবি ?

—কোথায় আর যাবো। হোটেলেই ফিরে যাই চল।

বাবা একটু হাসে। বলে—কাছেই গড়িয়াহাটা। চল একটু দোকানপসার ঘুরে যাই। সস্তায়-গণ্ডায় যদি পাই তো সকলের জন্য একটু জামাকাপড় নিয়ে যাবো। পুজোর তো দেরি নেই। কলকাতায় একটু সস্তা হয়।

—এখন থাক বাবা। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল !

—তোর জন্যই তো। খামোকা আজ বত্রিশটি টাকা দিলি।

—ভাল ডাক্তারকে দেখালে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

—চল, দোকানটোকান একটু দেখে যাই। গড়িয়াহাটার কাপড়ের দোকানের খুব নাম শুনি।

শমীক অগত্যা রাজি হয়। বাপ-ব্যাটায় হাঁটে গড়িয়াহাটার দিকে। বাবা গালের তুলোটা হাতের তেলোয় একটু চেপে ধরে রেখে বলে—কলকাতায় এসে তো কেবল আমাকে নিয়েই হুড়যুদ্ধ করছিস। কাল বেরিয়ে একটু একা-একা ঘুরবি, সিনেমা থিয়েটার দেখবি। তোদের বয়সে কি কেবল রোগের চিন্তা ভাল লাগে। কাল বেরোস।

শমীক উত্তর দিল না।

পরদিন সকালে উঠে বাবা বলল—কলকাতায় যা শব্দ। রাতে ভাল ঘুম হয় না! বাগানে থাকতে থাকতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে নিশুত নিঝুম না হলে চলে না। তার ওপর আবার ছারপোকা।

শমীক জামাকাপড় পরছিল। একবার রেলের বুকিং অফিসে যাবে।

বাবা শ্বাস ফেলে বলল—ঘায়ের ব্যথাটাও হচ্ছিল।

—বিশ্রাম নাও।

—একা ঘরে কি ভাল লাগবে?

—তবে কী করবে?

—একটু বেরোবো ভাবছি। কলকাতা তো আর আমার অচেনা জায়গা নয়।

—শরীর খারাপ। একা বেরোনো কি ঠিক হবে?

বাবা মাথা নেড়ে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে—শরীর কিছু খারাপ নয়। বেশ তো আছি। কাছেই যাবো, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে। খগেন ওখানে থাকত।

—খগেনকাকা! তোমার বন্ধু তো!

ছেলের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বাবা বলে—হ্যাঁ। এখনো আছে কিনা কে জানে। বিশ বছর খবর জানি না। বেঁচেই নেই হয়তো! আমাদের তো এখন সব যাওয়ার বয়স। একে একে সব রওনা হয়ে পড়ব!

শমীক বলল—খগেনকাকার ওখানে যাবেই যদি, তাহলে তৈরি হয়ে নাও। আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবো।

বাবা একটু অবাক হয়ে বলে—তুই সঙ্গে যাবি?

—না হলে তুমি এই ভিড়ে যেতে পারবে নাকি!

বাবা একটু ইতস্তত করে বলে—চল।

মনে মনে হাসে শমীক। খগেনকাকা বাবার কেমন বন্ধু তা সে জানে না। শুধু এইটুকু জানে, বাবা যৌবনবয়সে একটি মেয়েকে এস্রাজ শেখাতো। সেই মেয়েটির প্রতি এক প্রগাঢ় দুর্বলতা জন্মেছিল। কিন্তু বাবা তাকে বিয়ে করতে পারেনি। বিয়ে করেছিল খগেনকাকা, সে ছিল বড়লোকের ছেলে। এ ঘটনা বাবা মাকে গল্প করেছিল।

মায়ের কাছে তারা শুনেছে। খগেন নামটা শুনেই পূর্বাপর মনে পড়ে গেল।

সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। বিশাল বাড়ি। সিঁড়িতে এবং দেয়ালের নিচের দিকে এখনো মার্বেল পাথর দেখা যায়। মস্ত দরজা হাঁ করে আছে। তবে বাড়ির শ্রী দেখলেই বোঝা যায় অবস্থা পড়তির দিকে। রঙ চটে গেছে, জানালা দরজার পাল্লা জীর্ণ, ভিতরের চিৎকার-চেঁচামেচিতে বোঝা যায় যে দু চারঘর ভাড়াটেও বসেছে।

একজন চাকর গোছের লোক তাদের ওপরে নিয়ে গেল। চিকফেলা বারান্দা, ডানদিক ঘুরে দরদালান। দরদালানের প্রথম ঘরটায় তাদের বসিয়ে বলল—বাবু এ সময়টায় থাকেন না। গিন্নিমাকে খবর দিচ্ছি।

বাবা একটু ইতস্তত করে বলে—খগেন বেরিয়ে গেছে?

—আজ্ঞে।

—তাহলে গিন্নিমাকেই বলো, অমিতাভ গাঙ্গুলি এসেছে। এক সময়ে তোমার গিন্নিমাকে আমি বাজনা শেখাতাম। বললে হয়তো চিনতে পারবে।

বলেই বাবা শমীকের দিকে চেয়ে হাসে। কুণ্ঠার সঙ্গে বলে—ছাত্রী ছিল।

শমীক সব জানে। তবু ভালোমানুষের মতো বলে—তাই না কি!

বাবা শ্বাস ফেলে বলে—কতকালের কথা সব। খগেনটা সুদখোর ছিল। সুদেরই কারবার ওদের। কালোয়ারি ব্যবসাও আছে বটে, তবে টাকা খাটানোটাই ছিল আসল।

এ ঘরটা বেশ বড়। পুরোনো আমলের বড় মেহগিনি টেবিল, আবলুশ কাঠের কালো চেস্ট অফ ড্রয়ার্স। সূক্ষ্ম সব ফুল লতাপাতা আর ময়ূরের কাজ করা বার্মা সেগুনের চেয়ার। চেস্ট অফ ড্রয়ার্সের ওপরে একটা ঢাকনা দেওয়া বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় যে এটা এস্রাজ। পাশে একটা তবলা আর পেতলের ডুগি, গদি-মোড়া হয়ে বিড়ের ওপর ঘুমোচ্ছে। বাবা এখনো গাঙ্গুটিয়ায় সন্ধের পর মাঝে মাঝে এস্রাজ নিয়ে বসে। শমীক তবলা ঠোকে।

বাবা হঠাৎ আপন মনে মাথা নেড়ে বলল—চিনতে পারবে না বোধ হয়।

—কে চিনতে পারবে না ?

—কমলা। কতকালের কথা। বলে বাবা অপ্রতিভ মুখখানা ফিরিয়ে নেয়।

গালের তুলোটা হাতের তেলোয় চেপে ধরে। বলে—চেহারাও পাল্টে গেছে।

নিচের তলায় ভাড়াটেদের গলার শব্দ হচ্ছে। কিন্তু ওপরতলাটা নিস্তব্ধ। সম্ভবত এ বাড়িতে লোকজন বেশি নেই। একটা ধূপ-ধুনোর গন্ধ আসছিল। একবার একটু পুজোর ঘন্টানাড়ার শব্দ এল। বাপ-বেটায় বসে থাকে মুখোমুখি। শমীক বাবার দিকে তাকায় তো বাবা চোখ সরিয়ে নিয়ে দেয়ালের অস্পষ্ট পুরোনো অয়েলপেইন্টিং দেখতে থাকে। হঠাৎ আপনমনে বলে—নেই-নেই করেও এখনো অনেক আছে। এ বাড়িটার ভ্যালুয়েশনই পাঁচসাত লাখ টাকা হবে। অথচ সুদের কারবারির নাকি ভাল হয় না। এরা তবে এত ভাল আছে কী করে ?

শমীক একটু হতাশ হয়। পুরোনো প্রেমিকার বাড়িতে বসে আবার এ কী রকম বিষয়ী কথাবার্তা ! একটু পরেই সে আসবে. কাঁপা বুক, স্মৃতি আর অধৈর্য নিয়ে বসে থাকার কথা এখন। তেষ্টা পাবে, কথা হারিয়ে যাবে, দৃষ্টি চঞ্চল হবে। এ সময়ে বাড়ির ভ্যালুয়েশনের কথা মনে আসবে কী করে ?

বাবা শমীকের দিকে তাকিয়ে বলে—তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে না ?

হোক দেরি। শমীক দৃশ্যটা দেখতে চায়। বাবা যদি কণামাত্র খুশি হয়, যদি প্রেমিকাকে দেখে একটুমাত্র জীবনীশক্তি আহরণ করতে পারে, তবে শমীকের বুক ভরে যাবে। সে মুখে বলে—না। দেরি হচ্ছে না।

—রিজার্ভেশন যদি না পাস !

—পাবো না ধরেই নিয়েছি। গাড়িতে যা ভিড়। না পেলে ব্ল্যাকে কিনে নেবো।

—আবার গুচ্ছের টাকা নষ্ট। কাল কাপড়-জামায় অনেক বেরিয়ে গেছে।

শমীক হাসল। আবার বিষয়ী কথা ! মুখে বলে—সে তো তোমার জন্যই। অত কিনতে কে বলেছিল ?

বাবা অপ্রতিভ হাসে। শমীক দরজার দিকে পাশ ফিরে বসেছিল,

বাবার দিকে চেয়ে। বাবার দরজার দিকে মুখ। হঠাৎ দেখল, বাবার মুখটা পাল্টে গেল। শরীরটায় একটু শিহরন কি।

শমীক তাকিয়ে মহিলাকে দেখতে পায়। মাথায় অল্প ঘোমটা, ফর্সা, সুগোল, ভারী চেহারা, মুখখানা প্রতিমার মতো সুশ্রী। তার নিজের মায়ের মতোই বয়স হবে, তবে ইনি অনেক সুখী। মুখে একটু হাসি।

বাবা উঠে দাঁড়ায়। মহিলা এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন।

—চিনতে পেরেছো? বাবা জিজ্ঞেস করে।

—ওমা! চিনবো না? এই ছেলে বুঝি!

—বড়জন '

—বসুন।

বাবা বসে। মহিলাও বসেন একটু দূরে চেয়ারে। সাবধান গলায় বলেন—কবে আসা হল? গালে ওটা কী?

বাবা গালের তুলোয় হাত চেপে বলে—এর জন্যই আসা। একটা ঘায়ের মতো। ডাক্তার বলেছে, ভয়ের কিছু নয়।

—ঘা!

—দাঁত তুলে সেপ্‌টিক হয়ে গিয়েছিল।

—ও।

—তোমরা সব কেমন আছ? বহুকাল খবর-বার্তা পাই না।

মহিলা হাসেন। বলেন—আপনি সেই চাবাগানে এখনো আছেন?

—হ্যাঁ। ওখানেই জীবন শেষ করে ফেললাম।

মহিলা একটা শ্বাস ফেললেন—জানি সবই।

বাবা একটা গলা খাঁকারি দেয়। বলে—খগেনের কেমন চলছে?

—ওই একরকম।

বাবা হেসে বলে—খুব বাবু মানুষ ছিল। সেই কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, আর বত্রিশজোড়া জুতো এখনো চালাচ্ছে? চুলে কলপ-টলপ দেয় না?

মাহিলা মুখে আঁচল তুলে হাসি ঢাকেন। মৃদুস্বরে বলেন—কলপের দরকার হয় না। টাক পড়ে গেছে।

—পড়ারই কথা। বলে বাবা গম্ভীর হয়ে যায়। এস্রাজটা ইংগিতে দেখিয়ে বলে—এখনো বাজাও?

মহিলা মাথাটা নুইয়ে দেন। মাথা নাড়েন। না, বাজান না।

বাবা চুপ করে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। হলঘর থেকে দেয়ালঘড়ির শব্দ আসে। চাকর মিষ্টির প্লেট রেখে যায়। গেলাসে জল। চা।

বাবা প্লেটের দিকে চেয়ে বলে—চিবোতে পারি না।

—কষ্ট হয়?

—হুঁ। আমার পথ্য লিকুইড।

—সরবত করে দিই?

—না।

মহিলা তবু উঠে যান। বোধ হয় সরবতের ফরমাশ দিয়ে এসে আবার বসেন। ঘোমটা খসে গেছে। এখনো কী গহিন কালো চুলের রাশি!

—খগেনকে বোলো, আমি এসেছিলাম। কাল বা পরশু ফিরে যাবো।

মহিলা চুপ করে থাকেন। শমীক একটা-দুটো মিষ্টি খায়। চা শেষ করে। তারপর উঠে বলে—বাবা, আমি আসি।

—যাবে? বাবা তটস্থ হয়ে বলে—আমিই বা বসে থাকি কেন? খগেন যখন নেই!

মহিলা ঘোমটা আবার মাথায় তুলে শমীককে বলেন—তুমি এখন কোথায় যাবে বাবা।

একটু কাজ ছিল।

—আমি ওঁকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। উনি একটু থাকুন এখানে, কেমন?

বাবা অপ্রতিভ হয়। শমীক এটাই চাইছিল। তার সামনে জমবে না ওঁদের। তার পালানো দরকার এখন। সে মহিলাকে একটা প্রণাম করে বলে—আচ্ছা। বাবার কোন তাড়া নেই। সারাদিন তো একা।

মহিলা হাসলেন। বললেন—আমারও তাই। একা।

বলেই সামলে গেলেন। হেসে বললেন—ছেলেপুলে নেই তো।

খুব ধীরে শমীক দরদালানে বেরিয়ে আসে। বারান্দা পার হয়। সিঁড়ির মুখে চলে আসে। আর সেইখানে নিস্তব্ধ সিঁড়ির মুখে চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে থাকে। কিসের জন্য যেন উন্মুখ ও উৎকর্ণ হয়ে থাকে। আর হঠাৎ শুনতে পায়, মৃদু একটা সুরের কেঁপে ওঠা। এস্রাজ বেজে উঠল।

নিশ্চিন্তে শমীক সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকে।

দুপুরে যখন খেতে হোটেলে ফিরেছিল শমীক তখনো বাবা ফেরেনি। শমীক তাই বেরিয়ে পড়ল। মন ভাল ছিল না। এলোপাথাড়ি ঘুরল কেবল। বাবাজি চললেন। গাছের মতো, স্তম্ভের মতো বাবাজি আর থাকবেন না। তিনটে বোনের বিয়ে বাকি, ভাইরা এখনো নাবালক। কিন্তু সে সমস্যার চেয়ে বড় হচ্ছে শোক। সংসারের অপরিত্যাজ্য, অবিভাজ্য একজন থাকবে না। লোকটা তার প্রেমিকার বাড়িতে সকালে এস্রাজ বাজাতে বসেছিল। জানে না একটা কালো হাত নালি ঘা বেয়ে নেমে যাচ্ছে তার বুকের সুরের উৎসের দিকে। প্রাণঘড়ির কল টিপে বন্ধ করে দেবে। নার্সটা চেঁচিয়ে বলেছিল—ক্যানসার, থার্ড স্টেজ। কিছু করার নেই। সে কথা বাবা কি শোনেনি! কিংবা ডাক্তার মিত্রের লেখা চিঠিখানায় 'হোপলেস' শব্দটাও কি দেখেনি নিশ্চিতভাবে! বড় অবাক লাগে। লোকটা নিশ্চিন্ত মনে এস্রাজ বাজাচ্ছিল আজ সকালেও।

ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। এসে দেখল, বাবা খুব নিবিষ্ট মনে স্যুটকেস গোছাচ্ছে। তাকে দেখে আনন্দিত স্বরে বলে—আয়। কোথায় ছিলি!

—ঘুরলাম। তুমি দুপুরে ফেরোনি?

—না। ছাড়ে নাকি! দুপুরে খাওয়াল। ঝোলভাত মেখে নরম করে দিল, ঘোল-টোল, সরবত, ফলের রস, মধু, কত কী!

শমীক হাসে। বলে—ভাল।

বাবার মুখে একটা রক্তাভা। একটু বুঝি হালকা-পলকা তার মন। একটা হাওয়া এসে মনের ওপরকার সব ধুলো উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বলল—একটা রাগ শেখাচ্ছিলাম সেই কবে! পুরোটা তখনো তুলতে পারেনি, হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল। আর শেখা হয়নি। আজ সারাদিন সেটা শিখিয়ে দিয়ে এলাম।

—ও।

—অসম্পূর্ণ একটা কাজ সম্পূর্ণ হল।

—খগেনকাকার সঙ্গে দেখা হয়নি?

বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বলে—না। সে নাকি অনেক রাতে ফেরে। আমি আর বসলাম না। রাত হয়ে যাচ্ছিল।

—রিজার্ভেশন পেয়েছি বাবা। কালকের।

—পেয়েছো! বাঃ নিশ্চিন্ত! বলে বাবা খুব খুশি হয়। বলে—

—সব দিক দিয়েই ভাল হল। কী বলিস!

—হ্যাঁ বাবা।

বাবা খুব একরকম উজ্জ্বল হাসে। বিছানার ওপর ছড়ানো নতুন কেনা শাড়ি, প্যাণ্ট আর শার্টের কাপড়, টুকটাক নানান জিনিসের দিকে মমতাভরে তাকিয়ে থাকে বাবা। বলে—জিনিসগুলো খারাপ কিনিনি, না রে? সবাই খুশি হবে।

শমীক একটু দুষ্টুমি করে বলে—কিন্তু অত দামী জিনিস কিনেছো, অত দামী জামাকাপড় তো আমরা কখনো পরি না।

—তা হোক, তা হোক। বাবা খুশির গলায় বলে—আমার তো এটাই শেষ পুজোর বাজার। এবারটায় না হয় দামীই দিলাম।

বড় চমকে যায় শমীক। একদৃষ্টে বাবার দিকে চেয়ে থাকে। তবে কি বাবা জানে! জেনেও বাবা স্বাভাবিক আছে! এত আনন্দ! অত খুশির মেজাজ! শমীক মনে মনে বলে, তবে কি জানো বাবা?

বাবা তার দিকে চোখ তুলে চায়। বলে—একটা অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হল, বুঝলে! কমলাকে রাগটা শিখিয়ে এলাম। মনটা বহুকাল ধরে ভার হয়ে ছিল।

বাবা চুপ করে হাসিমুখে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। শমীক পরিষ্কার বুঝতে পারে, বাবার চোখ নিঃশব্দে তার প্রশ্নের জবাব দিল—জানি হে জানি!